KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল ০৯
Collection : KLMLGK	Publisher : নরেন্দ্র মেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 11/4 12/2 12/3 12/4	Year of Publication : Oct 1988 May 1989 July 1989 July-Sep 1989
	Condition : Brittle / Good
Editor : নরেন্দ্র মেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ৪৬

বভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নানাস্বাদ ভ্রমণের বই, আনন্দের বই

অতুলচন্দ্র গুপ্তের
নদীপথে ৮·০০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
ভ্রমণে নয়, ভুবনে ২০·০০

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
আলোছায়ার পথে ১৬·০০
মুক্তিনাথ ১২·০০

কৃষ্ণা বসুর
চরণরেখা তব ২৫·০০

ধ্রুব মজুমদারের
সহসা হিমালয় ১৫·০০

নবনীতা দেবসেনের
ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে ১৮·০০

নীরদ মজুমদারের
পুনশ্চ পারী ৫০·০০

ফণী মজুমদারের
হিংস্র নরমুণ্ড শিকারীদের দেশে ২৫·০০

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ২০·০০

শ্যামসুন্দর বসুর
ত্রিকৈলাস ও মানসসরোবর ২৫·০০

সমরজিৎ করের
দুই দেশ শক্তি ও মানুষ ২০·০০
মানুষ পাথর ২০·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
এখন এখানে ১২·০০

সুদীপ্তা সেনগুপ্তের
আণ্টার্কটিকা ৫০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
রাশিয়া ভ্রমণ ২০·০০

নীললোহিতের
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী ৩০·০০

মৈত্রেয়ী দেবীর
অচেনা চীন ১৮·০০

রাণী চন্দের
পথে ঘাটে ১৫·০০

সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০৯

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬

ত্রয়োদশ বর্ষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

অপ্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলী	১	মুজতবা আলী
সাক্ষাৎকার :		
হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৩৬	
ব্যক্তিগত রচনা :		
স্বাধীনতা	২৩	গুণানন্দ ঠাকুর
মোমবাতি	৭৮	সুধীর মুখোপাধ্যায়
প্রবন্ধ :		
সংস্কৃতির অস্ত্ররূপ	৭	সুধী প্রধান
ভাষাবীক্ষা ও একটি সন্ধিক্ষণ	৫৭	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
বাঙালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন	১৬০	আবদুর রউফ

কবিতাগুচ্ছ :

নরেশ গুহর কবিতা	২৮	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
'ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা' :		
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৯৩	সমীর সেনগুপ্ত
নিতাই জানার কবিতা	১৩৪	দেবারতি মিত্র
সুবেন্দু মল্লিকের কবিতা	১৪৫	গৌতম গুপ্ত
গল্প :		
চাঁদ	৬৭	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কর্জ	৮১	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
একালের দ্রোণাচার্য	৯৯	দীপঙ্কর দাস
গাঙ্গেয়	১১৪	দুর্গাদাস ভট্ট
তিয়াস	১২২	মণিশঙ্কর দেবনাথ
ঘর	১৫০	বরুণ চৌধুরী
অমানুষ	১৭৪	নবকুমার বসু
জুপিটার ও থেটিস	১৮৭	সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
পুনর্বিবেচনা :		
জনসাধারণ	১৩৯	পরিমল রায়
বিশেষ উপন্যাস ক্রোড়পত্র :		
আদিকাণ্ড	১-১২১	রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

সম্পাদকীয়

জোব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তন করেননি। অন্তত গত দশ বছরে কলকাতা-বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা তথ্য প্রমাণে প্রায় নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে ১৬৯০ সালের অগাস্ট মাসে ইংরেজরা কলকাতা-সুতানুটিতে পা রাখার আগেও আরমানি ও পর্তুগীজ বণিকেরা এখানে ব্যাবসা-বাণিজ্য চালাতেন। আর ব্যাবসা-বাণিজ্য যখন চলতো, তখন এ অঞ্চলের শ্রী বৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল ইংরেজ আসার বেশ-কিছু আগে থেকেই।

তবু জোব চার্নকের কলকাতা-পদার্পণকে নির্ণায়ক ধরে কলকাতা নগরীর তিনশো বছর পূর্তি পালনে আমাদের আপত্তি নেই যদি তাতে নগরবাসীর কিঞ্চিৎ স্থায়ী উপকার হয় এবং সেখানেই আমাদের সন্দিহান হওয়ার কারণ থেকেই যায়। যতদিন কলকাতার ফুসফুসটিকে ডালহৌসী-চৌরঙ্গী অঞ্চলে আটকে রাখা হবে, ততদিন এ নগরীর কোনো উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনো ঐন্দ্রজালিক পরিকল্পনাবিদের সাধ্য নেই বর্তমান পরিকাঠামো রেখে কোনো সুরাহা করা। অবিলম্বে কলকাতাকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং যতটা সম্ভব পশ্চিমেও ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। এমনিতেই কলকাতার আয়তনের তুলনায় মোট রাস্তার পরিমাণ ভারতের অন্যান্য প্রধান শহরের চেয়ে অনেক কম। স্নায়ুবিবশকারী প্রাত্যহিক যানজট মানুষের সহ্য-সীমা অতিক্রম করেছে। যত সারানোই হোক কলকাতার কোনো রাস্তাই কয়েক মাসের বেশি অক্ষত থাকে না! পূজার সময় রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি আরো বাড়ে। মাসের পর মাস যা ঐ ভাবেই পড়ে থাকে। এর দায়ভাগ তো আমাদেরই।

কলকাতার তিনশো বছর উপলক্ষে সরকারি পরিকল্পনার আন্তরিকতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু রাজ্য-গ্রন্থাগার ভবন, লেখ্যাগার ভবন, স্থায়ী আর্ট গ্যালারি বা নানা সংস্কৃতিকেন্দ্র স্থাপন করে কিন্তু কলকাতাকে শ্রীময়ী করে তোলা যাবে না (যদিও শিল্প, সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার পরিবেশ অধিকতর অনুকূল করার প্রয়াস নিন্দনীয় নয়!), যে পৌর স্বাচ্ছন্দ্যের অপ্রতুলতায় আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, যার জন্য কলকাতার নাগরিক হিসাবে পরিচয় দিতেও অনেক-সময় আমরা লজ্জিত বোধ করি, কর্তৃপক্ষকে সেই সাধারণ নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিতে হবে সর্বপ্রথম।

পাঠকের কাছে এ বছরে বিভাবের শারদীয় সংখ্যার আকর্ষণ অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশি হবে বলে আমাদের আশা। আয়তনে অনেক বড় হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই দাম কিছু বাড়াতে হ'ল।

পরিশেষে পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

অরূপ দত্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও টেক্‌নোপ্রিন্ট, 7 কৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এগারোটি ছবি : ছাত্র, ছাত্র-গবেষক জার্মানীতে ও শেষবার ১৯৭১-এ জার্মান ভ্রমণের সময়

বন-এ ছাত্র : ১৯৩০-৩১

বার্লিন ১৯৩৮, ছাত্র-গবেষক

বন-এ ১৯৩০-৩১। ছাত্র

বন-এ ছাত্র-গবেষক ১৯৩৭-৩৮

বন-এ ছাত্র : ১৯৩৪

বন-এ ছাত্র : ১৯৩৪

১৯৭১ হামবুর্গে আনা মারীর বাড়িতে

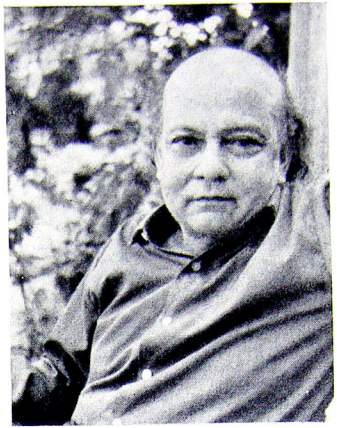

হামবুর্গ ১৯৭১
আনা মারীর বাড়িতে

আনা মারীর সঙ্গে
১৯৭১

হামবুর্গ ১৯৭১
আনা মারীর বাড়িতে

হামবুর্গ ১৯৭১
আনা মারীর বাড়িতে

ছবিগুলি আনা মারীর সৌজন্যে রঞ্জিত সেনগুপ্ত মারফৎ প্রাপ্ত

অপ্রকাশিত মুজতবা আলী

(অপ্রকাশিত চিঠি, কবিতার খসড়া এবং জর্মানীতে ছাত্র থাকাকালীন এবং শেষবারের ভ্রমণের স্মৃতিবিজড়িত একগুচ্ছ অপ্রকাশিত ছবি এই প্রথম মুদ্রিত হলো)

To

Frau Dr. Annemarie Duttenhofer – Neuner
7241 HOPFAU Würthemberg. West Germany

From :

5, Pearl Road. Calcutta-17
Circus Avenue Post office
6.6.71

My Dearest annemarie,

I have nothing better than this Post Card, which please forgive. At long last I got news from a professor, who walked all they way from Dacca to Calcutta, that my boys are safe with their mother at Dacca. But this is three weeks old. Meanwhile the military regime is doing everything in its power to crush the freedom-movement in East Bengal. The mother, Inspectress of schools at Dacca is being pestered to open all schools she has. But if girls refuse to attend what can she do ? And the boys, if they want to go out and join the Freedom-fighters, how can she stop them ?

Do please write to me as often as you can. Although I may not be able to reply.

With the very best wishes.

Yours Syed.

PS :
Your Govt. has given us some money for which our heart has no words.

[বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ মুজতবা আলী এই চিঠিটি তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বান্ধবী আনা মারীকে লেখেন। জর্মান প্রবাসে ছাত্রাবস্থা থেকে আনা মারীর সঙ্গে সৈয়দদার গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। শেষ দুবার জর্মানী ভ্রমণে গেলে এই আনা মারীর বাড়িতেই সৈয়দদা উঠেছিলেন। এখানে সৈয়দ মুজতবা আলীর যে সব ছবি ছাপা হলো তার একটিতে (সম্ভবত) রাইন নদীতীরে আনা মারী ও সৈয়দদা দাঁড়িয়ে আছেন দেখা যাবে। চিঠিতে Mother অর্থে স্ত্রী রাবেয়া ও Boys অর্থে নিজের ছেলেদের বোঝানো হয়েছে। চিঠিতে হুবহু সৈয়দদার যতিচিহ্ন বিন্যাস বজায় রাখা হয়েছে। স. সেনগুপ্ত : সম্পাদক বিভাব]

Confidential and urgent

৫ পার্ল রোড

২০. ৮. ৭১.

পরম সাহেব সমর,

আমাকে হয়তো কালই দুপুরে nursing Home যেতে হবে। অতএব আজই রাত্রে কিংবা কাল সকালে আমার সঙ্গে যদি দেখা করো তবে বড়ো উপকৃত হই।

P. S. গত সপ্তাহে পঞ্চতন্ত্রের note নিতে এলেনা। সাগরকে পাঠানোও গেলনা। একশো টাকা গেল !

[মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই সৈয়দদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকায় স্ত্রী ও ছেলেদের জন্য দুশ্চিন্তায় তার স্বাভাবিক মদ্যপান অপরিমিত বেড়ে যায়। সারা শরীরে এক অদ্ভুত ধরনের দাগ ও গুটি বেরুতে থাকে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে ঐ রোগটিকে—লিভারের কর্মক্ষমতা কমে আসার সঙ্গে যুক্ত সোরিয়াসিস বলে ডাক্তাররা শনাক্ত করেন। সেই সময়ে দেশে প্রকাশিত "পঞ্চতন্ত্রের" কয়েকটি কিস্তি মুখে মুখে সৈয়দদা বলে যেতেন এবং আমি লিখে নিয়ে 'দেশ' অফিসে জমা দিতাম। শেষের দু-একটি কিস্তিতে সৈয়দদার লেখার প্রসাদগুণ ও মেধা একেবারেই কাজ করছিল না বলে আমি ওগুলো ছাপতে না দিতে অনুরোধ করেছিলাম। আমার অনুরোধ রেখে ওগুলো আর ছাপতে দেওয়া হয়নি। স. সেনগুপ্ত : সম্পাদক বিভাব]

[সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর স্ত্রীকে লিখিত]

Presidency Medical Centre Pvt. Ltd.
55 Gariahat Road. Cal-19.
28.8.71

প্রিয় সমরেন্দ্রানী,

আমার একখানা বই Dictionary of Medical terms কিংবা এ ধরনের নাম, সমর ধার নিয়েছিল। প্রথম পাতাতেই আমার নাম লেখা আছে।

হঠাৎ বড়ো দরকার পড়েছে। পত্রবাহককে দিয়ো।

আশীর্বাদ জেনো

সৈয়দ মু. আলী

139-F Dhanmondi Residential Area
Dacca. Phone : 317764 (mostly down)
Dated 22nd June 1973

ভ্রাত : সমরেন্দ্র,

This is in a hurry to know whether you have got the 2 (two) copies of my brother's autobiography which I sent to you through Magan (বাড়ির ভৃত্য ?) before I left Calcutta at a very short notice. Did you have the time to pass them on to Mr. Sunil Ganguli ? No review has appeared so far. I wrote to Mr. Ganguli but received no reply. Did he get it at all ? Are the books still with you ? Will you be kind enough to pass them on to Mr. Ganguli ? You have not sent me a copy of your Journal (কৃত্তিবাস), 1) at least the one in which my contribution was supposed to have been published. 2) Indeed I expect Krittibas to be sent here regularly in as much as I am having a friendly duel with the Modernists in Poetry. 3) Could you please also send me that single page which actually contains the whole poem of Pound, you translated in Desh !

(এই তিনটির দফাওয়ারি উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো)

সৈ. মু. আলী

P.S.—4) যে ইঞ্জিনিয়ার ব্যানার্জী তোমার ভ্রাতার কাছ থেকে (আমার পশ্চিম জর্মানপ্রবাসী ভাই রঞ্জিত সেনগুপ্ত—স. সেনগুপ্ত) আমার বাক্সটা এনেছিল

সে মহাশয় কলকাতা পৌঁছে আমাকে চিঠি লেখেন। ১৫ দিন পর সে চিঠি পাই। তড়িঘড়ি উত্তর দিলুম, লোক পাঠালুম। তিনি ততদিনে ফের জাহাজে হামবুর্গ চলে গেছে। বাক্সটা কি তোমাকে দিয়ে গেছেন ?

দুর্বলতাবশত চিঠি Steno মারফৎ লিখিত হল

আশীর্বাদ জেনো
আলী

[সম্ভবত সৈয়দদা ঐ বাক্সে রাখা তার দুটি ডায়েরির (একটি ইংরেজি, অপরটি বাংলা) জন্য চিন্তিত ছিলেন। আসলে ডায়েরি দুটো ঐ বাক্সে ছিলই না। বান্ধবী আনা মারীর কাছে ছিল। পরে উদ্ধার করে আনা ডায়েরি দুটি আমার হামবুর্গ-প্রবাসী ভাই রঞ্জিত সেনগুপ্তকে দেন। তার মারফৎ আমি পাই।

বাংলা ডায়েরির নির্বাচিত অংশ আগেই বিভাবের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি ডায়েরিটা আমার কাছে আছে। তাতে বেশির ভাগই স্ত্রী, পুত্রদ্বয় বিষয়ক ও নানা পারিবারিক সমস্যার কথা। এই ইংরেজি ডায়েরিটি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সৈয়দদার একটি অপ্রকাশিত কবিতার খসড়া পাই। মনে হয় কবিতাটিতে পরিমার্জনার প্রয়োজন ছিল। কবিতাটি এখানে চিঠিপত্র-র পরে প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যের কারণে। স. সেনগুপ্ত]

To
An
Herrn Ranjit Sengupta
Diplom—Volkswirt.
2, Hamburg 53, Ludersring 24, West Germany.

From : S. M. Ali
5 Pearl Road.
P.o. Circus Avenue
Cal-17. India.
14.3.73

প্রিয়বরেষু,

১৯৭১-এর ন' মাস কেটেছে বিভীষিকার ভিতর। শুনেছিলুম, আপনি ডিসেম্বরে আসবেন। এলেন না!

আমার একজন চেলা পুত্রবৎ

ABUL HASANAT. 891 Landsberg/LECH
F. Hochschule fur, LANDBAG
W. Germany.

একে চিঠি লিখেছি, আমার বাক্সটার একটা ব্যবস্থা করতে। সে ওটার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করে সেই অনুযায়ী যদি আপনি সম্মতি দেন, তবে আমি আপ্যায়িত হব, কৃতজ্ঞ থাকবো। সে আমার fullest confidence enjoy করে। খরচাপাতি সেই বহন করবে। আবুল হাসনৎ চেয়ে পাঠালে সেটা ওকে পাঠিয়ে দেবেন। Thanks.

সমরের জলবসন্ত হয়েছিল। বপুটা তনু হয়ে গিয়েছে। সমরের বউ বাচ্চারা ভালো। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়! সমর modern কবিতায় বেশ নাম করেছে। ওরা এই বুদ্ধের প্রচুরতম সেবা করে। সমর না হয় বুঝলাম, বউটাও সে এত স্বচ্ছন্দে আপন হয়ে যাবে সেটা এখনো—এতদিন পরেও আমার মনটাকে চমক লাগায়। কবে দেশে ফিরবেন ?

আশা করি কুশলে আছেন।

কিমধিকমিতি
সৈয়দ মুজতবা আলী

পুঃ। দু পাঁচদিনের ভিতর আঃ হা-র চিঠি না পেলে, আপনিও ওকে লিখতে পারেন। একই ডাকে দুজনাকে লিখছি। আঃ হা তার চিঠি পাওয়ার দিন পাঁচেক পরে যেন আপনাকে লেখে সেই নির্দেশ দিয়েছি।

পুঃ পুঃ। আপনি যে Haseenstein-দের সঙ্কীর্ণ পরিসর থেকে বাক্সটাকে আপন আবাসে এতদিন আশ্রয় দিয়ে আমাকে Vis-a-Vis হাসেনস্টাইনদের সামনে মুখ বাঁচিয়েছেন তার জন্য আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা জানবেন। আমি বৃদ্ধ, তদুপরি অসুস্থ। বৃদ্ধেরা কথা বলে বেশী, লেখে কম,

[অসংখ্য চিঠির মধ্যে মুজতবা আলীর এই কটি চিঠিই আমরা ছাপলাম। শেষ বয়সে তাঁর পলিনিউরাইটিসের জন্য হাত কাঁপতো। পাঠক লক্ষ্য করলে যতিচিহ্ন, বানান ও বাক্যগঠনে দু এক জায়গায় কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি হয়তো লক্ষ্য করবেন! আমরা তাঁর চিঠি যেমন যেমন ছিল হুবহু সেভাবেই ছাপলাম :

সম্পাদক বিভাব]

সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত কবিতা

বহুবর্ষ হায় করিনু সাধনা
আনন্দ যতনা পেনু, গঞ্জনা বেদনা
ঢের বেশী, কাফের ফতোয়া তক ! আজ
যাত্রা শেষে তাই ভাবি এ তো সে অকাজ,
খুঁজি অন্ধকারে অন্ধ অকিঞ্চন
আসিব আবারও—অনুক্রমা অনুক্ষণ।
সাহিত্য সাধনা তাই নিষ্ফল বরবাদ
এ সত্য শিখিলে ভবে ঘোচে পরমাদ।

ওপারে যাইব আমি বসেছি খেয়াতে
হঠাৎ খেয়াল গেল তাকাতে পশ্চাতে
দিগন্ত খুঁজিয়া—হেরি নাহিকো মানিক
খসরু বা মুক্তো, জানি তাই খুঁজি দিগ্বিদিক
কেহ নাই কেহ নাই ! যে যার ধান্দায়
মত্ত। খবর বিলায় কেহ, কেহ চায়
রাজস্ব উশুল করে ! কেউ উচ্চাসনে
বসিয়া বিলোয় কড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি।

অকস্মাৎ কিবা দেখি ঐ তো গোপনে
সালমা পড়িছে মোর লেখা একমনে।

৩।৪।৭০

[এই কবিতাটি রচনার তারিখ ৩. ৪. ৭০ হলেও অনেক আগের বাংলা ডায়েরীতে এর প্রথম দু' তিনটি পংক্তির ভগ্নাংশ আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম বাদ দিলে কবিতাটি মিলের এবং পয়ারের সাধারণ নিয়মে চোদ্দ ও আটারো মাত্রা রাখার চেষ্টা হয়েছে—স. বি]

সংস্কৃতির অস্ত্ররূপ

সুধী প্রধান

যে সকল সংস্কৃতিকর্মী তেলেঙ্গানা ও শ্রীকাকুলামের সংগ্রামের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজ করেছেন—তাঁদের কাছে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে রবিবাবু ও তাঁদের সংগঠনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তেলেঙ্গানা ও শ্রীকাকুলামের সংগ্রামগুলির মূল্যায়ন আমার উদ্দেশ্য নয়—। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত বন্ধু সমর সেনের উক্তির সঙ্গে একমত যে উক্ত দুটি এলাকার সংগ্রাম সমস্যাগুলি দূর করার পরিবর্তে যে প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে উত্থাপন ও দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করেছিল—তা ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের আগে বা পরে কেউ করেনি—এবং এই সংগ্রামগুলি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে গেছে।

আমি এই শতাব্দীর বিশ দশকে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বোমা তৈরি, পিস্তল সংগ্রহ এবং অত্যাচারী বৃটিশ ও তাদের দেশীয় চেলাদের প্রাণনাশের চেষ্টার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলাম। জেলখানার বাইরে মার্ক্সবাদের পরিচয় লাভ করে বুঝেছিলাম শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত শ্রেণীগুলিকে গণসংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাদের শ্রেণী-চেতনা ও রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি, চেতনা বৃদ্ধি, সংগঠন বৃদ্ধির সঙ্গে গোটা দেশে বৈপ্লবিক অবস্থা সৃষ্টি হলে জন-সাধারণ অস্ত্রধারণ করতে উদ্যত হন। যাঁরা ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁরা বুঝতে পারবেন—'বৈপ্লবিক অবস্থা' বলতে আমি কি বলতে চাইছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির মুক্তির দাবিতে, রসিদ আলি দিবসে, এয়ার কোর্স এবং নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহের পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য সমগ্র ভারতবাসীর মনের আকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল,—কোনো নেতা বা সংগঠনের আহ্বানের অপেক্ষা না করে সারা দেশে হরতাল হচ্ছিল এবং স্থানে স্থানে সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল—তেমন ঘটনা ইতিপূর্বে এদেশে ঘটেনি। এই সুযোগ মার্ক্সবাদী বিপ্লবী আন্দোলন কেন গ্রহণ করতে পারেনি—তার সম্পূর্ণ বিচার করার যোগ্যতা আমার নেই। এই সময়ে আমি সাংস্কৃতিক

আন্দোলনের কর্মী ছিলাম। তবু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সে যুগের সভ্য হিসাবে যতটা জানি—তা বলার প্রয়োজন বোধ করি। কারণ অবিভক্ত বাংলার কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে একত্র থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মতবিরোধের কারণগুলি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তাবাদীদের নেতারা সবসময় বলে এসেছেন: আগে স্বাধীনতা পরে সত্যকথা। গান্ধীজি তো শ্রমিক আন্দোলন পছন্দই করতেন না এবং কখনো জমিদারদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করতে চাননি। জহরলাল সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে অনেক কথা বলেও কার্যক্ষেত্রে কখনো গান্ধীজির বিরুদ্ধে যাননি। সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র পদ্ধতিতে বৃটিশ শাসনের অবসান চেয়েও 'আগে স্বাধীনতা, পরে অন্য কথা'র নীতিতে ফ্যাশিজম্ ও কমিউনিজমের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে অক্ষ শক্তির মিথ্যা আশ্বাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সত্যই সারা পৃথিবীর পরাধীন দেশের পক্ষে একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত করেছিল। অক্ষশক্তির দ্বারা কিছু স্বাধীন দেশ ইউরোপে পরাধীন করা এবং এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে অক্ষশক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলিতে অক্ষশক্তির পক্ষীয় সামান্য কিছু লোক ছাড়া জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে ঐক্য গড়া সহজ হয়। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও অক্ষশক্তির লড়াই সাম্রাজ্যবাদ-অধিকৃত পুরাতন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল—দেশীয় লোক এবং অক্ষশক্তির প্রচারে বিভ্রান্ত কিছু লোক ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে কেবল বিভেদ বৃদ্ধিই করেনি—অক্ষশক্তির সাহায্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আত্মবিশ্বাস হারাতে সাহায্য করেছে। ফলে 'শত্রুর শত্রুর সাহায্যে স্বাধীন হবার' অলীক স্বপ্ন তারা দেখতে থাকে। বর্তমান কালে আমরা জেনেছি যে সুভাষচন্দ্র বসু অনেক চেষ্টা করেও হিটলারকে দিয়ে হিটলারের আত্মজীবনীমূলক বই 'মাইন ক্যাম্প' থেকে ভারত বিদ্বেষী উক্তিগুলি প্রত্যাহার করাতে পারেননি. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ছিল বলে তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করে মুনাফা অর্জনের আশায় ব্যাপক গণসংগ্রামের পরিবর্তে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করে, জাতীয় সংগ্রামের আহ্বান দিয়ে জনগণের যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে অক্ষশক্তির সাহায্যে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেন। জনগণকে আত্ম-শক্তিতে সংগঠিত করার নেতৃত্বের অভাব ঘটে। প্রশ্ন উঠতে পারে কমিউনিস্টরা কি করছিল?

১৯২৮ থেকে ১৯৪২ সালের সদস্য সংখ্যা যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫ হাজার অতিক্রম করেনি। অবশ্য ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সংগঠনের মৌলিক পার্থক্য ছিল। জীবনদর্শন, রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার দ্বারা লড়াইয়ের রণনীতি ও কৌশল স্থির করা, অধিকাংশ সদস্যদের কোনো না কোনো গণফ্রণ্টে দৈনন্দিন কাজ করা এবং এই সকল কাজই বে-আইনি অবস্থার মধ্যে করার জন্য নীতিগত ঐক্য এবং সংগঠনগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার যে সব ব্যবস্থা ছিল তা অন্য কোনো দলের ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে হিটলার-জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার প্রায় ৬ মাস পরে অনেক আলোচনা করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 'জনযুদ্ধে' পরিণত হয়েছে বলে ঘোষণা করে। যে সকল কমিউনিস্ট বিদ্বেষীরা প্রচার করে থাকেন যে রাশিয়ার ও বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই কমিউনিস্টরা এই নীতি গ্রহণ করেছিল—তারা প্রকৃত অবস্থা জানেন না। জেলখানায় বন্দীরা, গোপন কেন্দ্রে অবস্থিত এবং প্রকাশ্যে কর্মরত অনেক সদস্যদের গভীর আলোচনার পর পূর্বোক্ত নীতি গৃহীত হয়। প্রথম যাঁরা পার্টির মধ্যে ঐ নীতির বিরোধী ছিলেন—তাঁদের মধ্যে সে যুগের পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী ছিলেন—এ সংবাদ মাদ্রাজের প্রয়াত মার্ক্সবাদী নেতা রামমূর্তি একটি বইয়ে লিখেছেন। আমি জানি কলকাতার বিখ্যাত শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জী, মহিলা আন্দোলনের নেত্রী মণিকুন্তলা সেন, অধ্যাপক গোপাল হালদার প্রভৃতি নেতাদেরও মনে সংশয় ছিল। আমারও তীব্র বিরোধিতা ছিল। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে আমার বিরোধিতা দূর করে দিয়েছিলেন সে যুগের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী। তিনি যুদ্ধের গতি নির্দেশ করে বলেছিলেন অক্ষশক্তির পরাজয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বৃদ্ধি পাবে না। বিশেষ করে ইউরোপে কমিউনিস্টরা শক্তিশালী হবে (যুদ্ধ শেষে ফরাসী ও ইতালির সরকারের মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্টরা সদস্য হয়েছিলেন) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জনসাধারণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান হবে। ঘটনাটি যে তাই হয়েছিল—আজ সব ঐতিহাসিককে তা স্বীকার করতে হবে। যাইহোক—জাতীয়তাবাদী মহল তখন সেই যুক্তি মানেনি—ফলে ১৯৪০-৪১ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এবং সভা-সমিতিতে যে সম্মানজনক স্থান কমিউনিস্টরা পেত—তা আর পেল না। ফলে প্রচারের জন্য অন্য ব্যবস্থার অনুসন্ধান করতে হলো—সংগঠিত জাতীয়তাবাদীদের প্রচারের বিরুদ্ধে।

১৯৩৬ সালে সৃষ্ট প্রগতি লেখক সংঘ তরুণ লেখক ও ছাত্রদের মধ্যে সে-কাজ শুরু করেছিল এবং যুদ্ধকালীন বৃটিশ সরকারের ধরপাকড়েও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মত পার্থক্য—যা সংগঠনকে দুর্বল করে দেয়, সেই সংগঠনের কিছু কর্মী 'জনযুদ্ধ' নীতির পথে গানের দল তৈরি করে কলকাতা ও জেলাগুলিতে পার্টি লাইন প্রচারের নতুন মাধ্যম তৈরি করতে থাকে। বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ রোধ করার যুগে এই মাধ্যম (১৯০৫-০৮ সালে) ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রগতি লেখক সংঘের কর্মীদের নিয়ে গড়া ইউথ কালচারাল ইনস্‌টিটিউট এবং বাংলার অনেকগুলি জেলার শিল্পগুণসম্পন্ন যুব-ছাত্রদের দল এই গানের মাধ্যমটি 'জনযুদ্ধ' নীতি প্রচারে ব্যবহার করেন। পরে নক্‌শা-জাতীয় নাটিকাও ব্যবহৃত হতে থাকে। আমার গান-বাজনা ও অভিনয়ের একটা স্বাভাবিক পটুত্ব ছিল এবং প্রবন্ধকার হিসাবে ১৯৩৮ সাল থেকে পরিচিত হয়েছিলাম। পার্টির গানের দলের প্রধান সংগঠক বিনয় রায় যখন বোম্বাইয়ে নাচের দল তৈরি করতে গেলেন, তখন বাংলাদেশে গণনাট্য আন্দোলনের সংগঠকরূপে আমাকে মনোনীত করা হল। ইতিপূর্বে ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হলে তার কার্যকারী সমিতিতেও আমাকে রাখা হয়েছিল। সংক্ষেপে এইরূপে আমি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কাজ করতে এলাম ১৯৪২ সাল থেকেই। আমার মনোনয়নে পি. সি. যোশীর উদ্যোগ ছিল।

কিন্তু আমার সঙ্গে অন্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেক পার্থক্য ছিল। প্রথমত, আমি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কাজের জন্য ছয় বছর জেল, বন্দী-শিবির প্রভৃতিতে অনেক পড়াশুনো করে এসেছি। দ্বিতীয়ত, ১৯৪০-৪২ সালে গোপন পার্টি কেন্দ্রের যোগাযোগের ফলে জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ীর মতো নেতাদের বিশ্বাস ভাজন হয়েছি এবং প্রকাশ্যে তাঁদের আস্তানায় বসবাস করতাম। তৃতীয়ত, সাহিত্যক্ষেত্রে ১৯৩৮ সাল থেকে প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে পার্টির ভেতর ও বাইরের অনেক পড়ুয়া ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিলাম বলে কলকাতা-সমাজের একটি পেশার বহু ছাত্র ও শিক্ষকের সঙ্গে আমার সংযোগ হয়েছিল। সর্বোপরি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পেশাদার থিয়েটারের মালিক ছিলেন বলে থিয়েটার শিল্পীদের এবং নাটক ও নাট্যমঞ্চের কিছু সংবাদ অন্য যে কোনো পার্টি সদস্যদের তুলনায় বেশি জানতাম। শিশিরকুমার ভাদুড়ির 'আলমগীর'-এর প্রথম দিককার অভিনয় আমি দেখেছি কিনা মনে করতে পারি না,—কিন্তু 'সীতা', 'ষোড়শী' প্রভৃতি আমি শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের অনেক আগে দেখেছি—

কারণ আমি শম্ভু মিত্র থেকে তিন বছর এবং বিজন ভট্টাচার্য থেকে পাঁচ বছর আগে জন্মেছি। আমার আত্মীয়ের সম্পর্কের জন্য ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ইচ্ছা করলেই কয়েকটি মঞ্চে আমন্ত্রণমূলক প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারতাম। আরও একটি কারণ জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ আমার মনোনয়ন সমর্থন করেছিলেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত পার্টির মহিলা কর্মীর সংখ্যা এক বা দুই আঙুলে গুনে শেষ করা যেত। আমি বিবাহিত এবং আমার স্ত্রী শান্তি রায়—গোপন কেন্দ্রে মুজফ্‌ফর আহমদ, আবদুল্লা রসুল, সরোজ মুখার্জী প্রভৃতির সঙ্গে থেকে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করেন। গোপন কেন্দ্রে আমার স্ত্রীর 'কাকাবাবু' সম্বোধনই মুজফ্‌ফর আহমদের দ্বিতীয় নাম সৃষ্টির হেতু। মুজফ্‌ফর আহমদ ছোটো বড়ো সব মহিলাকেই 'আপনি' সম্বোধন করতেন, নিজের কন্যা ও শান্তি ছাড়া। অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাচ-গানের দলে শেষ পর্যন্ত পার্টির কোনো বদনামের ঘটনা না ঘটে—তাই তিনি আমাকে ও শান্তিকে গণনাট্য সংঘের কিছু কর্মীদের আবাসগৃহে (কম্যুনে) পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হন। বোম্বাই নাচের দলের সম্পূর্ণ বিবরণ আমি জানি না, কিন্তু কলকাতাতে সামান্য কয়েকটি ঘটনা ছাড়া কিছু ঘটেনি। সে যুগের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের আদর্শ ও শৃঙ্খলা রক্ষার উচ্চ মান এর দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৪৩ সালে সারা ভারত গণনাট্য সংঘ গঠিত হয়। একই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। পার্টি কংগ্রেস একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'রেড ফ্ল্যাগ মেলা' নামে করে। এই অনুষ্ঠানগুলি একটি বিচারকমণ্ডলী দ্বারা বিবেচিত হয়—যার মধ্যে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। এঁদের বিচারে অন্ধ্রপ্রদেশের দলগুলি প্রথম স্থান, বাংলা দ্বিতীয় স্থান এবং কেরালা তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়। এই অনুষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে সেকালের পার্টি পত্রিকা '*Peoples War*'-এ হীরেন্দ্রনাথ লেখেন : যারা অন্ধ্রের দলগুলির অনুষ্ঠান দেখেছেন তাদের মনে হবে—it had disclosed the potency of art forms that are close to the people to their immense possibilities of the un-tapped sources of strength and felt indeed that *the magic door to mass mobilisation has been open.*

এই দিকটাই কমিউনিস্ট নেতাদের একসময়ে মনে ধরেছিল এবং সেই মানসিকতা থেকে আজো তাঁরা উদ্ধার পেয়েছেন কিনা বলা শক্ত। আমি বলতে চাইছি যে সভা-সমিতিতে লোক আকর্ষণ করার এবং নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে পার্টির বক্তব্য

পৌঁছে দেওয়ার এই যে পদ্ধতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির অসহযোগিতাকে অতিক্রম করতে পার্টিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। বাস্তব অবস্থাও পার্টির অনুকূলে ছিল—কারণ—হিটলারবাহিনী স্টালিনগ্রাড এবং জাপান বর্মাতে পৌঁছে গেছে। এই সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে সাধারণ ভারতবাসীর কি হবে—তার জন্য বৃটিশ সরকার কিংবা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নিচ্ছে না—বরং দর কষাকষি করছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যবদ্ধ ভাবে জাতীয় সরকার গঠন করে দেশরক্ষা এবং যুদ্ধকালীন মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, বোমাবাজি থেকে জনরক্ষা করার প্রস্তাব জনসাধারণের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। সে যুগে আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন মানুষ নিরক্ষর হলেও বোকা ছিলেন না—ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির প্রাচীন উপকরণ থেকে তারা যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা নিজেদের মতো করে বুঝতেন; তাছাড়া বর্মা প্রত্যাগত ভারতবাসীর কাছে জাপানের অত্যাচারের কাহিনী তারা শুনেছেন। তাই কমিউনিস্ট পার্টির 'দেশরক্ষার' ডাকে তারা অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিলেন—লোকনাট্য, লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে। স্বদেশীযুগ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গীতিকার ও সুরকারদের সক্রিয় করেছিল এবং তাদের চেষ্টায় কোনো কোনো লোকশিল্পী ব্যক্তিগত ভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন—যেমন ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় লোকশিল্পীর রচনা। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য আন্দোলন—যে সকল প্রদেশে শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের বিস্তার ঘটিয়েছে—সেই সব প্রদেশে সাধারণ মানুষের সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকেও জাগ্রত করেছে। ঐতিহাসিকদের মতে গান্ধীজিই জাতীয় কংগ্রেসে ধনী লোকদের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি করেছেন। সেই হিসাবে বলা যায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের গণনাট্য সংঘ ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নির্ধারিত করে দেন। এরপর তারা থিয়েটার হলে ও সিনেমা-গৃহে কেবল দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে নীরবে বসে থাকার পরিবর্তে নিজেরা সেসব জায়গায় স্রষ্টা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। বোম্বাইয়ের সুতোকলের দলিত শ্রেণীর মানুষ আন্নাভাও সাথে, উমর শেখ, শংকর শৈলেন্দ্র (ইনি সেন্ট্রাল রেলওয়ের নিচুতলার শ্রমিক ছিলেন—বর্তমানে বোম্বে ছায়াছবির জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতিকার), কেরালার কাগজ কলের শ্রমিক কে. এস. জর্জ এবং বিড়ি শ্রমিক ই. কে. আয়ান্মু, আসামের ঢোলবাদক মঘাই ওঝা, উত্তরবঙ্গের দোতারাবাদক টগর অধিকারী, মনমন সিং-এর কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, মুর্শিদাবাদের গুমানী দেওয়ান,

খিদিরপুরের বিড়ি শ্রমিক গুরুদাস পাল, ট্রাম শ্রমিক দশরথ লাল রহমান, ইরশাদ, রংকল শ্রমিক লিয়াকৎ—প্রভৃতি নিজ নিজ প্রদেশে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আগ্রহী পাঠক আমার সম্পাদিত মার্ক্সবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের দলিল সম্বলিত তিনখণ্ড পুস্তকে আরো অনেক নাম পাবেন।

এই পর্যন্ত বলা যায় যে পার্টির বক্তব্য জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজনে একটি বিরাট সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা হলো বটে, কিন্তু ১৯৪২-৪৪ সালের মধ্যে, ১৯৪৪-এর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই নতুন পর্ব শুরু হলো। আর তা হচ্ছে—মান উন্নয়নের নামে—সমস্ত গ্রামীণ প্রচেষ্টাকে অবহেলা করে বোম্বাইতে নাচের দল এবং কলকাতায় নাটকের দল কিছু পেশাদারী প্রথায় শিক্ষিত অথচ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন মানুষদের সাহায্যে গড়ে তোলা হলো। রাজনীতির বিচারে এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক বলে তখন আমাদের অনেকের মনে হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি কেবল সাধারণ মানুষই সমর্থন করেনি—কংগ্রেসের একাংশ—যাদের মধ্যে রাজগোপাল আচারী, ভুলাভাই দেশাই, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও কিছু পরিমাণে মেনে নিয়েছিলেন। 'আগস্ট আন্দোলনে' জনসাধারণ ব্যাপক ভাবে যোগদান করেনি এবং কমিউনিস্টদের 'কংগ্রেস-লীগ' ঐক্যের প্রস্তাব কেবল সাধারণ মানুষ নয়, উদার-নৈতিক বুর্জোয়া বা জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষেও যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভারতে তৃতীয় সংগঠিত রাজনৈতিক পার্টির সম্মান পেতে আরম্ভ করেছে। কাজেই জাতীয় আন্দোলনে নতুন স্থান ও সমর্থক সংগ্রহের ভিত্তিতে পার্টির রাজনীতির মতো পার্টি পরিচালিত শিল্পকলাকে স্লোগানযুক্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তের বসবার পক্ষে মার্জিত এবং প্রচলিত পেশাদারী কেতাদুরস্ত পদ্ধতির সামান্য হেরফের ঘটিয়ে folk touch দিয়ে বোম্বাইয়ের নাচের দল এবং কলকাতার নাটক সৃষ্টি হলো। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এই বলে আশ্বস্ত করল সে, কমিউনিস্টদের হাতে সংস্কৃতি বিপন্ন নয় এবং প্রচলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় একটা alternative পথ আছে এবং এদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যত বিকশিত হবে তত এই ধরনের শিল্পকলার বাজার বৃদ্ধি পাবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই কমিউনিস্ট সংস্কৃতি আন্দোলনের এই পরিবর্তনে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সুবিধা হয়েছে, কিন্তু গণ সংস্কৃতি আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বোম্বাই দলে রবিশংকর এবং বাংলা নাটকের দলে শম্ভু মিত্র ছিলেন—তাঁদের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ আমার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ। কারণ বৃটিশ অধিকৃত ভারতে আমরা কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে কেবল তাদের

রাজনৈতিক উদ্যোগই নয়—সাংস্কৃতিক উদ্যোগও বৃদ্ধি করেছিলাম। কলকাতার নাটকের দলে কাজ করতে করতে এবং 'নবান্ন' নাটকের সাফল্যের পর—তার জন্য নাট্যদলের মধ্যে যার জন্য এই সাফল্য—তাই নিয়ে ঘোঁট পাকান দেখে মনে হয়েছিল ১৯৪২-৪৩ সালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সামনে পার্টি পর্যুদস্ত হলো। ভারতের আধা-বুর্জোয়া আধা-সামন্ততান্ত্রিক নেতারা ক্ষমতার লোভে আর বৃটেনের লাল জুজুর ভয় দেখানোতে—ভারত বিভাগে রাজি হলে—এবং শ্রেণীস্বার্থে গোটা দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে একদল দিল্লি আর একদল করাচির মসনদে বসল। আজ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে বিভাগ জনিত সমস্যা।

নৌ-বিদ্রোহের সংবাদ বৃটেনে পৌঁছবার দু'দিনের মধ্যে বৃটিশ সরকার ভারত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জানত এই বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরিস্থিতিতে ঘটেনি। বিদ্রোহীরা কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্টদের পতাকা এক সঙ্গে উড়িয়েছে। ইংরাজ ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ঘটনা ভারতের কমিউনিস্টদের থেকে বেশি জানত। লেনিনের পার্টি সংখ্যাল্প দলের পার্টি ছিল। সেই পার্টি কি করে চেরেন্সকিকে তাড়িয়েছিল—তা বৃটেন ভালো করে জানতো। তাই ভারতে কমিউনিস্টরা ক'জন আছে তা ইংরাজের হিসাবে থাকলেও তারা চিন্তিত হয়েছিল সাধারণ ভারতবাসীর রুদ্ররোষ দেখে। বিপ্লব তো কেবল পার্টি করে না—জনসাধারণ করে। ১৯৪৫-৪৬ সালে জনসাধারণের সেই রূপ আমরা দেখেছি।

স্টালিনকে অনেক গালিগালাজ করা হয়। কিন্তু তিনি ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল ভেঙে দিয়ে ভারতের কমিউনিস্টদের কি সুবিধা করেননি? সোভিয়েট সমর বাহিনী স্টালিনগ্রাড যুদ্ধে হিটলার-বাহিনীকে হারিয়ে যখন পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর হতে শুরু করে—তখন ভারতের কমিউনিস্টরা সৈন্যদের মধ্যে দল তৈরি করার চেষ্টা করেনি কেন? ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং গণ-নাট্য সংঘের ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটস্থ অফিসে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা আসত। বিষ্ণু দে কত বিদেশী সৈন্য নিয়ে যামিনী রায়ের ষ্টুডিওতে নিয়ে গেছেন। কতদিন পরে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে লণ্ডনের মার্ক্স লাইব্রেরিতে পড়তে গেছি, একজন বৃটিশ লাইব্রেরিয়ান আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, চিনতে পারছো না—আমি তো সুযোগ পেলেই I P T A (ইপ্টা) শো দেখতে যেতাম এবং তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতাম। তিনি আমাকে সেকালের সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির কর্মী এবং

পরে স্টেটসম্যান পত্রিকার সত্য চ্যাটার্জী এবং ডাঃ নীলরতন সরকারের নাতি সুমন সরকারের অবস্থা জানতে চাইলেন, এঁদের একজন 'নবান্ন' দেখে যে পত্র দেন তা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে এবং সেই তরুণ ইংরাজকে প্রাণ দিতে হলো আমাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করার জন্য। তাই মনে হয়—পার্টি যদি স্বদেশী এবং বিদেশী সৈন্যদের মধ্যে কাজ করে নৌ-বিদ্রোহের সময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে চেষ্টা করত—তাহলে কেবল ভারত নয়—এশিয়ার অবস্থার মঙ্গলময় পরিবর্তন হতো। বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় এত রক্তপাত, প্রতিক্রিয়ার এত দাপট দেখা যেত না। আর যদি অসফল হতো—তাহলে ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় যা হয়েছিল তাই হতো—অন্তত আজ একথা শুনতে হতো না যে, কমিউনিস্টরা ইংরাজদের সমর্থক ছিল। যারা এদেশের চরম সর্বনাশ করে গেছে—দেশ বিভাগ মেনে—তাদের মুখ থেকে এই গালিগালাজ শোনা কি মুজফ্‌ফর আহমদ, সতীশ পাকড়াশি, গণেশ ঘোষদের কি অসহ্য মনে হয়নি?

মার্ক্সবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে এত সব কথা বলতে হলো এই কারণে যে আমার মনে হয়েছে আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনা—যা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের যুগে দেখা দিয়েছিল—তার দিকে লক্ষ্য রেখেই কমিউনিস্টরা ভারতের বাস্তব অবস্থাভিত্তিক সংগঠন, রণনীতি ও কৌশল স্থির করতে পারেনি। ইউরোপের আদলে শহরগুলিতে—যেখানে কলকারখানা আছে, সংঘবদ্ধ শ্রমিক আছে—তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়া প্রধান কাজ মনে করা হয়েছিল।

যে আদর্শ সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবীতায় আস্থাশীল—সেই আদর্শ-নির্ভর রাজনৈতিক দল প্রথমেই শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান—আজো এদেশের ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকার্যের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। তাছাড়া প্রায় ৯০ ভাগ লোক নিরক্ষর এবং নানা ethnic group-এ বিভক্ত। ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কৃষকসভা তৈরি হলো—কমিউনিস্ট ও বামপন্থী কংগ্রেসী-দের চেষ্টায়। কিন্তু আজো কি ভারতের প্রত্যেক ব্লকে কৃষক সমিতি আছে? এত বড়ো দেশে ১৯৪২-৪৩ সালে কটা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল? ১৯৩৭-৩৮ সালে জনাব মুজফ্‌ফর আহমদকে আক্ষেপ করতে শুনেছি: "লেনিনের মতো আমাদের কোনো নেতা ভারতের কৃষক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেনি।" সত্যই, ভারতের কৃষক সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতা ইংরাজের সৃষ্ট এবং স্বাধীন ভারতের আইন-কানুন এই জটিলতা জিইয়ে রেখেছে। শ্লথগতিতে যে শিল্পায়ণ

হচ্ছে এদেশে তার জন্য সস্তা শ্রমিক সরবরাহ করার তাগিদে এই জটিলতা বজায় রাখা হচ্ছে। ফলে এদেশের শ্রমিকশ্রেণী ইউরোপের মতো নির্ভেজাল সর্বহারা নয়। এদের সঙ্গে গ্রাম-জীবনের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিন্ন নয়। আর সেই সম্পর্কই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী করেছে। নিজ গ্রাম, নিজ শ্রেণী, নিজ ধর্মের লোকের সাহায্যে কল-কারখানায় চাকরি সংগ্রহ করা, চাকরি রক্ষা করা এবং আপদ-বিপদে সাহায্য পাওয়ার জন্য চাকরিস্থলে এসেও পৃথক বাস করতে হবে। আসানসোলের কয়লারখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নিতে গিয়ে জানা গেল বিহার রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে আগত শ্রমিক জেলাগত ভাবে পৃথক বাস করে।

ইংরাজের কৌশলে ভারতের বিকাশ অসম হয়েছিল এবং বর্তমান ভারতের দুরবস্থা অসম বিকাশের ফল—এই কথা সেকালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী আমাকে বলেছিলেন। গান্ধীজির মনোনীত পট্টাভি সীতা-রামাইয়াকে হারিয়ে কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র জিতলেন—তখন ভোটদাতা-দের সংখ্যা সুভাষের পক্ষে, বাংলা ছাড়া কিছু পাঞ্জাব এবং দক্ষিণের কোনো কোনো স্থানে ছিল। বাঙালির সংখ্যা বেশি না হলে সুভাষ জিততে পারতেন না। বর্তমান কালে রাজীব গান্ধীর পক্ষে ভোটের সংখ্যা বিচার করলে তাই দেখা যাবে।

একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার উত্তর ভারতের বিরাট অংশকে Cow belt বলেছেন,—আমি সাধারণ মানুষের প্রতি কোনোরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে বলতে চাই—Monkey belt। কারণ ঐ অঞ্চলে কেবল গোরু নয়, হনুমানও পূজিত হয়, দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য নরহত্যা হয়,—জোর জবরদস্তি করে অল্পবয়স্কা বিধবাদের পুড়িয়ে মেরে সতী পুজো হয়। জনসাধারণের চেতনা কোন স্তরে থাকলে এইসব পৈশাচিক ঘটনা মানুষ করতে পারে—তা আমরা ভেবে দেখিনি।

আমাদের বুর্জোয়ারাই কি খাঁটি বুর্জোয়া? সামান্য কিছু পার্শি ভদ্রলোকদের বাদ দিলে উত্তর ভারতের ধনিকরা অধিকাংশই মধ্যযুগীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। বিড়লারা সারা দেশে মন্দির বানিয়েছে। হিন্দুধর্মের যাবতীয় কুসংস্কারের এরা প্রশ্রয়দাতা। হিন্দুধর্মের মধ্যে বর্ণাশ্রমের বিভেদ, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, আদিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে বিভেদ, বিভিন্ন ethnic group—যারা দীর্ঘকাল ধরে তাদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে আসছে, তাদের সঙ্গে প্রতি রাজ্যের প্রধান জনগোষ্ঠীর বিভেদ।

ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কারণে ভারতের মৌলিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে

যাকে বলে built-in সমস্যা—তা ভারতের মার্ক্সবাদীরা ত্রিশ-চল্লিশ দশকে বুঝতে পেরেছিলেন—এমন কোনো দলিল আমার চোখে পড়েনি। আমরা যাঁদের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ বা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ বলি—তাঁরা মনে করেছিলেন দ্রুত কলকারখানা ও শিক্ষার বিস্তার এদেশের মধ্যেকার অনৈক্য দূর করবে, তেমনি মার্ক্সবাদীরা ভেবেছেন, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং অর্থনৈতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক পর্যায়ে উঠলে ভারতীয় সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হবে। এই দুটি ধারণা চল্লিশ বছরেও ভারতের ঐক্য গড়তে পারেনি। বিরাট দেশে পশ্চিমবাংলা, কেরালা এবং ত্রিপুরাতে কতজন মানুষ বাস করে? বৃটিশ ধর্মের নামে বিভেদকে চিরস্থায়ী করে গেছে এবং যে শ্রেণীর কাছে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে তারা আঞ্চলিকতার শক্তিকে বৃদ্ধি করছে।

মার্ক্সবাদে সমাজের কাঠামো (structure) উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তজ্জনিত সম্পর্ক ও তার কর্তৃত্বের দ্বারা সমাজের উপরি সৌধ (super-structure) নিয়ন্ত্রিত—একথাও যেমন আছে—তেমনি আছে—উপরি সৌধও বেশ কিছু কাল কাঠামোকে প্রভাবান্বিত করে। উপরি সৌধের বিষয়গুলির মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পকলা পড়ে।

১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কৃষক সভা গড়ার সমসাময়িক কালে পূর্ব ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ কমিউনিস্টরাই গড়ে। ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই সংগঠনের যুগান্তকারী ভূমিকা স্বীকার করেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে যেমন ইউরোপের মার্ক্সবাদী পদ্ধতির নির্বিচার অনুকরণ হতে দেখেছি, এখানেও সেই অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৬ সালের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতি প্রেমচন্দের অভিভাষণ ছাড়া অনেক প্রবন্ধকারের রচনা বিশ্লেষণ করলে এই দুর্বলতা ধরা পড়বে।

ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করার সময় অনেক চিন্তাবিদ মনে করতেন ভারত এখনো এক জাতি—'নেশন' হয়নি। হিন্দুধর্মভিত্তিক জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ বার বার বলেছেন—আমরা জাতি নই। এই সমস্যা মুসলিম শাসনকালেও ছিল বলে চৈতন্যদেব, কবীর, নানক এবং আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ তাঁদের মতো করে নিচুতলার মানুষদের মধ্যে ঐক্য গড়ার মানসিকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি বলে তাঁদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি। তবু তাঁরা যে বিভেদমূলক চেতনার স্তরে আঘাত করতে চেয়েছিলেন—তা ইতিহাস স্বীকৃত। প্রগতি লেখক

সংঘ পরাধীনতা, অত্যাচার, সামাজিক অবিচার ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ভিত্তিক (Scientific rationalism) লড়াই শুরু করতে আহ্বান জানিয়েছিল। এই ডাক নিচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন ছিল—কারণ অপরিসীম নিরক্ষরতা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সেই কাজ কিছু পরিমাণে করে নিরক্ষর ও অল্প অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির সেই যুগের রাজনীতিকে লোক-সংস্কৃতির মোড়কে পরিবেশন করে। ব্যাপারটির চরিত্র agit-prop হলেও এই প্রথম সারা ভারতব্যাপী লোক-সংস্কৃতিকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সচেতন করা হলো। এই কাজটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণ মানুষের শিল্পীদের উদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বাবু সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বেড়া ভেঙে এক মঞ্চে তাদের এনে উভয়ের চেষ্টায় চেতনার স্তরে ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রবর্তন করার জন্যই গণনাট্য আন্দোলন আজো চিন্তাশীল লোকের বিবেচনায় বেঁচে আছে। ইদানীং কালে যারা এই আন্দোলনকে কেবল থিয়েটার গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সঙ্গে যুক্ত করে—তারা গাছের বদলে পাতার হিসাব করে। প্রগতি লেখক সংঘ ও গণনাট্য সংঘের লক্ষ্য ছিল—সমগ্র শিল্পকলা—সাহিত্য, নাটক, অঙ্কনকলা, লোককলা, নৃত্য, গীত প্রভৃতি। চল্লিশ দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন আশু পরিবর্তনের সম্ভাবনায় এর বেশি করার মতো বাস্তব পরিস্থিতি, মানসিক এবং সংগঠনগত পরিস্থিতি ছিল না।

ইতিপূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের যুগে কমিউনিস্টদের বুদ্ধিভ্রমের কথা বলেছি। ১৯৪৮-৫০ সালে যে ভ্রান্ত নীতি নেওয়া হলো—তাতে আবার জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছিল—কিন্তু ভ্রান্ত নীতিতে জনসাধারণ সাড়া দিল না। ভারত-বিভাগের প্রেক্ষাপটে নতুন যে নীতি কমিউনিস্টরা নেয়—তাতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ দায়িত্বে রাখার জন্য ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কর্মীদের একটা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয় এবং এমন কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়—যা কার্যকরী করার চেষ্টা হলে ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জনগণের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তা হবার নয়, স্টালিনের মৃত্যু, সোভিয়েট ইউনিয়নের পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব, শ্রেণী সংঘর্ষের পরিবর্তে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় ধনতন্ত্রকে পরাস্ত করার আশ্বাস এবং ভারতে জহরলাল নেহরু সরকার কর্তৃক 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে' দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ—এ দেশের মার্ক্সবাদীদের আবার বিভ্রান্ত করল। ইতিমধ্যে ভারত সরকার সাহিত্য-ললিতকলা এবং সঙ্গীত-নাটক একাডেমি গঠন করে শিল্পকলা ক্ষেত্রে

প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কাঠামো বানিয়ে দিল এবং কমিউনিস্ট বা আধা কমিউনিস্টদের চাকরি দিল, জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে কোনো কর্মীই ছিল না এসব কাজের জন্য। গণনাট্য সংঘের দুই চারজন লোক এই সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে সুযোগ পায়। এই সময় এমন কথাও শোনা যায় যে, গণনাট্য সংঘ উঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি ১৯৫২ সালে পার্টি ছেড়ে দিলেও ১৯৫৭ পর্যন্ত গণনাট্য সংঘে কাজ করেছি—১৯৫১-৫৩ বাদে। তাই সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সেন আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যান তৎকালীন পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের কাছে। তাঁকে আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম—গণনাট্য সংঘ তুলে না দিতে। ১৯৫৭ সালে গণনাট্য সংঘ সঙ্গীত-নাটক একাডেমির অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব পাস করে, এবং আমি গণনাট্য সংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করি। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নীতি, নেহরুর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সোভিয়েট নীতির বিরুদ্ধে চীন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির মতবিরোধ এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে কমিউনিস্টদের সব আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল, সংস্কৃতি আন্দোলনে যাদের উদ্যোগ বৃদ্ধির কথা বলছি—সেই শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনেও ভাটা পড়ে। নেহরুর Industrial policy নতুন ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দেয় এবং বিদেশের টেকনোলজি আনা-নেওয়াতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হতে থাকে। ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের ফলে পশ্চিমের উপর নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৬০-৬৬ সালে কিমিতিবাদী ও স্বভাববাদী নাটকের ছড়াছড়ির সঙ্গে খ্যাতনামা শিল্পীভিত্তিক দলের সংখ্যানে, নাটকে, নাচে দেখা দেয়—সারা সঙ্গীত-নাটক একাডেমি বা প্রত্যক্ষ ভারত সরকারের সমর্থন পেতে থাকে। নাটকের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় এই যুগকে যারা স্বর্ণযুগ বলে—তারা যুগের বাস্তবতার হিসাব রাখে না।

যাই হোক, বনেদী মার্ক্সবাদী দেশ ও দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে পৃথিবীর অনেক দেশের যুবশক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইল; ফ্রান্সে, আমেরিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দেশেও তার ধাক্কা এল। কমিউনিস্ট চীনের 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে' ফেলার তত্ত্ব অনেক তরুণের মনে ধরল। তাতে প্রতিদিন বেজিং বেতার ইন্ধন যোগাতে লাগল, ইতিপূর্বে মার্ক্সবাদীরা ইউরোপের অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিল—এবার কমিউনিস্ট চীনের অনুকরণ করা শুরু হল। চেয়ারম্যান কি বলেছেন—এছাড়া আর কথা ছিল না। ব্যাপক এবং ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি তার সাংস্কৃতিক চেতনা বৃদ্ধি না করে—তার হাতে

অজানা অস্ত্র দিয়ে মুক্তাঞ্চল করতে বলা হল। বেজিং বেতারের প্রেরণায় অনেক মধ্যবিত্ত তরুণের সঙ্গে ভারতের বহু কৃষক অকারণ প্রাণ দিয়েছে—কিন্তু কৃষি-বিপ্লব হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের শুরু থেকেই জাতীয় কংগ্রেস এবং পেটি বুর্জোয়া দলগুলির চেষ্টায় A. I. T. U. C. ও কৃষক সভা কয়েক টুকরো হয়ে যায়। চীনা-পন্থীদের দ্বারা সে বিভেদ বেড়েছে বই কমেনি। সোভিয়েটের নরম পন্থা এবং চীনের গরম পন্থা এই দুই দেশকে কি অবস্থায় এনেছে, তা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। লক্ষ করার দরকার সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার যে অংশ বেশি কৃষক-অধ্যুষিত—সমস্যা বেশি সেই সব অঞ্চলে। অক্টোবর বিপ্লবের পর কৃষক সমস্যা নিয়েই স্টালিন বিব্রত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব বার্লিন থেকে উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত দেশগুলিতে শিল্প ও কৃষির মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই ভারসাম্য কৃষির দিকে। ইতিহাস, ভূগোল, জলবায়ু ও চেতনার দিক থেকে এইসব দেশের বিকাশ ভারত থেকে কম অসম নয়। তাকে ঐক্যবদ্ধ রাখা কম জটিল সমস্যা নয়। কমিউনিস্ট দুনিয়ায় সে নেতৃত্ব তৈরি হতে দেরি হচ্ছে।

তাছাড়া যতক্ষণ তৃতীয় দুনিয়া দুর্বল, ততক্ষণ ধনতন্ত্র বেঁচে থাকবে। দ্বিতীয়ত ১৯৬০ সালের পর একটা যে দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব ধনতন্ত্র ঘটিয়েছে—তার হিসাব না করে মার্ক্সবাদীরা কেবল ধনতন্ত্রের সংকটের কথা বলে। একদিকে কমপিউটার এবং অন্যদিকে Electronic machine-based culture মানুষকে বিচ্ছিন্ন, আত্ম-সুখ-সর্বস্ব এবং ভোগবাদী করছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে শিল্পকলা বাজারে বিক্রির জন্য হাজির করতে হয়—তার স্রষ্টা শিল্পীর তাই দুটি চরিত্র—একই সঙ্গে স্রষ্টা ও পণ্য। কার্ল মার্ক্সের ভাষায় অর্থের বিনিময়ে যে পণ্য পাঁচজনের রুচি তৃপ্ত করার জন্য তৈরি তার জন্য এক ধরনের বেশ্যাবৃত্তি বাধ্য হয়ে অবলম্বন করতে হয়। শহুরে শিল্পকলা তাই চেতনা বৃদ্ধি করার পরিবর্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে জগদীশ বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পরে সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহার—জায়গায় এখন আমাদের শহুরে পুঁজি সত্যজিৎ, মৃণাল ও শাবানা আজমিতে ঠেকেছে। ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক। সার্ত্রের পর ইউরোপে আর কে আছেন?

মার্ক্সবাদী আদর্শ নিয়ে যাঁরা আজো কাজ করছেন, প্রাণ দিচ্ছেন—তাঁদের সবিনয়ে জানাই—স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক কৌশল, এজিট-প্রপ শিল্পকলা এবং দ্রুত ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ছেড়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করুন। এই বছরের শুরুতে দুটি কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস হয়ে গেছে। তাতে প্রতিনিধিদের শ্রেণীগত

যে পরিচয় দেওয়া আছে—তা থেকে অনেক কিছু বোঝা যায়। সি. পি. আই. কংগ্রেসে (কলকাতা) এক হাজার প্রতিনিধি এসেছেন। এঁদের মধ্যে মাত্র ১৩৮ জন শ্রমিক শ্রেণীর, ২৮ জন কৃষি শ্রমিক এবং ১৩ জন ভূমিহীন কৃষক। কেরালাতে অনুষ্ঠিত সি. পি. আই. (এম) কংগ্রেসে ৬৪৩ জন প্রতিনিধিদের মধ্যে ৮৭ জন শ্রমিক শ্রেণীর, ১৮ জন ক্ষেতমজুর, ৬৫ জন গরিব ও মাঝারি কৃষক। পঞ্চাশ বছর কমিউনিস্ট আন্দোলনের পর এই অবস্থা! ভারতের অন্য যে-কোনো রাজনৈতিক দলের তুলনায় এই দুটি পার্টি তৃণমূলে কাজ করে, কিন্তু সেই দুই দলে যদি শ্রমিক ও কৃষকদের পরিবর্তে উচ্চ শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে—তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কথাটার অর্থ কি হয়? নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং আংশিক রাষ্ট্র ক্ষমতা রাখার পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অনেক অর্থনীতিবিদের মতে কংগ্রেস শাসনে প্রতি রাজ্যে কুলাক শ্রেণী শক্তি সঞ্চয় করাতে তাদের সঙ্গে বৃহৎ সর্বভারতীয় পুঁজির লড়াই চলছে বলে Regionalism বা আঞ্চলিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে জাতপাতের সম্পর্কও আছে। রাজস্থানে রাজপুত আর জাঠদের মধ্যে, পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে, গুজরাটে বেনিয়া ও কোলির মধ্যে, মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও মহারদের মধ্যে, অন্ধ্রতে কুম্মা ও রেড্ডিদের মধ্যে, কেরালাতে নায়ার ও এজাভা, কর্নাটকে ভোক্কালিগ ও লিঙ্গায়েৎ-এর মধ্যে, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতে আদিবাসী এবং আসামে বোড়োদের সঙ্গে যে বিরোধ—তার ওপর মার্ক্সবাদী আন্দোলনের প্রভাব কতটুকু?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ যেমন দুর্বল হলো—তেমনি প্রথমে লাভবান হলো—সদ্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়ারা, ধনিকশ্রেণী। যেহেতু তাদের দেশের উন্নতির জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারস্থ হতে হয়েছে—সেই হেতু তাদের অনেককে সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতে চলতে হয়েছে। একই সঙ্গে নিচুতলার জনগণের চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে—যাকে সর্বহারার চেতনা বলা যায় না। একে সদ্য-জাগ্রত জনগোষ্ঠীর Ethnic group-এর বিকাশের প্রবল ইচ্ছার প্রকাশ বলা যায়। আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা—শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কোনোকালেই এই বিকাশের পক্ষে কাজ করেনি। দার্জিলিং-এ কমিউনিস্টরাই প্রথমে গুর্খাদের স্বাধিকার বোধে জাগ্রত করে—অথচ তারা সেখানে কেন মার খেল—এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা অনুসন্ধান করি—তাহলে বুঝতে পারব—সংগ্রাম করে সামান্য সামান্য অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করার পর তাদের মন আরো কিছু চাইছিল—যার খবর কমিউনিস্টরা

রাখত না। এই মনের খবর পাওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন। বাংলা সাংস্কৃতির এক দিকপাল—প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—সাহিত্য চিঁড়ে ভিজাতে পারে না—কিন্তু মন ভিজাতে পারে। এই উপদেশ মার্ক্সবাদীদের পক্ষে আজো অমোঘ।

[অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ধ্রের পিপলস্ লিটারারি ও কালচারাল ফেডারেশনের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে।]

স্বাধীনতা

গুণানন্দ ঠাকুর

আজি ৩০শে শ্রাবণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। আমি অধমাধম গুণানন্দ ঠাকুর একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। বিষয় স্বাধীনতা। পাঠক আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি তুমি তারিখটির তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পার নাই। তোমার কোনো দোষ নাই। তুমি পয়লা বৈশাখ এবং ২৫শে বৈশাখ ছাড়া অন্য কোনো দিবস সম্বন্ধে অবহিত নও। তোমাকে আর ধন্দের মধ্যে রাখিব না। ইংরাজীমতে আজি ১৫ই আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা দিবস।

বুড়া গুণানন্দ যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বিবাহের পূর্বেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। শুধু বিবাহ কেন যে-কোনো প্রকার অনুষ্ঠানেই পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করাই বিধেয়। হে পাঠক তুমি আমার সহিত উচ্চারণ কর সামবেদের সেই অসাধারণ মন্ত্র—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংভূবুর্য্যা অন্তঃরীক্ষা উতঃ পার্থিববীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তল আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।"

পাঠক স্বাধীনতা দিবসে তুমি কাহাকে স্মরণ করিবে? অবশ্যই সেইসব মনুষ্যগণকে যাহারা তাঁহাদের শ্রম দিয়া শোণিত দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা আনিয়াছেন, স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হ্যাঁ পাঠক বিদেশী প্রতিষ্ঠিত বিদেশী বিজয় উপলক্ষে নির্মিত সুউচ্চ মিনারকে শহীদ মিনার বলিয়া সম্বোধন করিলেই তোমার কর্তব্যকর্ম শেষ হয় নাই। তাহার মস্তকভাগ লালরঙে রঞ্জিত করিলেও তাহা বিপ্লবী কার্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। বুড়ো গুণানন্দ উহার মধ্যে শুধুমাত্র মূর্খামি এবং বজ্জাতি ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পায় না। অনেক চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পায় নাই। সত্য তুমি অফিস এলাকার নাম তিনজন বিপ্লবীর নামে রাখিয়াছ। তুমি অতীব মূর্খ। তোমার মূর্খামির জন্য বিপ্লবীরা বিবাদী হইয়াছে। ইহা পাপ। ইংরাজ যেসব রাস্তা বানাইয়াছিল সেই রাস্তা তুমি ধ্বংস করিয়াছ। তাহার পর সেই রাস্তার নাম বদলাইয়া তাহা ভারতবর্ষের মনীষীদের নামে রাখিয়াছ। যাহারা এইসব কার্য করিয়াছে তাহারা অলস, বুদ্ধিবৃত্তিহীন, চতুর—ঠগ। পাঠক তুমি বলিবে 'আমি করি নাই সরকার করিয়াছে।' অবশ্যই সরকার করিয়াছে। কিন্তু পাঠক তুমি প্রতিবাদ করিয়াছিলে? তুমি তো গণতান্ত্রিক দেশে বাস কর। গণতন্ত্রে ব্যক্তির বড় মর্যাদা।

তাহার প্রতিবাদকে শাসক সম্প্রদায় ভয় করিতে বাধ্য হয়। তুমি প্রতিবাদ করিলে তাহা গর্জনের মতো ধ্বনিত হইত।

পাঠক ক্ষুদ্র নিবন্ধের প্রারম্ভেই তোমাকে কটুকাটব্য করা গুণানন্দর উচিত হয় নাই। তবে এই বৃদ্ধ বয়সে গুণানন্দ ক্ষুব্ধ। কারণ স্বাধীনতা গুণানন্দ দেখিতে পাইতেছে না। গুণানন্দ স্বাধীনতার বড় ভক্ত। স্ব-অধীন। নিজ বিবেক ছাড়া আর কাহারো যে অধীন নহে সেই স্বাধীন। পাঠক তুমি প্রশ্ন করিবে সবাই স্বাধীন হইলে দেশ চলিবে কি প্রকারে। সবাই স্বাধীন হইলে সবাই বিবেকের দ্বারা চালিত হইবে। আর সেইযুগ উপস্থিত হইলে তাহাকে আমরা স্বর্ণযুগ বলিব। পাঠক আরেকটি সন্দেহের নিরসন কর। বুড়া হইলেও গুণানন্দ জানে স্বার্থবুদ্ধি-ই আসল বুদ্ধি। ইহাতে গুণানন্দ কোনো অন্যায় দেখে না। মানুষ মন্ত্রবলে সকলে ভগবান হইয়া যাইবে ইহা মূর্খ হইলেও গুণানন্দ আশা করে না। কিন্তু গুণানন্দ আশা করে মানুষজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থর দাস হইবে না। বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নজর রাখিবে। কয়েকটি অপ্রিয় দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বুঝিতে সুবিধা হইতে পারে। গুণানন্দর নিজ রাজ্যে রাজ্য কোষাগার হইতে বিরাট পরিমাণ অর্থ অন্তর্হিত হইল। যেহেতু অর্থের পক্ষ নাই তাই পক্ষ বিস্তার করিয়া সে অদৃশ্য হইতে পারে না। সুতরাং সে অর্থ যে লইয়াছে সে তস্কর। রাজ্যের কর্ণধারগণ আশা করা যায় তস্কর খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কার্যত বুড়া কি দেখিল। দেখিল তস্কর খুঁজিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই। শাসকগণ তস্করদের রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। এবং সার্থকভাবে তাহাদের রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইহা ঘৃণ্য। শাসকগোষ্ঠীতে বহু ভদ্রজন আছেন। কিন্তু তাঁহারা দলের স্বার্থে তস্কর পোষণে সাহায্য করিতেছেন। ইহাকে গুণানন্দ স্বার্থ-বুদ্ধি বলে না। দিল্লীর মসনদে আসীন যে যুবক তাহার কার্যকলাপও লক্ষ করো পাঠক। দেখিবে তিনিও একই ভাবে তস্করবৃত্তি সমর্থন করিতেছেন। সরকার কামান কিনিল। সরকার কাহাকেও দালালি প্রদান করিল না। কিন্তু কয়েক হাজার কোটি টাকা হস্তান্তর হইল দালালি হিসাবে। আমাদের যুবক প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য বিশ্বাস করিলে বিশ্বাস করিতে হয় যে আমরা কাহাকেও দালালি দিই নাই। কিন্তু কিছু অজানা অচেনা দুর্বৃত্ত দালালি লইয়াছে কামান প্রস্তুতকারীদের নিকট হইতে। পাঠক ভাবিয়া দেখ তুমি একখানি গাড়ি কিনিলে আর তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু ব্যক্তি দালালি লইল। ইহা অসম্ভব মনে হয় তো? কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদিগকে তাহাই বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন। আমাদের পরমপূজনীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী দুজনেই তস্করদের রক্ষা করিতেছেন। দুইজনা দুই দলের। দুই

দলের জুড়ির দল এক ধুয়া তুলিয়া চলিয়াছে সব মিথ্যা সব মিথ্যা। গুণানন্দ বলে সবই মিথ্যা সত্য শুধু অর্থ চুরি যাওয়াটা।

এইবার পাঠক আইস আমরা কি করিয়াছি তাহা দেখি। কামানের ব্যাপারে আমাদের দেশের বিরোধী দলসমূহ প্রচুর হল্লা করিতেছে। আগামী ১৩ই ভাদ্র একটি ভারতব্যাপী ধর্মঘট ডাকা হইয়াছে। গুণানন্দর ন্যায় বৃদ্ধ হইতে শুরু করিয়া সদ্যোবুদ্ধিপ্রাপ্ত বালক-বালিকাও জানে এই রাজ্যে ধর্মঘট সফল হইবে। কারণ সরকার স্বয়ং সমস্ত কিছু বন্ধ করিয়া দিবেন। নয়তো ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীরা করিবে। কামান কেলেঙ্কারীর প্রতিবাদ আবশ্যক, কিন্তু ১৩ই ভাদ্রর প্রতিবাদ, প্রতিবাদ নহে। যে ব্যবস্থায় দিনমজুর ব্যতীত কাহারও কোনো ক্ষতি নাই সে প্রতিবাদ নিরর্থক। পাঠক ভাবিয়া দ্যাখো অপরপক্ষের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী কিঞ্চিৎ হীনবল বলিয়া রাজ্য কোষাগার লইয়া কোনো প্রতিবাদ ওঠে নাই।

এই প্রতিবাদ নিষ্ফলা কারণ ইহাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নাই। পাঠক তুমি স্মরণ কর ১৩১৫ সালের শ্রাবণ মাসের ছাব্বিশ তারিখের কথা। সেইদিন বালক ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসিকাঠে হত্যা করা হইয়াছিল। সেই দিন ব্যক্তি মানুষ প্রতিবাদ করিয়াছিল। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ধর্মঘটের সহিত অরন্ধনের একটি নিবিড় যোগ ছিল। যেদিন ধর্মঘট সেদিন কাহারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়িত না। এই প্রতিবাদে সকলেই কিছুটা স্বার্থত্যাগ করিত। অদ্যকার ধর্মঘট করণিকের ধর্মঘট। তাহাদিগের একটি অতিরিক্ত দিন ছুটি হইল। দিনমজুরগণের অরন্ধন হইল বটে তবে করণিকের স্বার্থে সেই উপবাস তাহারা মানিতে বাধ্য।

কিন্তু ভাবিয়া দ্যাখো পাঠক আমরা অগণিত ভারতবাসী মুখ্যমন্ত্রীকে, প্রধান-মন্ত্রীকে পত্র পাঠাইতেছি আপনি যাহা করিতেছেন তাহা অন্যায়। ভাবিয়া দ্যাখো কোটি কোটি পত্র এই দুই ব্যক্তিদের দফতরে গিয়া জমা হইতেছে। তাঁহারা সেই পত্রের স্তূপের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। ওই নিষ্ফলা ধর্মঘটের সহিত তুলনায় ইহা অনেক ফলপ্রসূ হইত। কারণ তাঁহারা কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদ স্বচক্ষে দেখিতেন। ইহার নাম স্বাধীনতা। আমাদের সংবিধান অজস্রবার পরিবর্তন সত্ত্বেও পাঠক তোমার এই পত্র লিখিবার স্বাধীনতা কাড়িয়া লয় নাই। কিন্তু পাঠক তুমি কি এই স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে উৎসাহী? তুমি কি উদ্যোগ লইবে? মনে রাখিও অতন্দ্র প্রহরার মূল্য না দিয়া স্বাধীনতা রক্ষা অসম্ভব।

পাঠক তুমি নিশ্চয় উপনিষদের সেই সংকল্প বাক্য পড়িয়াছ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। সুতরাং তুমি জান আমরা অন্য একভাবেও স্বাধীনতা হারাইয়াছি।

আইস ঋত এবং সত্যের জন্য এই স্বাধীনতালুপ্তির স্বরূপ আমরা অনুধাবন করি। পাঠক তুমি লক্ষ করিয়া থাকিবে দেশে এখন প্রচুর প্রতিষ্ঠান হইয়াছে যাহাদের একমাত্র কার্য ঋতসত্যবর্জিত তথ্য পরিবেশন করা। ইহারা বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান বলিয়া কথিত। ইহারা একদা রাত্রিউপবাস বলিয়া একটি রোগ আবিষ্কার করিয়াছিল। একটি পানীয় নাকি রাত্রিউপবাস [নৈশাহার এবং প্রাতঃকালের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে নাকি এই রোগ হইত] হইতে রক্ষা করিত। আমি অর্ধশত বৎসরেরও পূর্বের কথা কহিতেছি। আজ অর্ধশত বর্ষ পরেও সেই পানীয় কোম্পানিটি বিজ্ঞাপন দেয় যে ওই পানীয় খাইলে শক্তি বৃদ্ধি হয়। কিঞ্চিৎ শর্করা যুক্ত দুগ্ধ ওই পানীয় হইতে শতগুণে শক্তিবৃদ্ধিকারক। কিন্তু মিথ্যা বিজ্ঞাপনের মোহে বহু লোক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এই পানীয় কিনিয়া থাকেন।

এই অনৃতভাষণ ক্ষতিকারক তবে ইহার অপেক্ষা আরেক ধরনের অনৃতভাষণ অনেক বেশি ক্ষতিকারক। এইসব বিজ্ঞাপন মানুষের অন্তরে অভাববোধ জাগ্রত করিয়া থাকে। সত্যকারের অভাব নহে মিথ্যা অভাব। এইসব বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মই হইল মানুষকে লোভী করিয়া তোলা। যখন সম্পূর্ণরূপে ভদ্র পোশাক অল্পমূল্যে লাভ করা সম্ভব তখন তাহারা মানুষের মনে অতৃপ্তি জন্মায় মহার্ঘ বস্ত্রের বিজ্ঞাপন দ্বারা। তাহাতে লক্ষ্য করিলে দেখিবে বিলাসবহুল স্থানে সুদর্শন/সুদর্শনারা অথবা স্বনামধন্য কোনো অভিনেতা বা ক্রীড়াবিদ সেই মহার্ঘ বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘুরিতেছেন। যেসব সাধারণ মানুষের পক্ষে ওই জীবনধারা কোনোমতেই পাওয়া সম্ভব নহে তাহারাই ওই মহার্ঘ বস্তু সংগ্রহে উৎসাহী হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত তাহারা নূতন রন্ধন যন্ত্র, একটি নূতন দূরদর্শনবীক্ষণ যন্ত্র, একটি নূতনতর দ্বিচক্রযান। দর্শকের মনে অভাব সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবেশীর বাড়ি সেই সামগ্রী উপস্থিত হইলে অশান্তির আর সীমা থাকে না। যেনতেন প্রকারেণ সেই বস্তু সংগ্রহ করা তখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। ইহার ফলে মানুষ ঋণ করে কখনো কখনো চৌর্যবৃত্তিতেও রত হয়।

পাঠক লক্ষ্য কর যেরূপ রাজনীতিতে সেইরূপ দৈনন্দিন জীবনেও আমরা আর স্ব-অধীন থাকিতেছি না। আমাদের পক্ষে কিছু লোক আমরা কি পরিধান করিব, কি আহার করিব, তাহা ঠিক করিয়া দিতেছে। এই বিজ্ঞাপনদাতারা এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যও শাসন করিতেছে। এই 'বিভাব' পত্রিকা প্রকাশ করিতেও স্নেহাস্পদ সমরেন্দ্রকে এই বিজ্ঞাপনদাতাদেরই সাহায্য লইতে হইতেছে। আজ তাহারা হয় গুণানন্দ ঠাকুরকে চিনে না নয়তো বৃদ্ধর ভাষণে তাহারা শঙ্কিত নয় অপমানিত

নয়। কিন্তু আগামীকল্য যদি তাহারা গুণানন্দ কিংবা অন্য কাহাকেও অপছন্দ করিয়া ফেলে তাহা হইলে সমরেন্দ্র সেই লেখক কিংবা সেই বিজ্ঞাপনদাতার মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লইতে বাধ্য হইবে। সমরেন্দ্র বাবাজীবনের 'বিভাব' ভালোবাসার বস্তু সে হয়তো গুণানন্দকেই বাছিয়া লইবে (মূর্খামি হইবে) কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান সাহিত্য পত্রিকা বাহির করিয়া থাকে অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত তাহাদের নিকট এ বিষয়ে কোনো দ্বন্দ থাকিবে না।

এই অবস্থাও আমরা এড়াইতে পারি যদি আমরা স্ব-অধীন হই। একটি পত্রিকা বাহির করিতে অনেক ব্যয় হয়। পাঠক তুমি যে পত্রিকার এই সংখ্যাটি পড়িতেছ তাহার জন্য মূল্য দিয়াছ? তুমি যদি না দাও অন্য লোকে দিবে। তুমি সৎ সাহিত্য পাইবে না। ক্ষতি তোমার। ক্ষতি সমাজের।

আজ এই স্বাধীনতা দিবসে পাঠক আইস তুমি আর আমি আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ঘোষণা করি। আমি বৃদ্ধ অশক্ত তথাপি আমি স্বাধীন থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি বাকী সামান্য যে-কটি দিন বাঁচিব স্বাধীন থাকিব। চিন্তায় কার্যে স্বাধীন রহিব। পাঠক তোমাকে বিনা গুণানন্দর অস্তিত্ব নাই। তুমিও স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিও। দেখিবে মুকুরে নিজ মুখ অবলোকন করিয়া তৃপ্তি পাইবে।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু: সহবীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি মাবধীমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

নরেশ গুহর কবিতা

[বাংলা কবিতায় দশকের দুর্দশা কাটবার নয়। কোনো কবি, ঠিক কোন সময় থেকে লিখতে সুরু করেছিলেন, বা পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—কোন লক্ষণটি যে দশকর্দ্দশাআক্রান্ত কাব্য আলোচকদের নিরখ, তা আজো স্পষ্ট হলো না! কবিতার এ-ধরন সময়সূচক জ্ঞাপনে আমাদের বিশ্বাস না থাকলেও, উল্লেখযোগ্য প্রায় সব কবিই দশকে নির্দেশিত হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই। এই অ-ব্যতিক্রমী শনাক্তকরণপ্রথায় নরেশ গুহ চল্লিশের অন্যতম স্মরণযোগ্য পুরোধা কবি বলে চিহ্নিত!

মনে পড়ে এতাবৎকালের শ্রেষ্ঠ কবিতাপত্রিকা বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকাটির কথা (অনেক পরে যার একমাত্র তুলনীয় দোসর হয়ে উঠেছিল "কৃত্তিবাস")। মনে পড়ে "কবিতা" পত্রিকায় নরেশ গুহ-র সেই অসামান্য সব কবিতার কথা। পাঠকের তো মনে না পড়ার কারণ নেই "দুরন্ত দুপুরের" সেই সংহত কাব্যলাবণ্যের কবিকে! আমরা বলতে বাধ্য, শুধু দুপুরই নয় অনেক বিনিদ্র রজনীর আনন্দসঙ্গী হয়ে উঠতে পেরেছিল এই কাব্যগ্রন্থটি।

চল্লিশের সেই উচ্চগ্রীব কবি নরেশ গুহ জানি না তারপর কি অজ্ঞাত কারণে প্রায় লোকলোচনের আড়ালে চলে গেলেন! গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে তার রচনা চোখে পড়েছে ক্বচিৎ। আমি নিজেকে নরেশ গুহ-র অত্যন্ত আসক্ত পাঠক বলে মনে করি, আমার সরেজমিন চোখেও উল্লেখিত সময়ে পাঁচ-ছটির বেশি কবিতা চোখে পড়েনি। জানি না কি অগোচর কারণে, নাকি অদমনীয় অভিমান বা আত্মসম্মানবোধে, আত্মনির্বাসন বেছে নিয়েছেন! যে "লোহার গরাদ ঘেরা আম্র-কুঞ্জে কবিতার ক্লাস" হয়, সেই শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীর এক প্রত্যন্তপ্রান্তে তিনি এক শান্ত, সমাহিত জীবনযাপন করছেন। এক ক্রমশ গড়ে ওঠা বাগান, বিটপী-মর্মর, খোয়াই-এর পূর্বদিগন্তে প্রভাতসূর্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও যেন আকাশে উঠে আসতে দেখেন রোজ তিনি!

বলাবাহুল্য, নরেশ গুহ কখনোই তেমন উচ্চকণ্ঠ নন, সময়ের যে সব চিহ্ন, তোলপাড় রাজনীতি বা সমাজমনস্কতা, তাঁর সমসাময়িক অনেক কবিকে খ্যাতি-চিহ্নিত করেছিল, তিনি সচেতন ভাবেই তার থেকে শতযোজন দূরে থেকেছেন

চিরকাল। তবে হাততালির লোভ সম্বরণ করা তার উচিত হয়েছিল কিনা, বা সময়চিহ্নিত ঘটনাবলী এড়িয়ে থাকা কোনো সৎ কবির কাছে প্রত্যাশিত কিনা, সেটা অন্য এক আলোচনাসাপেক্ষ প্রশ্ন! আমার এটুকুই আরাম যে দীর্ঘকালের প্রবহমান তাগাদা যখন প্রায় উপদ্রবের আকার ধারণ করেছিল, তখন, অগত্যাই কবিকে তার লেখার টেবিলে বসতে বাধ্য করাতে পেরেছিলাম আমি। এর একটি মাত্রই কারণ ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর কবিতামনস্কতা লক্ষ করে, আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, তাঁর ভিতরের কবিটি এখনো ভয়ানকভাবে জেগে শুধু আত্মগোপনে আছেন।

অবশেষে শেষ অবধি দুটি সদ্য লেখা [বা লেখানো!] কবিতা আমরা পেলাম। দুটি কবিতাই প্রমাণ করবে তাঁর কবিতার কব্জি এখনো কত জোরালো, ছন্দদক্ষ এবং শিল্পসর্ত-পারঙ্গম! বহুদিন স্তব্ধতার পরে লেখা হলেও মনস্ক পাঠক কবিতা-দুটিতে সবিস্ময়ে এক সম্পূর্ণ নতুন উত্তরণ লক্ষ করবেনই! অবশ্য এর মূল সূচনা ছ'সাত বছর আগে দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি অসামান্য কবিতায় লক্ষ করা গিয়েছিল। কবির এককালের প্রথাসিদ্ধ আপাত-পেলব সৌন্দর্যের সঙ্গে কি অবাক দ্রবণে মিশে গিয়েছে এক ক্ষুরধার বিবেক উন্মোচনসক্ষম বিদ্রূপের প্রচ্ছন্ন সুষমা। কি তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তাতে মিশিয়েছেন রোমান্টিক লাবণ্যের গভীরতা।

আসলে আধুনিক বাংলা কবিতার পশ্চাৎ ও প্রবহমান ধারার নিরিখে নরেশ গুহ চিরকালই এক অবশ্যচিহ্নিত কবি, তাঁর সমগ্র কবিতাবলী নিয়ে এক ব্যাপ্ত সঞ্চারী আলোচনার প্রয়োজন, এবং তা অনতিবিলম্বেই। যদিও তিনি বর্তমান প্রতি-বেদককে একটি চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন "এক জীবনে মাত্র এক-মুঠোর মতো কবিতা লেখা কোনো বাহাদুরির ব্যাপার নয়," কিন্তু আমরা যারা কবিতাপথিক, তারা তো জেনেই গেছি পরিমাণ নয়, লিখিত কবিতার পরিমাপের নন্দনযোগ্য-তাতেই একজন কবি তার সমসময়কে অতিক্রম করেন।—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত]

দুটি কবিতা

নরেশ গুহ

একদা-উর্বশী

তাকে চেনা ভার :
রোদনরূপসী নারী,
অনুমানে বুঝতে পারি
করেনি সংসার।
তাকে চেনা ভার।

আপাতত মনে হয়
মগ্ন কিছু গবেষণা নিয়ে।
কি জানি ভেঙেছে কিনা বিয়ে।

নির্মম নির্দয় কোনো
ভাস্করের নিজ হাতে গড়া
একবেণী ওই স্বয়ম্বরা
উত্তমা
শোভনা
বামা
অমলিনা
একদা-উর্বশী ?
কখনো কি ছিল না ষোড়শী ?
অন্ধকারে
কুয়াশায়
মুছে গেলে নিত্য-চেনা পথ,
দিগ্বিদিকে ক্ষ'য়ে গেলে
বিচক্ষণ পাহাড়পর্বত,

অপলাপী অবেলায়
একা তাকে করা কেন দোষী ?

হ'তে পারে—
ছড় টেনেছিলো ভুল তারে।
হ'তে পারে—
জাহাজ আসেনি ফিরে
বড়ো ঝড়ে, অকূল পাথারে।
প্রণয়ে পাশার দানে,
হ'তে পারে, হয়েছিলো হার।
ভালো ক'রে চেয়ে দেখো,—
তাকে চেনা ভার।

হার সে মানেনি, ব্যাগে
পুরেছে রুমাল,
আপনি শুকিয়ে গেছে
অনাদরে ভেজা চোখ গাল।
ফিরেছে প্রাচীন দুর্গে,
ভাবনার গবেষণাগারে :
কালরাত্রি যদি কাটে,
মৃত্যু ছুঁয়ে যদি বাঁচতে পারে।
কী ভালো ? বাঁচা, না মরা ?
কাকে মালা দেবে স্বয়ম্বরা ?

বিশাল বিক্ষণীযন্ত্রে
কিছুটা উদ্ভ্রান্ত বুঝি,
হাড়ে শীত, বক্ষে ম্লানালোক।
জঞ্জাল-টুকরিতে গেছে
তীরের ফলায় বেঁধা শ্লোক।

উঠে গিয়ে কী ভেবে হঠাৎ
ডেটলের শাদা জলে
মুছে ফেলে আঁষটে মুখ হাত।
লেন্সের তলায় আলো জলে,
একে-একে ফলে
দূর বসন্তের নষ্ট
মুঠো-মুঠো ফুলের পরাগ,—
পরাস্ত প্রাণের ক্ষীণ দাগ,
বহু যুগযুগান্তের বাসি,
মৃত্যুর পাতাল ফুঁড়ে তোলা
রং-ভোলা,
গন্ধ-ভোলা,
নিষ্ফল ফসিল রাশি-রাশি।
নোট নিতে খোলে নোটবই।
ক্ষীণমধ্যা এ-নারীর
এ-জীবনে হার হ'লো কই?

কে জানে উত্তর? প্রতিদিন
উদাসীন সূর্য যান পাটে।
দিনান্তে খোয়াইতে শুয়ে ব'সে
উটকো লোকটা,
শুঁটকো লোকটা,
দাঁতে ঘাস কাটে॥

২৫ অগস্ট ১৯৮৯
শান্তিনিকেতন

গাধা বিষয়ে স্বগতোক্তি

[মীরা বেন-কে চিঠিতে বাপু যাকে বলেছিলেন 'this ass']

অনেক গ্যাছে সওয়া, অনেক
বিশদ হাসি মস্করা:
আর পারিনে, গাধাটাকে
গেলোই না যে বশ করা।
একটা কথায় কান পাতে না,
কেবল থেকে-থেকে
কিম্ভূতকিমাকার স্বরে
হঠাৎ ওঠে ডেকে।
কেন ডাকে, কাকে ডাকে,
শক্ত ধরা।
বজ্জাতি। এ আমার নিন্দে
বিশ্বে রাষ্ট্র করা।

পাঁচটা নয়, সাতটা নয়,
ওই তো সবে ধন,
কী করবো কন্, যখন পারি তুষি,
তাতে যদি জন্তুটা রয় খুশি,
সময়-অসময়ে যদি
না-করে বিরক্ত।
হায়রে, ভাবা যত সহজ
করা ততই শক্ত।

জন্ম থেকে সঙ্গে আছে সেঁটে।
অখিল খিদে এবং যতো
কুপ্রবৃত্তি পেটে।
সময়-সময় রসজ্ঞানী
শুনে খাদের ঝ,

রোগা লেজটা নাড়তে থাকে।
গা করে রিরি।

কতো বুঝিয়েছি—ওরে,
স্বভাবটা পাল্টাস,
খাসনে অমন খচমচিয়ে
আবোলতাবোল ঘাস :
সুনীল দাস আঁকবে না তোর ছবি
যদ্দিন না ঘাড়-বেঁকানো
গোঁয়ার ঘোড়া হবি।
যা দেখি তোর মতিগতি
হবে না সেই পদোন্নতি।
শুনে, বিজ্ঞ হেসে, গাধা
ছড়ায় হাতপাগুলো,
গায়ে ঘষে, মাথায় ঘষে,
যত রাজ্যের ধুলো।

সান্ত্বনা এই, শেষের সে-দিন
থাকবি রে তুই প'ড়ে
কুলুপ দেবো যেদিন আমি
মাটির এ-ঘরদোরে।
হবে চিরকালের ছাড়াছাড়ি
দেবো যেদিন দিকহারা সেই
উদাস নদী পাড়ি।

—বিবাদ শুনে দাঁড়ালেন যে,
যান না, কেটে পড়ুন,
দেখছেন তো ঘরোয়া এই
খিটিমিটির শেষটা কিছু করুণ।

তবু মশাই, হাঁ ক'রে যে
তাকাচ্ছেন বড়ো!
(গাধারে, এই বাবুদেরকে
একবারটি গড় করো।)
আকর্ণ যে বেগনি হ'লেন!
দেহ থাকলে হবে না অশ্লীল?
বন্ধ রাখুন গিয়ে মশাই
নিজের-নিজের শোবার ঘরের খিল।
কার না-থাকে পোষা গাধা?
আপনি বুঝি বাদ?
নজ্জা ঝেড়ে বলুন সাহেব
তেনার কী সংবাদ?

২৮ অগস্ট ১৯৮৯
শান্তিনিকেতন

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

[উননব্বুই বছরের টাটকা যুবক সরোজিনী-অনুজ কবি হারীন্দ্রনাথ (হারীন নামেই অধিকতর খ্যাত) চট্টোপাধ্যায় এক জীবন্ত কিংবদন্তী। গানে (তাঁর স্বকণ্ঠে নিজের সুরে সূর্য অস্ত হো গ্যায়া, গগন অস্ত হো গ্যায়া কে ভুলবে !), কবিতায়, অভিনয়ে অসামান্য ভাষণে, আই. পি. টি.-এর সংগঠনে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে, কবিতায় উত্তর-প্রবণ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে, ছয় দশকেরও বেশি সময় তিনি জলন্ত জীবন যাপন করে চলেছেন জীবনেরই অকৃত্রিম ধর্মে। আমাদের কাগজের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন পার্বতী মুখোপাধ্যায় ও শিল্পী চিরু চক্রবর্তী। চিরু চক্রবর্তী-র বোম্বাই-এর বান্দ্রার বাড়িতে সাতবছর আগে ১৯৮৪ সালে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় তখন হারীন্দ্রনাথেরও বয়স ছিল চুরাশি।

এই সাক্ষাৎকারে, নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপকুমার রায় ও আরো অনেক ভারতবিখ্যাত চরিত্র প্রাসঙ্গিক ভাবে এসেছেন। অনেক তীব্র মন্তব্য উচ্চারিত হয়েছে, যার সঙ্গে পাঠক হয়তো একমত হতে নাও পারেন ! কিন্তু এমন মুক্তমন হৃদয়ের আগল-খোলা সাক্ষাৎকার হারীন্দ্রনাথ

এর আগে কখনো কাউকে দেননি। অনেক বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। কিছু কিছু মন্তব্য দোলাচলও জাগাতে পারে, সন্দিহানও করে তুলতে পারে পাঠককে। কিন্তু শুধুমাত্র উপভোগ্যতার নিরিখেও এটি একটি উত্তেজক সাক্ষাৎকার !

যেহেতু টেপ থেকে লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে, তাই সুদীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারে কেমব্রিজ শিক্ষিত হারীন কবির কথোপকথনে যতিচিহ্ন আমাদের সুবিধেমতো দিতে হয়েছে। লেখার ব্যাকরণ থাকে, কথায় কোনো ব্যাকরণ সাধারণত থাকে না। পাঠককে এইটুকু শুধু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বোঝা যায়নি বলে একেবারে শেষের কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বাদ দিতে হলো। সম্পাদক : বিভাব]

Q. O. K. Harindra, I'll ask you first one question which is a most important question. You are living for so many years and living in a very alert agile and nice way, living way, what is your driving force behind your life ?

A. A life itself is nothing greater than the driving force of life. What happened to most of us that we say we are tired of life—it means life is tired of you when you say you are tired of life. Life is the driving force that need not cease. I wrote this—going to cease for a long time—yet to come the way —I am going on being driven rather kicked from behind my life which takes me onward.

Q. Oh, it is very interesting. Life indeed is its Driving Force. Harinda if I divided the entire age i.e. your living age into 3 broad sections in your youth, middle age and now. Now everywhere did you find all your creative instincts, creative faculties and creative activities, were remained the same as did it change as the time went on ?

A. Well, I think for me even small. I can remember, ever since I became conscious and that was when I was 8 yrs. old, I began to write at that age. In fact, at the age of 9 or 10, I do not remember quite that what that age was—but I know when Khudiram was hanged—I write four terrible lines which have been remembered by lots of people and Gokhale saw it and he said "My God, that boy is genious" it gives

me electric thrills. I think it will be nice for me to recite those lines :

Q. Oh, sure.

A. "When I am lifeless and upon the fire
My ashes will arise and sing in joy
It will proceed like music from the fire,
We would not, my Country, for this patriot boy
While we pass now, though I know
Captured we, I rise again and smash thy bond
and set thee free".

I could feel from this how I had felt and at that age I felt a fire unconsciously for my country, for my people without my knowing what I was feeling. That particular strain in me had gone on and on right through my manhood, my youth, right through my middle age, through my old age, even to-day. If I were called upon to come and lead something very big, I think with my physical condition – though is getting a little poor – but I think I'll be able to master up all the strength again for revolutionary. We are both revolutionary – all of us are really. The only thing is we do not know it, and to-day unfortunately we do not see people who really love their country and they know nothing about the soil, they know nothing about their country. I do not think that they are wonderful meddle that we were right throughout our life. I had not found very much changes as far as my writings are concerned except of course I, well, I have become very matured when I was young. I wrote books, even Rabindranath – he had 6 of my books in his possession. You read what he wrote in "Desh" about me, and it was remarkable. How inspired I was by Rabindranath ! When I was young he was my guru really and I had known him, he was very sweet to me, very kind to me and tears come into my eyes when I think of the generosity with which he accepted me as a brother-poet.

Q. Harinda, you wanted to be revolutionary but do you think there is any difference between a revolutionary and revolution ?

A. A vast difference. I have been a rebel right through, i.e. a very different thing. I hated injustice and grown disgusted of grampian rule, detention and...and that is why I feel a giant growing with love, in my lonesome road. My steps were sure and they never weaved. Yes life of ours is suffocated with half truths lying on everyside. How can you love if you have not hated ? How can you live if you have not died ? That's the rebel speaking, but a revolutionary does not speak in a personal way. Revolutionary's voice is a voice of a combined effort to smash up chains – that is the main thing about revolution but in India I am afraid revolution comes very slow. I do not know when it will come. It is very difficult to have a revolution in a vast country like ours. But I am always trusting there be a revolution, the inner revolution first then the outer.

Q. When you speak Harinda, I think in you a poet, a rebel is speaking. I want to know whether in you a rebel is important or a poet is important.

A. Well, it is a very interesting question. Now when I see, for instance a tree being cut down – I rebel and that is poetry. Because I am poet I rebel – my rebellion come out of a feeling of hatred for anything that is ugly, anything that is mean and unjust. My rebellion is that – I am a rebel poet. When I say a rebel poet, I mean a poet that rebels against any dirt, filth. I think there is no discrimination between a true poet and a true rebel.

Q. Harinda your point of view, as you said about your early youth, middle age and your present day – it is not changed – it is almost same...

A. Yes and even from the point of sex which is very important thing. It has played a very important part in my life. In fact I feel that without sex God himself could not manipulate or manage his universe. He is enjoying himself all the time through our sex and we have to keep it up. Since youth I have been an almost oversexed man. When I say

oversexed, I mean an intensity. When I see anything, not only. woman, when I see curves and lines anywhere, when I see a crevice in a rock I feel it that's being a kind of hymen being broken—I can't help thinking in those terms and sex for me has meant something tremendous. In fact it continues. You may be surprised to know that even untill to-day age has made very little difference to my intensity of passion and the fulfilment of it.

Q. Won't you call it infatuation ?

A. No I don't think so. Of course there are the moments when you have pure sex. In a sense that you have a kind of enjoyment which is not of that of love. It is of pure passion. A passion is a beautiful thing. Infatuation comes out of sub-conscious passion but I have really had sex on some very rare occasions—when I have been all out in a kind of warm, infinite really, really almost chaste love, a kind of love that did not expect anything back but the union was a union as if it was leading to a union with the divine.

Q. Would you think that what Freud called—Sublimation of libido, would you agree with Freud ?

A. No I don't at all. I do not agree with these intellectuals who had not the depth. Of the word Hindu, for instance, when I say Hindu I mean a certain consciousness not a sect or something like that. We i. e. Indians—who are real Indians (I am not talking of modern Indians—may be rare cases) but we have been taught ever since our childhood to look upon a life as a part of divinity, and I have done so. I have been a mystic all my life. Now there is no Question of sublimation of Libido. No. It is a Question of a straight, honest, straight-forward, fulfilment which does not need any kind of sublimation. It in itself is sublimation.

Q. আমি বাংলায় বলছি। হারীনদা, আপনি আপনার সারাজীবন ধরে যা বলতে চেয়েছেন তা কি বলে উঠতে পেরেছেন ? এটা এক নম্বর প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কোনো গোপনীয়তা সচেতনভাবে আপনি রেখেছেন কিনা, যে কথা কাউকে বলা যায় না—যেটা আপনার নিজস্ব একেবারে, যাকে বলা হয় সম্পদ, যেটা

কাউকেই দেবেন না—নিজে নিয়ে মরবেন ; অথচ যে আপনার চরিত্রকে গড়ে তুলেছে—এ রকম আপনার বলার কথা সব বলা হয়েছে কিনা এবং এ রকম কোনো গোপন নির্জন কথা আপনার আছে কিনা যা আপনি রেখে দেবেন ?

A. Very fine Question really. There is a certain part of our being which is entirely a bridal chamber in which certain things take place and they are secret. They are not to be exposed to people who are inquisitive. And I am sure those who are inquisitive would like to know this, what my love-life has been, whether I had hidden anything ? I have hidden very little. I am an open book and people know exactly i. e. Harindranath or Harinda the great romantic. The great who hides nothing. I have nothing to hide because I have got nothing to be ashamed of. Why should I hide anything ? Why should I hide the splendour of my sex ? Why should I hide the majesty of my outlook which depends on the majesty of my inlook about things. Its a tremendous thing to say.

Q. Can it be called a fixation also ?

A. May be, you call it by any name. I do not believe in words. I think words are the enemy of thought. Words are the enemy of truth.

Q. But still you deal with words.

A. We have to deal with words. In order to give hints to that which we cannot express through poetry we just give little hint to the consciousness of men who read and they get a new feeling. They understand it beyond the words. We use words, we have to.

Q. হারীনদা, আমি আবার বাংলায় বলছি।

A. বলো, বলো, বলে যাও···

Q. কবিতার কথাতে এসে পড়লে পর—এই যে কবিতার ভাষা আপনি যেমন বললেন যে কথা বড় সীমিত, কথা দিয়ে তো চিন্তাকে ধরা যায় না, একটু সাহায্য করা যায় মাত্র, যেটাকে বলা যায় provoke করা যায় মাত্র, কিন্তু তাকে ধরা যায় না। তাহলে কি আপনি বলতে চান যে আসলে কবিতায় সেই বিশালকে ধরার কোনো উপায় নেই, আসলে কবিতা সেই শব্দ বিস্ফোরণকেই ধরতে চায়—discharge of a sound, শব্দকেই ফাটাতে চায়। যে শব্দ বিশালকে ধরে আছে অথচ জানাতে পারে না। এটা কি কবিতার ক্ষেত্রে

tragedy না ভাষার tragedy-র, না কি আরো কোনো ভাষা আছে যা দিয়ে ধরা যায় ?

A. Yes there is only one speech through which we could interpret that which is uninterpretable i. e. stillness. I have believed in stillness. I have valued it far more than all speech. And the very fact that when I write or when I speak in public I am able to create a peculiar vibration which only hints the fact that I draw, or that I do from my stillness which is not of mine, which is the stillness which always I try to get at. I am always trying to get at stillness but you know actually I am nobody to try to get at stillness. Stillness is always trying to get us, to get at us. We do not get it by chance but now-a-days—a specially different, you will find me if you catch me in my home or anywhre in my room, you will find that less and lesser words come to me, more and more of the silence comes to me and this is my only answer and I think poetry can never catch that which it wants to catch. It is beyond it. Words are silly things and yet very important things that poets without words cannot be poets. But when a poet gradually begins to go towards the stillness, he writes less and less, he is scattered more and more. Wonderful beams and rays around him which in themselves are the rhymes of the divine.

Q. এই কবিতা কি মন্ত্র উচ্চারণের মতন? যা সমস্ত রকমের কবিতার যে অলঙ্কার, তার যে-সমস্ত বেশবিন্যাস, যেগুলোকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে মন্ত্রের কাছাকাছি চলে যাওয়া বলতে চাইছেন ?

A. Actually any great expression is a Mantra. The moment you say "Ah what a wonderful thing"—that word is a mantra. What has it done ? It has definitely affected you. The moment you read a great poem or great thought—it is a mantra—only difference is the mantras we are used to—have been written on expressed in a language which is the language for Mantras—great mantras—in Sanskrit.

Q. আপনার কাছে কি ছবি, কবিতার চেয়েও বেশি অর্থবহ মনে হয়, অর্থাৎ শব্দের চেয়ে কি রঙ ও রেখা বেশি ভাবনা প্রকাশ করতে পারে ?

A. My dear friend—again—what is colour ? Colour is a music

that you hear with the eyes. What is movement ? Dancing is a sculpture come to life, alive. It has come from somewhere. What is music ?—It is colour seen with the ears and so on. For me there is no difference between colour and colourlessness, sound and silence, that way and I am always thinking in terms of a wonderful fussion marriage of all these that you enjoy with the eyes, with the ears, with the nose you smell fragrance, everything is so interlinked. This differentiation I do not accept and never accepted it.

Q. Now to you, all your sexual organs are very active. How come that you, in your life time, once went to Pondicherry and you know almost started practising Yoga—

A. Not almost...yes I did.

Q. You did. How come this gradual transition or all of a sudden you decided ? How it happened ? We would like to know.

A. No, I do not know why you make such compartmentalisation at all ?

Q. Because you know meditation or Yoga—it has definite tendency of paralysing all your senses.

A. No, I don't believe so, No.

Q. Upanisad says so.

A. No. It might say, my experience is perhaps different than that of the Upanisad—I tell you there is no question, contemplation—meditation—the gathering in—what is meditation ?—gathering in of all the forces and the more you gather, the more you are powerful.

I do not see any difference between contemplation and sex. It is sex and its contemplation. In fact in the sexual act, you can pour in contemplation. And it is all a question—I suppose—your own experience and individual, attitude, behaviour and the acceptance on the part of your comrade, rather mate also. Sometimes it is battle, sometimes they can not respond to the higher element in sex. Sometimes it is animal and that time you enjoy that part of your self in an animal way. But actually contemplation makes it a

wonderful phenomenon. I don't think it does kill sex and in fact I have put down this continuance of my sex.

Q. এই যে আপনি অভিজ্ঞতার কথা বললেন, এ কি বাউলদর্শনের যে চর্যা, তার মধ্যেও কি আসে না ?

A. Definitely I am a বাউল।

Q. O. K. Harinda, it is not yet clear that why you had gone to Pondicherry ?

A. I did not go to find what I tell you how I went to Pondicherry.

Q. We would like to know that.

A. It is very interesting. I had got into a very terrible crisis in life. I mean domestic crisis. and I wanted to run away to some place to forget all my agony. I took to drink, heavy drink, and I went to Vellore which is very close to Pondicherry and there the liquor bottles are very cheap, so I drank, then somebody said "Sir, what you want to do here ? Why don't you go to Pondicherry ?"

"Pondicherry ? What for ?"

"You know Sri Aurobindo.—"

"I know, how far is it ?"

So, I just went. I do not know why I went. But I suppose subconsciously I wanted to get out of that terrible mood. That is why I went specially to try to get out of it. But once I got into Pondicherry I found the atmosphere very interesting for me, because it was very consoling for the timebeing and I stayed on and became "Mouni". I was "Mouni" for four months and half to try out in a scientific way and I tell you our ancestors were certainly not fool when they talked of "Mouni".

Q. Would you like to give us some of your experiences there at Pondicherry ?

A. I like specially to give you the experience. I went through specially one experience, my episode, unbelievable during my period of silence. Period of silence does not mean that, you keep silent and then you begin to write your questions, and answers to questions. That is not silence—silence is a

very deep phenomenon—a perennial stream that flows and flows, glitters and gleams under moonlight, under sunilght and it goes on and on—It's most beautiful...Now during this period I had an experience which was really wonderful—one day I sat naturally alone, door opened—a friend of mine came in, rather came to the door—opened the door and suddenly said "I am sorry" shut the door and went away. I asked him later on after I broke my silence—I said "my friend you came that day and you got startled—you went out of the room—away from the door and shut it—what did you see—what did you hear—what was it that troubled you ?" You know what he said ? "I saw you rise above the ground" I said, "What ?" "Yes, you were rising above the ground."

It is nothing wonderful. Swami Vivekananda said that if you do what I ask you to do for 21 days only, you will be able to meditate...so...it is nothing wonderful. In fact I know, I saw a great dancer Mizishki—Russian dancer, who was called God of dance. I saw him do an item called the 'Spring' and that he comes just leaps into the air and stands in the air and comes down in a circular movement or so like. He did not know why and how ? Some way same what I experienced. It is a grand experience. No exaggaration at all. No need to exaggarate. Then I found of course other things happening. I wrote 27 vols. of very big poetry. In the course of 1 year and 8 months. 27 Vols, every line of which Aurobindo had read and commented on. One poem he read he said "I am looking at the poem as though I had written it, because I wanted very much to write things like it". I had many such great experience. There is no doubt about it, that going within given you certain sights, certain vision, almost a global vision—you cease to see sky on the above of your own country—you cease to see,—is the belong only to your people—you begin to see through the eyes of the world.

Q. In Pondicherry ashram did you find anything which you did not like very much.

A. Very good question. Towards the end specially—little envy, little jealousy. It was amazing thing that in an atmosphere of such a beautiful withinness there could be so much ugly outerness. Yes, I did find a lot of discrepancies, but I did not take any notice of them until one day I actually had to leave Pondicherry.

Q. What was the incident—may we know ?

A. Well, people tried to...They were little jealous, I suppose. Mother of the ashram said "Oh he is getting on like a house on fire" and I do not think people...Dilip Kumar was at that time there and he used to write...letter to mother—he loves this etc. various things. He was a very sweet man.

Q. You mean Dilip Roy !

A. I am talking of Dilip Roy I think there was a kind of feeling of embarrasment on his part, because he had gone there much earlier than I had, and he stayed on for sometimes and even he left later on.

Q. Would you please give your encounter with Dilip Roy ?

A. No, nothing to have an encounter. Dilip, Subhas Bose, and one Chattopadhyay and myself were four who used to walk together everyday in Cambridge. We were working everyday, I know Dilip very well indeed, very intimately and even Subhas babu I knew very very well. So that way there was no encounter. I used to understand his nature very well very much.

Q. সুভাষবাবু সম্পর্কে কিছু বলুন।

A. Well, it is hardly possible to recall anything in a very short way. He was at Cambridge. He was a very silent man. He hardly spoke. When we were walking we did all the talking, he hardly talked. He only heard. He struck me as being a man who had already contemplating very big plans that time and he said very little and I could feel he was a mighty fellow, mighty fellow, mighty giant which he became —of course he always was, and which he became known as later on. That all about I can say he was one of the greatest—most powerful—most sincere nationalist—one of the

most certain ways. I do not know whether he has appeared...

Q. Harinda, you mentioned little while ago about a peom which was read by Aurobindo and he said "I feel almost I had written it." Would you like to recite that poem ?

A. I have not remembered it. Its too bigger a thing and I do not remember words of it, but remember the meter of it. You know as Aurobindo mentioned—as if he had written it ! He used to write comments on every line of mine. I have got all his letters.

Q. Recently I had a chance to read your manuscript called... (স্পষ্ট বোঝা যায় নি)। Was it written at that stage ?

A. No, No it was written in Bombay later. In fact I didn't need to be in ashram to write deep things. Because I have within myself an ashram, really I have. I talk like as if I am very impersonal. In fact sometimes when I walk I feel I am no more human being. I am just an ashram just a...place in myself, and there I have written these poems.

Q. Well Harinda, I would like to ask you another question which is very very important about when you say that you had passed the stage of "Mouni". You know silence period. After that I do not know how to associate you with the political field of India. A man from extreme silence stage comes to politics and becomes member of Parliament—which is something astonishing to me—would you tell me the relevance ?

A. No question of relevance. After all man is an actor throughout his life. When I say actor, I do not mean stage actor, but a man through which, through whom, things are enacted and after being Mouni, after coming from ashram and just as for instance after coming back from Cambridge from London—I came back because there was a call of the country—I came back. Things like that, so I have never failed to hear my country called me—never failed. And whatever I could do, I did impersonally while retaining in me all that I tried to achieve during my silent days. I do

not think it is impersonal and contradiction at all for you to come out of silence and go into the politics.

Q. Why didn't you join politics early ?

A. Actually I had always been a politician in my own humble way. Whenever there was any youth demonstrations I was with them, even—very recently young people come to me—saying "Dada please lead" but I am not a young man, yet. "Oh dada you are the youngest of us all". I think like that I always wanted to do something in order to better the outer conditions of our country wherever possible, all the time retaining, mind you, retaining my inner life which I have retained without which I could not live.

Q. Would you like to comment on your association with some of the reputed politicians when you were in Parliament. We perhaps do not want to know their personal behaviour and all that, but the way you want to see their contributions on the way they played their part in Indian Politics.

A. I was fortunate enough and way to know numerous politicians. When Nehru was there, S. P. Mukherjee, Meghnad Saha, my great nephew—brilliant scholar Dr. J. Surya was there and numbers of very wonderful people. Now I am afraid, Parliament has very little to show. I don't think it has anything much to show but that calibre at that time, one speaker as great as another that was a remarkable period when I could see the various types of approach to Politics. By the way, from my point of view Shyamaprasad Mukherjee perhaps the greatest orator I have ever heard in my life. I have heard so many in my life real great orators, but I don't think there was anyone greater than S. P. Mukherjee, especially when he talked on the occassion of preventive detention act. It was a tremendous speech he made for an hour and half spellbound the audience. And Nehru—very charming prince—really a prince charming I call him—he was rather mixed up in his politics—I think due to weakness, due to personal reasons too, sometimes he could be influenced by people. But he was a charming

man. We all loved him very much. When he got upset he used to froth at the mouth so angryly, he could not contain himself. I remember on one occassion Meghnad Saha was talking about things and Nehru got wild and he erupted and said "The honourable member has not got...intelligence", In reply I shouted "is intelligence the private property of Prime Minister ? Shut-up and sit down". And they wondered Harindranath the poet fighting this way ? Afterwards they asked me "how did you manage ?" I said "you people are cowards—you can't talk—we talk straight—we don't care and in parliament you could talk in any case".

Nehru was a remarkably beautiful soul. Once I met him at Pondicherry and I said "Jawarlalbhai ! I wish you would have become an artist ? not politician, you would have written fine things". He said "Oh Harin I am trying to make my whole life an art". Whatever he might meant, but I think at times he was very lonesome. Shyamaprasad was very much dreaded by Nehru I think. So after his death, I don't know what exactly had happened—we got up to demand an enquiry into Shyamaprasad's death. But it never came. So these things I have seen. There was Lalbahadur Sastri by the way—very charming simple man, very truthful, and lots of people were there. I can't describe them that way in detail. All that I know there was uneven thinking power. There were dishonest once too. There is no question about it.

Q. You got away again from politics, how was it a point that politics disillusioned you ? or you were disillusioned by political activities in general in India ?

A. I do not think there is really much politics in India. I do not call it politics, I call it self advertisement, everyone wants to have the whole bread, not sharing with anybody. I don't call it politics. It's sicken of course, I think Chiru, at the end a poet's greatest politics is to write great poetry—a painter's greatest politics is to paint great pictures—a coblar's greatest politics is to make fine shoes for the nation—I think

a sweeper's greatest politics is to sweep clean—I think I am in politics since I am thinking politically all the time.

Q. Is it you mean appointed duties at appointed situation ?

A. In what way ?

Q. দার্শনিকরা বলেছেন যদি কেউ তার নিজের জায়গা খুঁজে পায় এবং যেখানে সে কাজ করে, সমস্ত মনোনিবেশ সহকারে করে, তাহলে সে সার্থকতার কাছাকাছি যায়···

A. I think there is some truth in that.

Q. আপনি কি মনে করেন যে একজন কবি—সে কি খুব একাকী—alone ? সে এবং সমস্ত পৃথিবীটা মুখোমুখি ? ভালোবাসার জন্য, ঝগড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ! অথচ মাঝখানে অনেক ব্যবধান—অর্থাৎ সে কি একাকীত্বে ভোগে—একটা প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন কবি কখনো কি বিশ্বের কথা বলতে পারে ? কবি তো নিজের কথা বিশ্বকে বলে, অর্থাৎ কবি নিজেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে বলে ওহে হারীন চট্টো—এই হারীন চট্টোর কথাই শোনো। আপনার কী মনে হয় ?

A. I don't believe that a great creator is ever lonely, but he is alone. There is a great difference between loneliness and aloneness.

Q. I mean aloneness...

A. Without that aloneness he won't be crowded with dreams. It is irony that because he is alone he is crowded. All the planets came swarming at him—all flowers come dancing.... Actually the creator does not listen to tunes of his own, but he listens to the listening of aloneness. This is what I feel.

Q. কার সাথে কথা বলে ? সে কি নিজের কথা নিজেকেই বলে ?

A. No he talks to himself, but "himself" means what—who is the creator—what is himself—what is "yourself" ? Is there any such thing ? He talks to all, waiting to listen—all those who wait to listen—to his ownself whom he is talking. This is what a poet, a creator should feel—the oneness of everybody—not that I—as a poet, I am going to recite something, I am superior, I am part of you—My voice is a part of your listening and your voice is a part of my listening—so it is actually his interpretation of the world—he always tries to interpret—some little portion of the world—he can't interpret the whole world. It's not possible...

Q. আপনি মূলত কবি মানুষ। আপনার প্রধান জিনিস হলো কবিসত্তা এবং সেটা

দিয়েই আপনি সমস্ত কিছু দেখেছেন। এখানে আমাদের এ প্রশ্ন করা উচিত যে কবিতা বস্তুটা কী···এর সঙ্গে অন্যান্য সৃজনধর্মী কাজকর্মের পার্থক্য কী ?

A. It is a thirst, I have a poem which might answer this question :

"Beloved I am the cursed
with a thirst to dream and build
which grows to a deeper thirst
the moment it is fulfilled.
Its feet one full of fire
increasing all the time
and I never seem to be tired
of difficult upward climb.
Since I am in love with quest
and friends with mountain tops
...in movement alone is rest
and tremble when it stop."

I think I have answered some portion of your question ?

Q. সম্পূর্ণ উত্তর পেয়ে গেছি। কবিতা কি দাসত্ব করে ? আগের কোনো চিন্তার বা ঐতিহ্যের, বা পরিকল্পনার—কখনো দাসত্ব করে ! বা metaphysical কোনো চিন্তা থেকে কবিতা রূপ পায়, বা কোনো fixed prior condition থেকে কবিতা আসে ? বা কবিতা খুব independent direct relation, experience থেকে আসে ?

A. I always make a difference between words and poetry. Words come out of intellectual state, they also come out of external things cheaply, and out of movement, revolutionary movements out of the movements of human being which are arrived, but metaphysical things mystical things—I like to use the word mystic because mystic has the most clear vision of the world. I think and I feel there is no preplanning of a poem of that kind. It just comes, you do not know it comes—at that time you are a slave—being a master, you are a slave.

Q. In discussing with you I get a feeling that you are a very Sensuous poet. Do you find, can I compare you with Byron or Mohitlal Mazumder ?

A. Actually comparison are not good, you know !
I don't believe in comparisons. But one thing is certain—Sree Aurobindo himself was asked a question by Dilip Roy...

Q. কবি নিশিকান্ত কি তখন পণ্ডিচেরীতে ছিল ?

A. Yes,—in what way—Dilip said Harin writes poetry—is he closer to Shelly, or what sort of influences you think he had ? So Aurobindo wrote back to Dilip, saying he is lyrical, he is colourful like Shelly, but being an oriental he is in a sense deeper than Shelly, and Blake was not mystic, but he was...but Harin is a mystic which means that again the old vision is in him of ancestors which Blake did not have opportunity of having.

Q. কবি হিসাবে আপনার রবীন্দ্রনাথকে mystic মনে হয় কি ? মোহিতলালকে ?

A. I won't be able to talk about Mohitlal ? I know about him. But about Rabindranath you want to know ?

Q. Again I put the question.

A. হ্যাঁ, Please.

Q. আমি বলতে চাইছি যে রবীন্দ্রনাথ কি কবি হিসাবে স্বাধীন, রহস্যময়, mystic, direct correspondence, intuitive correspondence-এর কবি ? অথবা তাঁর বাঁ দিকে অপরিবর্তনীয় বস্তুসত্তা বা ভাবসত্তা বসে আছে, যেখান থেকে তার কবিতা হয় উপনিষদ বা ব্রাহ্ম আধার হয়, এবং অসুবিধে হলে সে আবার ঈশ্বরে ফিরে যায়, বা আলোতে ফিরে যায় বা জ্যোতিতে ফিরে যায় ?

A. Rabindranath was a poet, because he was not a man. He was a process, a process can take in anything—can take in the old stuff, take in new process, can refer as book of notes, can refer things, but Rabindranath was definitly a very extraordinary spontaneous, outflowing and outflowering of life. It was something amazing ! His poetry was very monotonous at times, same rhyme, rhythm, same type of things in Bengali. But sometimes amazing, stunning beauty,...very amazing. I would call Rabindranath a painter in water colour—never in oil colours. But you should also know Rabindranath was influenced very much by Browning, by Shelly.

Q. Kabir ?

A. Yes, also by Kabirdas... I mean by everything. He was like English language, he was not afraid of taking influences. And Rabindranath was phenomenon, and I think a literary history.

I saw his paintings, I saw many of them. A student brought them all to me.

Q. What is your comment ?

A. May I tell you, it is very interesting. I wrote about it. What he cannot express in poetry he expressed that in paintings.

Q. Don't you find an element of mystic in his paintings ? intrigue ?

A. It is unconscious mysticism, not a conscious mysticism. Because his painting was not conscious. Whatever happens—the way he worked with all the thing—the way he cancelled his poetry...the way he made figures with them...made a doe... He always wanted to do something, he was like a child when he was painting.

Q. Now would you call your mysticism, whatever is there in your poems..., has got anything to do with Sufism ?

A. Very much so. Sri Aurobindo said I was a cross between Sufism and Vedanta.

Q. Because Sufism is very mystic...

A. Very mystic and very colourful and I was considered a coloured poet by the way you call a poet colourful. Sufism is very much in my blood. I was born in Hyderabad...have been with Sufis and Fakirs and...

Q. আচ্ছা হারীনদা, এই যে বলা হয় বৈষ্ণব কবিদের ওপর সুফীভাবের খুব প্রভাব আছে এটা কি ঠিক ?

A. No, you can't say that. You say very often certain wave goes, it can hold anyone, you can get it from any where. You don't have to be influenced by so & so. I don't believe in that categorisation.

Q. নজরুল ইসলামকে কবি হিসাবে কত বড়, কি রকম মনে হয় ?

A. I know Najrul very very well indeed. Even when he got ill—what a great man. He was a greater man than a poet. But he certainly has written some very mighty things, but again he was a man of revolutionary feeling. He was a soldier and came to poetry—that is a marvellous expression. His love songs have been very beautiful. Some are superior to poems written by other great poets.

Q. আচ্ছা হারীনদা, আমরা একটা জিনিস দেখেছি। আপনাদের সময় যাঁরা কবিতা লিখতেন—এমন-কি রবীন্দ্রনাথ থেকে আপনাদের সময় পর্যন্ত—আপনারা যখন যৌবনকালে কবিতা লিখেছেন, সকলেই গানও লিখেছেন, আমরা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কবিদের কথা বলছি মধ্য তিরিশ দশক থেকে চল্লিশ দশক পর্যন্ত এবং আজকেও যারা কবি হিসাবে চিহ্নিত তারা আর কেউ গান লেখে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কোনো গান নেই, বুদ্ধদেব বসুর কোনো গান নেই, জীবনানন্দ দাশের কোনো গান নেই, এমন-কি সাম্প্রতিক কাল অবধি-কবিরা কেউ গান লেখে না—এটা হচ্ছে কেন ?

A. It is very difficult to say ! Perhaps they don't have the music inside them.

Q. O.K. Harinda would you mind to speak about that—whom as a contemporary poet you think is best...

A. You see, I am considered as a old fashioned poet. I do not belong to the Indo-anglian poets as Kamala Das does and so many others do. First of all I must be very frank, I don't understand Indo-Anglian modern poetry—not much because I am old fashioned, my style is different, my way of thinking is different and I don't believe in cutting prose into rhythm—it is not possible for me to do so. I like rhymed verse. Now the point is, among the contemporary writers—it is very difficult to say ? For me Rabindranath is contemporary. For me contemporary is God. For me there is no contemporary now.

Q. Would you like to tell us something about your involvement with film making—particularly with Satyajit Roy ?

A. Why particularly ? I think that is the only thing worthwhile taking about. I think its been a previledge to have to work with Satyajit Roy. He is a man who is very conscious man. not merely a film maker. He feels—he is a sensitive man.

Q. Won't you call him an intellectual ?

A. He is very intellectual, then he has all the emotions which has been packed into him by his own father—he was a great poet. His grand father, all great literary men who had great emotions and of course Satyajit belongs to the modern world. And as a film maker I personally think very few to even worthy of talking about—none near to him even...

Those who talking disperagingly about him you may be sure, there is something wrong in them. They are not serious enough. They say what is in Munshi Prem Chand's story—what he has done with that story ? It is rubbish...very slow. But I challenge people to think out the first shot... of the chess—they playing of chess, that in itself is an revelation of Roy's grandeur. He is a great man and then, when he is shooting—that is a great experience. He send you the script a month and a half before—Harinda this is your script. This is what—you have te say...there are the actors—there are the lessons so on...and then when you learn your lesson—মুখস্থ হয়েছে ? হ্যাঁ, absolutely ready. চলো we will try...please go this way... Harinda go there... I go to left...go to Sharmila and then come back—things like that. In 'Gupi Gayen Bagha Bayen'—I worked in that as a 'Jadugar'—my God ! It is marvellous. He has already prepared the dress and somebody says "মশায় do you think ...it thought out yesterday ?' He got a khata (খাতা). Four years before making this films. He would say if ever I make a movie this will be the... Thus Harinda this role of Jadugar.

Q. Before assigning this role to you, did Satyajit Roy take an interview to you.

A. No, no, no—he somehow had a strange idea of me. When I worked with him oh ! in the very first shot he said "You know Harinda you are a maestro, I know your work will flow like water over a stone." And then he was very wonderful. He did not have to direct me as such. He knew I would do things. He said 'do this' and I do it and believe me I had hardly any retakes with Satyajit Roy. It is a perfect... because he gives you script long beforehand and he did not change word of it.

Where as in Hindi films you get your script, you learn the things and then they will say "মাপ করো দাদা, থোড়া সে বদল গিয়া হ্যায়" ! থোড়া সে—means you have to learn the whole thing again how to do it at the last moment ! You can't make a good film like that. But Satyajit is a serious film

maker because he is a very serious thinker of humanity and people accused him of gloomy films showing proverty—then that's humbug.

Q. Now to conclude the discussion, I would like to ask you one more question. What are you busy at the present moment.

A. At the present moment I am busy at a new book—reflection again—I think it is going to be rather interesting. Just every evening I write a few thoughts down and analyse my thinking and then of course painting—a little boy called Mama you know—blessed Banku—that is the little boy who work through me.

Q. একেবারে শেষ আপনার একটা ছোট কবিতা শুনতে চাই—

A. I should like to recite a poem which I wrote during Republic day or rather to show you I do not write only mystic things. But I feel intensely for every thing. Here is the poem.

The order is marching
The younger is marching
and right through them marching
one hunger is marching
Just watch them a while—they appear the Synopsis
Of a harrowing story of National Cropses
whose eye balls are torn.....

...শেষের কটি লাইন অস্পষ্ট।

ভাষাবীক্ষা ও একটি সন্ধিক্ষণ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দৃষ্টিকে যতক্ষণ ভাষাবীক্ষায় পরিণত না করা যায়, সে পর্যন্ত জীবনানন্দের স্বস্তি ছিল না। এই নির্ধারণের অর্থ এরকম নয় যে, তিনি চোখে-দেখা অনুপুঙ্খগুলিকে সত্বর বীক্ষায় সঙ্কুচিত করতে চেয়েছেন। তাঁর রচনায় আনমনা পথিক কখন যেন পরিব্রাজকে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। আমাদের কাছে তাই, 'বনলতা সেন' থেকে আরম্ভ করে, 'মহাপৃথিবী' পার হয়ে গিয়ে, একেবারে শেষ প্রহর পর্যন্ত তাঁর পথচলার ধরনটিকে খুব অর্থময় বলে মনে হয়। 'পথ হাঁটা' কবিতার মধ্যে এই গতিভঙ্গিটি সর্বপ্রথম দেখা দিল। পথচারী এখানে 'কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে' নিরন্তর হেঁটে চলেছেন। 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সংগতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি', এই, স্বরচিত কবিতাবিষয়ক জীবনানন্দীয়, সূত্রটি নির্বস্তুক নয়। কবির কাছে ইশারার সঙ্কেতোদ্ধারের / অনন্যমনস্কতায়, এই মহাবিশ্বপরিক্রমার মধ্য থেকেই 'কবিতা লিখবার পথ'টি বেরিয়ে এসেছে। পুরো সমীক্ষণেই একটি পথে এগিয়ে যাবার ছবিটি কাজ করছে। একই সমীক্ষার ('কবিতা প্রসঙ্গে') শেষ দিকে যখন তিনি বলছেন 'কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন করে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায়', তখনও প্রতিভাত হতে থাকে যে এই চলতে-থাকার ব্যাপারটাই তাঁর কবিতারচনার শর্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খুব স্পষ্ট করেই আপাত-অমূর্ত সময়ভাবনা তিনি, এরি প্রেক্ষিতে, ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সময়ের এই চালচিত্রটি যেমন একদিকে তথাকথিত যুগচেতনায় প্রতিফলন নয়, তেমনি অন্যদিকে তার সঙ্গে রাবীন্দ্রিক কালাতিগ উত্তরণের ('আমার চলা যায় না বলা / আলোর পানে প্রাণের চলা') কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই সময়-প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করতে চেষ্টা করেছি', এই বচনটির মূল্য অপরিসীম। জীবনানন্দের কবিতা ও কাব্যজিজ্ঞাসার এই পথিকটি যখন চলতে থাকে, বারংবার পিছনে ফিরে তাকায়, ফিরে-ফিরে আসে আগের বিন্দুটিতে ফিরে আসে, 'জীবনের সম্ভাবনাকে

বিচার করে' নেয়, তারপর, সময়ের অগ্রসৃতির ঋজুরৈখিকতায় নয়, কম্বুগ্রীব 'সময়-প্রসৃতির' প্রবর্তনায় ভবিষ্যভাষণের প্যাটার্ন তৈরি করে নেয়। এই হলো তাঁর শিল্পচেতনা, অথবা শিল্পচিন্তার মধ্যে গ্রথিত সময়চেতনা। 'পথ হাঁটা' কবিতায় এরি স্বরলিপি দৃপ্ত হয়ে আছে। কবির চলা-র সঙ্গে-সঙ্গেই বস্তুবিশ্বের চলন শুরু হয়ে যায়, ট্রাম-বাস, গ্যাসলাইট, ইঁট বাড়ি (উপাদান ও শিল্পায়ন), সাইন বোর্ড, জানালা, কপাট, ছাদ, সবাই আত্মস্বভাবে 'ঠিক চলে।' 'কেউ ভুল করে নাকো।' তারপর, একসময় পদকর্তা 'একরাশ তারা আর মনুমেণ্ট-ভরা কলকাতা'র মধ্যে পৌঁছে যান, তাঁর 'মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব / দেখেছি কি ?' খুব সহজ সম্ভব যেন এই চলা, এই প্রশ্ন করার ধরন, চলতে-বলতে এই বলা। কিন্তু হঠাৎ যখন কবি এই বৃহৎ চলবিশ্বের একপাশে সরে যান, তাঁর মনে হতে থাকে ব্যাবিলনেও তিনি একা-একা এভাবেই হেঁটে গিয়েছিলেন। 'হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর' তখন উন্মোচনের একটি মুহূর্ত সৃষ্ট হয়ে যায়। এবং কবিকে অনুভব করতে হয় যে, 'খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক-এক সময় থেমে যায়, একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।' এর মান কবিতায় একটি সনেটকে চারবার তিনের চলনে ভেঙে দিয়ে একটি অন্ত্য দ্বিপদীর অভিমুখী করে দিতে গিয়ে কবির কাছে যে-সত্যটি ভাসমান হয়ে ওঠে, সেটি হলো এই যে, উন্মোচনই কবিতার কাজ। এই উন্মোচনের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। চিন্তা ও গতির আবর্তমুখী পারস্পরিকতার মধ্যবর্তিতায় দৃষ্টির ভিতর থেকে এই স্বাগত-তদ্‌গত বীক্ষণ বলয়িত হয়ে ওঠে।

নিজেকে, প্রুফ-পঠনের তপশ্চর্যায়, তন্ন-তন্ন করে শুধরে শুধরে চলার মধ্যে, এই বীক্ষণ ভাষাবীক্ষায় পরিণত হয়। 'নিজেকে' বলতে এখানে কবির ব্যক্তিস্বভাবের মানচিত্রণ বোঝানো হচ্ছে না, অভিব্যক্তিমুখী কবিস্বভাবের সৃজ্যমান মানদণ্ডকেই বুঝে নিতে চাইছি। কীট্‌স তাঁর 'অনির্ণেয় সামর্থ্য' (negative capability) শীর্ষক ধ্যানধারণায় এই কাব্যভাবনায় মহাশ্চর্য মানচিত্র এঁকে গিয়েছেন। তিনি খুব সহজ ভাষাতেই আমাদের বোঝাতে পেরেছেন। কবির 'চরিত্র' বলে কিছু নেই, লিখতে-লিখতেই, স্বতশ্চল শিল্পছলনায়, কবিচরিত্র জন্ম নেয়। জামরা জানি, জীবনানন্দের মানসে কীট্‌সীয় এই নন্দনচিন্তার সমর্থন ছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যচর্যায়, চিত্রপ্রণয়নের পরিসরে কীট্‌সের প্রভাব যত প্রকটই থাক-না কেন, কবিচরিত্রের গড়ন আরো জটিল।

কবিতা শুরু হবার প্রারম্ভিক মননের সঙ্গে কবিতার রচনাক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রাণনের একটা তফাৎ ঘটেই যায়, একথা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে এখানে আমরা তার পুনরুক্তি করতে চাইছি না। জীবনানন্দের রচনাতেও এর পরিকীর্ণতা প্রচুরভাবে আছে। কিন্তু তার চেয়েও স্বতন্ত্র যে-মাত্রাটি একই সঙ্গে সেখানে উচ্চারিত সেটি হলো এই যে, এক-একটি কবিতায় যে-কথাটা তিনি বলতে চান, তার সামূহিক নিষ্পত্তি ঘটাতে পারা পর্যন্ত তাঁর অস্থিরতার শেষ নেই। এই কারণেই আমরা, কীট্‌সীয় নিশ্চেতন বুনে-চলার পাশাপাশি কবি-পুরুষকারের বয়নশিল্পের আরেকটি চেহারা-ছবি দেখতে পাই : একটু আগে যেকথা বলা হয়েছে, বা কবি বলেছেন, তার বিশেষীকরণ। মূল কথাটাকে বিশেষিত করতে-করতে কবি আগের উচ্চারণের যে-পুনর্বিবেচনা করছেন, সংশোধন-সংযোজন করছেন, এবং এভাবেই যে সামগ্রিক যাথার্থ্যের দিকে পৌঁছতে চাইছেন, সেই অন্তর্বয়নই সম্ভবত আমাদের কাছে একটি অভিনব বিন্যাসের আয়তন নিয়ে আসে।

বিন্যাসের এই আয়তন জীবনানন্দ নিয়েছিলেন ডব্লু. বি. ইয়েট্‌সের কাছ থেকে। ইয়েট্‌সের কাছে জীবনানন্দের সম্ভ্রান্ত অধমর্ণতার সালতামামি এত প্রভূত পরিমাণে, বিভিন্ন গুণী সমালোচকের প্রতিবেদনে, প্রদত্ত হয়েছে যে, এখানে তাদের তালিকা-প্রবণ উৎকলন দিলে অন্যায় হবে। তবু, একটু আগে বর্ণিত পদ্ধতিটির তানবিস্তারের আগে প্রথমোক্তের কাছে জীবনানন্দের উজ্জ্বল দায়ভাগের দু-একটি বৈশিষ্ট্য দ্রুত উল্লেখ করার দরকার আছে। ইয়েট্‌সের যে-বইখানি জীবনানন্দকে প্রথম, ও চির-দিন, আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার নাম Crossways (১৮৮৯)। 'অবসরের গান' থেকেই হয়তো, কিন্তু 'বনলতা সেনে'র স্থায়ীভাব ও সঞ্চারী ভাবনায় ওতপ্রোত তরঙ্গভাবনায় নিশ্চয়ই, ঐ গীতিমাল্যের সান্দ্র্য ছায়া বিছিয়ে গিয়েছিল। আমরা এখানে শুধুমাত্র স্বল্পায়ত কিছু সঙ্কেত খুঁজবে। বইটির 'অনসূয়া-বিজয়' (Anashuya and Vijaya) কবিতাটি একটি কাব্যনাট্যধর্মী সংলাপিকা। ভারতপথিক হিসেবে ইয়েট্‌সের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করা আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়। তবু একথা না বললে তথ্যের অপলাপ হবে, ভারতীয় আবহমণ্ডলেই ইয়েট্‌স পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মায়াজাল এখানে স্থানায়ত করতে চেয়েছেন। প্রেমিকা অনসূয়া তন্বী তপস্বিনী, এই সংলাপ-কবিতার শুরুতেই, নতজানু হয়ে তার প্রেমিক বিজয়ের জন্য যে-প্রার্থনা করে, সেটি একান্তই 'ভারতীয়' :

শান্তি দাও, শান্তি দাও,
সকল অন্তর আর আন্দোলিত শস্যের শিখরে—

অন্য কারো প্রণয়ের জালে
নিজেকে না ঢাকে যদি, তবে যেন বনের আড়ালে
সেই প্রেমিকের প্রাণে শান্তির করুণা ঝরে পড়ে।
অলস পশুর পালে পরম প্রাচুর্যে যেন পরিক্রমা করে।

স্তোত্রসম্মিত এই উপাসনার মধ্যে প্রেম-পূজা-প্রকৃতির যে ত্রিবেণীবন্ধ রচিত হয়ে যায় সেটি অবশ্যই, নারী ও পুরুষের দুই দৃষ্টিকোণের দ্বৈরথে, অচিরেই নিয়তিমথিত নাটকীয়তার আকার পরিগ্রহ করে। ইয়েট্সের তৎকালীন চিন্তাপদ্ধতির দরুন ঐ দ্বৈতত্ব আবার দেহমনের কিনারায় একটি ভারতীয় সমাধান নিয়ে আসে (তু'. জীবনানন্দ: 'আমরা দুজন দু-দৃষ্টিকোণ হয়ে যেতাম শেষে/একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে')। অনসূয়া অন্তিক প্রার্থনায় বলে:

হে ব্রহ্মা, এবার হলো ঘুমের সময়;
উচ্ছল মেঘের দল, শান্ত ধেনু, বনের পাতার
আড়ালে মাঝির ঝাঁক। গাছের শিকড়ে যারা রয়
ছোটো-ছোটো সেই সব ইঁদুরের মেলা আর পবিত্র রঙিন চক্রবাক,
সকলেরে রক্ষা করো। বিশেষত আমার প্রেমিক
বিজয়েরে ঘিরে রাখো, আর শোনো পরম প্রহরী,
অস্থির আঙুলে যেন বিব্রত না করে তারে কোনো পরী অথবা অপ্সরী—
আমাকেই যতো জেগে তার সারারাত কেটে যাক॥

এই আতিথেন নিবেদনকে 'ভারতীয়' বলব না 'ইয়োরোপীয়'? আসলে এরকম কৃত্রিম বিভাজন নিছক সুবিধেজনক বর্ণীকরণ ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তবু, আমাদের প্রাসঙ্গিক ভাবাসঙ্গটিকে ঘিরে বলা যায়, ইয়োরোপীয় কবির এই অনুধ্যান ভারতীয় কবিকে মুগ্ধ করেছিল। ঐ 'ঘুমের সময়', 'মাছির ঝাঁক', 'ইঁদুরের মেলা' তথা সমগ্র জীবজগৎ বিধৃত-করা মগ্নচৈতন্য জীবনানন্দকে গ্রস্ত করে তুলেছিল। নারী ও পুরুষের এই পরস্পর বিশ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি থেকেই উদ্‌গত হয়ে আসে 'অঘ্রাণ অন্তরের' মতো অনবদ্য ধূসরিম কবিতা। 'The Falling of the leaves' ও 'Ephemera' (ক্ষণোজ্জ্বলা) কবিতা দুটি সমীকৃত হয়ে জন্ম নেয় ঐ কবিতা। অশ্রু ও চুম্বনের সমাহারে উদ্ভূত প্রথম কবিতাটিতে ঝরা পাতা ও ইঁদুরের শস্যভুক উৎসাহের এক বিরোধাভাস পুঞ্জিত হতে থাকে। পরবর্তী কবিতায় তার বিস্তার ঘটে যায় লুপ্ত 'বাসনার' পুনরুদ্ধারের অভিকর্ষে। মনে রাখা দরকার 'অঘ্রাণ অন্তরের পাঠভেদে এই ছবিটি আছে 'প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা/ফুরাতো

না যদি আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে (তু. when the poor tired child, Passion, falls asleep)'। কিন্তু 'বনলতা সেন' গ্রন্থে কবিতাটি যেভাবে শুরু হলো, তার অভিভাব আরো প্রভাবশালী:

'জানি আমি তোমার দু' চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর পৃথিবীর পরে'—
বলো চুপে থামিলাম, কেবল অশ্বত্থ পাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়ানো ছেঁড়া;—অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;
সেসবের ঢের আগে আমাদের দু'জনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে···

তুলনীয়:

'Your eyes that once were never weary of mine
Are bowed is sorrow under perdulous lids,
because our love is waning',
And then said she: ...

এখানে কোনো অঙ্কের অস্পৃশ্য মৃগয়া বক্ষ্যমাণ লেখকের উপপাদ্য নয়। এজন্যই নয়, যেহেতু একই বইতে অন্তর্গত দুজনে শীর্ষাঙ্কিত অপর কবিতায়, প্রতিপন্ন হয়ে যায়, জীবনানন্দ রাখা হয়েছে। এখানে আমাদের বিস্মিত করে প্রথমোক্ত রচনায় কথ্যক্রিয়াত্মক পাঠের সঙ্গে পরবর্তী কবিতার সাধুভাষাধর্মী ক্রিয়ালক্ষণের পার্থক্য। বস্তুত দ্বিতীয়োক্ত রচনার ভিতরেই তৈরি হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের জগৎ ও জীবনের নিজস্ব গঠনশিল্প। জীবনানন্দ শুধুমাত্র মুহূর্তের কারুকলাকে বিশ্বাস করেন না, এমন-কি শাশ্বতভাবে বিদায় নেওয়ার ('continual farewell') পার্বণটিকেও ততটা আস্থাবান আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ করেন না। তাঁর অতিশায়ী অভিপ্রায় এমন এই প্রেমিকা যে 'খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতের তার।'

এই গ্রন্থিতেই জীবনানন্দের ১২টি বোধিবিদ্ধ উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ: 'লরেন্স বা এজরা পাউণ্ড-এর উদ্ধৃত করে তার নিচে কবিতা ছাপিয়ে (বা ইয়েট্সকে স্মরণ করে কবিতা লিখে যেমন আমি দু-একটি কবিতায় করেছি) আধুনিক বাংলা কবিতার বৈভব দেখাতে যাওয়াটাকে আমি বাঁকা জিনিস বলে মনে করি। কিন্তু যে মৌলিকতা তেমন নেই বলে শঙ্কিত হবারও বিশেষ কারণ নেই। কারণ তখন কোনো বড় ইংরেজ কবির নামই আমি মনে করতে পারি না যাঁরা ইটালির নিকট, এলিজাবেথানদের নিকট, পূর্বজ ইংরেজ কবিদের কাছে স্টাইল ও ভাববৈচিত্র্যের

জন্য ঋণী নন। কিন্তু সে সব অম্লান স্বাস্থ্যে হজম করে নিতে পেরেছেন ; আমাদের ভিতর কেউ-কেউ পেরেছেন হয়তো। কারো-কারো জিনিস উত্তীর্ণ হচ্ছে। কিন্তু স্টাইলে নিছক মৌলিকতা ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতার অন্য সম্মানও আছে। এবং নিছক মৌলিক না হয়েও কয়েকজন কবির স্টাইল-এর যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। আমার যতদূর মনে হয় এসব নিয়ে আমার নিজের হৃদয় অসংগতির ধোঁয়ায় অতৃপ্ত হচ্ছে না।' 'বনলতা সেন' গ্রন্থের প্রস্তুতিকালীন এই এজাহার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কোনো পূর্বসূরির কাছে ঋণীর যাবার অর্থ নিজের কাছ থেকে সরে যাওয়া নয়। সুতরাং জীবনানন্দ কেন ইয়েট্সের একটি কবিতাকে স্থানান্তরিত করতে গিয়ে নিজের নির্মাণ-করতে-চাওয়া জগৎ ও জীবনের কাছাকাছি চলে এলেন, এই মর্মে মাথা ঘামানোর নৈয়ায়িক পারম্পর্য থাকলেও কোনো নান্দনিক তাৎপর্য নেই।

আসল কথা, কোনো কবিই উত্তরাধিকারের দায় থেকে মুক্ত নন। তিনি কীভাবে ঐ দায়ভাগ থেকে নতুন দায়িত্ববোধ তৈরি করে নেবেন, সেটাই হলো বিবেচ্য। এই দিক থেকেই আমাদের আলোচনার পরবর্তী অংশটি সূচিত হতে পারে। আমাদের প্রভাবসন্ধানী মনের সহজাত প্রলোভন নিশ্চয়ই পূর্বগামীর উত্তর সাধকের কোন্ পদ্যে কীভাবে অনুসৃত হলো, সেদিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু তুলনামূলক সাহিত্যের কোনো অপ্রতিভ শিক্ষার্থীও আজ সেভাবে কোনো উত্তীর্ণ কবিতার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করতে যাবেন না। তিনি দেখতে চাইবেন, মোটিফ-সংক্রান্ত প্রভাবসত্ত্বেও পরবর্তী কবি কোন্ শিল্পভাবনার টানে মৌল অনুষঙ্গকে দুমড়ে-মুচড়ে ব্যবহার করছেন। এই প্রয়োগ পরীক্ষণের চাহিদায় আমরা এখানে ইয়েট্স ও জীবনানন্দের দুটি অতিব্যবহৃত কবিতা পরপর তুলে দিচ্ছি :

১. হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে !
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে !
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় কুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে !
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

('হায় চিল')

২. O Curlew, cry no more in the air,
Or only to the water in the west ;
Because your craying brings to my minds
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast :
There is enough evil in the crying of wind.

('He reproves the Curlew')

দুটি কবিতা দুই বিভিন্ন ধারার অভিগামী। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় নির্মাণ করেছেন বিধূমিত হৃদয়ের এমন একটি জগৎ যা বিস্ময় ও প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যাখ্যাতীত এক দুর্জ্ঞেয় অন্যোন্যতা নির্মাণ করে। সেদিক দিয়ে দেখলে, ইয়েট্স্-এর কবিতাটিতে সরল বেদনার সাড়ম্বর আর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। এভাবে বললে মনে হতে পারে, ইয়েট্সের কবিতাটিকে আমরা তুচ্ছ করে দেখতে চাইছি। কিন্তুসেরকম কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমাদের বিনীত বক্তব্য শুধুমাত্র এই যে, জীবনানন্দ আমাদের এই বিধ্বস্ত সময়ের পটভূমিতে স্বগত প্রেমিকের বেদনাতে স্থাপিত করে দিয়েছেন। বিস্ময় এবং বিশ্লেষণ, প্রেম ও সমকালের এই কোমল-কড়ির দোলাচল তাঁর কবিতাটিকে আমাদের সময়ের আরো কাছে নিয়ে এসেছে। সেই তুলনায় ইয়েট্সের The Wind Among the Reeds (১৮৯৯) বইয়ের অন্তর্গত অসামান্য কবিতাটিও যেন একধাতব। হায় চিল কবিতাটির পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে এক নিশ্বাসে উত্থাপিত হয়েছে একটি প্রশ্ন এবং আত্মপ্রশ্ন। এই যুগ্মতা এক নতুন উপাদান। এর পরেই শুরুর আস্থায়ী শেষের আভোগে ফিরে এসেছে। ধ্রুবপদের এই ব্যবহার একাধারে সহজ এবং রহস্যময়।

এই প্রত্যাবর্তের ধাঁচটি এ বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ। প্রাচীন বাংলা কবিতায় এটি ছিল। এবং জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রসংগীত কিংবা নজরুল-অতুলপ্রসাদ প্রমুখ শব্দশিল্পী ও সুরকারের গীতিকবিতায় এই নক্‌শাটি লক্ষ করে থাকবেন। কিন্তু কবিতার আকৃতিগত প্রয়োজনে এ-ধরনের পুনরাবৃত্তি জীবনানন্দে যেভাবে জটিলতর চেহারা নিয়েছে, তার নক্‌শাটি পুরনো বাংলা কবিতা বা সমকালীন বাংলা গান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়নি। এর উৎস ইয়েট্স। লক্ষ করতে হবে ইয়েট্স তাঁর উল্লিখিত কবিতায় সোজাসুজি ধুয়া না ব্যবহার করে প্রথম লাইনটিকে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে ভেঙে সাজিয়েছেন। এরি পাশাপাশি রোদনবাচক শব্দটিকে মাত্র ছ'লাইনের

কবিতায় তিনি তিনবার কাজে লাগিয়েছেন। In the Seven Woods (১৯০৪) থেকে শুরু করে ইয়েট্সের পরবর্তী কবিতায় ধ্রুবার পাশাপাশি একই শব্দ, শব্দবন্ধ বা বাগ্‌বন্ধকে ঢেলে সাজিয়ে ব্যবহার করার একটি স্বরচিত ঘরানা দেখতে পাই। এখানে Responsibilities (১৯১৪) বইয়ের বিখ্যাত Three Beggars কবিতা থেকে প্রবাদপ্রতিম লাইনগুলো অনিবার্যতই মনে আসে :

They mauled and bit the whole night through ;
They mauled and bit till the day shone ;
They mauled and bit through all that day
And till another night had gone...

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের 'লঘুমুহূর্ত' কবিতায় 'তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরী'র বৃত্তান্তে ইয়েট্সের বর্ণিত তিন ভিখিরির থীমগত প্রভাব আছে। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে যেটা দ্রষ্টব্য তা হলো সদ্য উৎকলিত লাইনগুলোর প্রায়-পুনরাবৃত্তিমূলক ঠাট। জীবনানন্দ এই পদ্ধতিটিকে 'ভিখিরী' কবিতায় নিপুণ-ভাবে প্রয়োগ করলেন :

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চলে যাবো মানে-মানে।

এ পর্যন্ত বলে অন্ধকারের দিকে ভিখিরিটি যখন হাত বাড়িয়ে দেয়, তার সেই আচরণ আমাদের কাছে যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। প্রতিটি লাইন তার আগের লাইনের উপর নির্ভর করেও অনেকদূর এগিয়ে যায় এবং নির্ভরতা ও অগ্রসৃতির এই কুরুশবুনি, আপাত-মন্থরতা সত্ত্বেও, 'মায়াবীর মতো বাহুবল' সৃষ্টি করে। এখানে আমাদের চিন্তা করার পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করেই, ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তিব্বতী প্রার্থনাচক্রের ধ্বনিক্ষেপের মতো, ঐন্দ্রজালিক আয়তন তৈরি হয়ে যায়। প্রার্থনা-চক্রে থাকে শুধু যন্ত্রানুগ পুনরাবৃত্তি। এখানে তার জায়গায় ক্রমশ এসে যেতে থাকে নতুন-নতুন সংযোজন। আগের অংশটিকে ঈষৎ খারিজ করে, অর্থের আরো প্রচ্ছায়া যোগ করতে-করতে, এই চলা 'বনলতা সেন' গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব এবং উত্তরকালেও উপস্থিত। এ বইয়ের দুয়েকটি জায়গা থেকে এই চলনের আরো সার্থক দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে :

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর ;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে···

('কুড়ি বছর পরে')

প্রথম লাইনের দৃশ্য-স্পৃশ্য-মূর্ত বিষয়ক পরের লাইনে অপেক্ষাকৃত দুরূহতায় আক্রান্ত ও অমূর্ত হয়েছে। তৃতীয় লাইনের বিশেষিত বিষয় পরের লাইনে তেমনি নির্বিশেষ হয়ে উঠতে পেরেছে। বিশেষ-নির্বিশেষের এই জোড় একদিকে যেমন পাঠকের কাছে সাধারণীকরণের দাবিতে পৌঁছে যায়, তেমনি লেখকের কাছে, স্তরক্রম তৈরি করার আগ্রহে, তার একটি প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বিশেষ এখানে বিশেষত্বকে বাতিল করে দিচ্ছে না, বড়ো ক্যানভাসে এনে দেখাচ্ছে। এইভাবে এক-একবার পিছনে তারপর ফিরে সামনে চলার মধ্যে অনেক সময় প্রাজ্ঞ মানুষের অতিসতর্ক সাবধান ভঙ্গি আছে যা পাঠককে, জীবনানন্দের অনেক স্মৃতিধার্য কবিতার ক্ষেত্রেও, বিরক্ত করতে পারে। বিশেষত যখন কবি পাঠকের প্রতি অতিরিক্ত সচেতন হয়ে একই প্রশ্নকে নানাভাবে বাজিয়ে দিতে থাকেন :

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

('হাওয়ার রাত')

প্রতর্কবোধ থেকে ফুটে উঠল পুরাঘটিত অতীতের সজীব একটি পরম্পরা।

এভাবে প্রদত্ত উপকরণকে ব্যতিব্যস্ত করে নবত্ব নিয়ে আসার এই ধরনটি ভাষাতত্ত্বের প্রাগ্‌ স্কুলের দেশনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গমুখী শব্দার্থবিদ্যায় (Semanties) প্রসারণের দ্যোতনা আবিষ্কার করাই মুখ্য দায়িত্ব। প্রকৃত তাৎপর্যকে শব্দ-অর্থের পরিসরে চিহ্নিত করতে গিয়ে ভাষাতত্ত্বের প্রাগ্‌ কোনো-কোনো প্রবক্তা ব্যাকরণের স্বাধীন ও সাপেক্ষ দুটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন। আমরা যদি উপবাক্যের (clause) ক্ষেত্রে এ দুই দিকে দৃষ্টি রাখি তাহলে দেখতে পাব, সাপেক্ষ উপবাক্যে একটি পরিস্থিতি বা সংবাদ জ্ঞাপিত হচ্ছে যা জ্ঞাত, অথবা গৃহীত। স্বাধীন উপবাক্যে কিন্তু যোজিত হচ্ছে, এমন একটি সংবাদপরিস্থিতি যা 'এখন পর্যন্ত জানা ছিল না।' এই গৃহীত এবং যোজিত

উপকরণের মধ্য দিয়েই একটি তাৎপর্যময় বাক্যের জটিল সমস্যা ফুটে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, ক্রিয়াবিশেষণ বা অপর কার্যকারিতার পরামর্শে উপবাক্যের সন্নিবেশ না থাকলে চলবে না। এখানে বক্তব্য শুধু হলো এই যে, বাক্যের ভিতরকার আকৃতিগত স্তরভেদ নির্ণয় করতে না পারলে সম্পূর্ণ তাৎপর্যটি চোখে পড়বে না। আলোচ্য প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, জীবনানন্দ বাক্য গঠনের সময় বাক্যাংশ বা উপবাক্যের উপযোগিতাকে বিপুল প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং এক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্যবস্তু হলো, পরিচিত অথবা বিদিত অংশের সঙ্গে অঙ্কিত অভিনব পর্যায়ের একটি সংঘাত এবং পরিণামী সমন্বয় তৈরি করা।

তাঁর মনঃপূত এই বাক্য-বাক্যাংশের সম্বন্ধ শিল্প ও সত্তার হতে-থাকা এবং হয়ে-ওঠার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেয়। আমরা এই মাত্র যাকে সংঘাত ও সমন্বয় বলেছি তার ধাঁচটি সর্বাত্মক হয়ে তাঁর রচনায় চলে এল। 'যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে/তার স্নিগ্ধ মালতী সৌরভে' ('মিতভাষণ'), এই ধরনের অনন্যসাধারণ লাইনে অনেক সংকীর্ণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর কাছেই অকারণ দুর্বোধ বলে মনে হয়ে থাকবে। তার কারণ শব্দ ও সত্তার পরস্পর এই হয়ে-উঠতে থাকার গরজ অনেকের কাছেই, বিশেষত যাঁরা কবিতার কাছে একমেবাদ্বিতীয় একটি সযুক্তিসূচক মর্মার্থ যাচনা করেন এবং না পেলেই যৎপরোনাস্তি কোপনস্বভাব হয়ে ওঠেন, গোলমেলে ঠেকতে পারে। কিন্তু এই অগভীর প্রত্যাশার কাছে 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'র কবি সমর্পণ করেননি।

ছাদ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ি। একটা নিজের বাড়ি!

সুমিতের ঠাকুর্দার একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল বটে, কিন্তু তার বাবার কোনো বাড়ি ছিল না। বাবার আমল থেকেই ওরা শিকড়হীন, স্রোতের শ্যাওলার মতন কলকাতার নানান পাড়ায় ভাড়াটে হিসেবে কাটিয়েছে। ঠাকুর্দার বাড়িটা অবশ্য বিক্রি করা হয়নি, সেটা হারিয়ে গেছে র‍্যাডক্লিফের ছুরিতে।

কোনো ভাড়া বাড়িই মায়ের পছন্দ হতো না। প্রথম দিকে তো থাকতে হয়েছিল উত্তর কলকাতার তেলীপাড়া লেনে, একতলায় মাত্র দেড়খানা ঘর। দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে অন্ধকার। সে বাড়িটা ছিল পাখির বাসার মতন। মাত্র দোতলা বাড়ি, তাতেই পাঁচটা ভাড়াটের সংসার, সব সময় মানুষের কল-কোলাহল। সুমিত তখন খুব ছোট ছিল, তার মনে আছে, জল নিয়ে প্রত্যেকদিন ঝগড়া হতো, মেয়েরা গামছা পরে দাঁড়িয়ে থাকতো বাথরুমের বাইরে। বাথরুম না, ওরা বলতো কলঘর। চৌবাচ্চার ভেতরটায় ময়লা জমে জমে এমনই অবস্থা যে জলের রং-ও কালো মনে হতো।

মা প্রায়ই বলতেন, ভাড়া বাড়িতে থাকলে মন ছোট হয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরাও যদি জল নিয়ে ঝগড়া করতে শেখে, তবে তারা এক সময় ভুলেই যাবে যে তারা একটা ভদ্র বংশে জন্মেছিল।

বাবাকে এ জন্য প্রায়ই গঞ্জনা শুনতে হতো। মা চাইতেন, খাওয়ার কষ্ট হয় হোক, জামা-কাপড় ছেঁড়া পরলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা ভালো বাড়িতে থাকতে হবে। কিন্তু তখন কোনোরকম শৌখিনতার কোনো প্রশ্নই ছিল না। বাবার তবু একটা চাকরি ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই সপরিবারে ওপার থেকে চলে এসেছিলেন, কোনো উপার্জনই ছিল না তাঁর। সেই সংসারের খরচও বাবাকে টানতে হতো। সুমিতের জ্যাঠাইমা আর তার মা, এই দুই জায়ের মধ্যে ভাব ছিল না কখনো। দেশের বাড়িতে জ্যাঠাইমা-ই ছিলেন কর্ত্রী, মাকে খুব দাবিয়ে রাখতেন। সেই জ্যাঠাইমা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এসে অসহায়

অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন, ছোট জায়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মা এটা সহ্য করতে পারতেন না। আগেকার দুর্ব্যবহারের শোধ তুলতেন যখন তখন। শেষ পর্যন্ত জ্যাঠামশাইরা উঠে গিয়েছিলেন গোয়াবাগানের এক বস্তিতে। বাবা অবশ্য নিজের দাদাকে ফেলতে পারেননি। প্রত্যেক মাসে তাঁর মাইনের অর্ধেক তুলে দিয়ে আসতেন জ্যাঠামশাইয়ের হাতে।

সেইসব দিনের কথা সুমিতের ইদানীং বেশি করে মনে পড়ছে।

বছর দশ-পনেরো বাদে অবস্থা কিছুটা ফিরেছিল। সুমিতের দিদি অর্চনা গ্র্যাজুয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরির মাইনে ভালো, বাবা এতদিন ধরে সরকারি কেরানির চাকরি করছেন, আর নতুন চাকরিতে ঢুকেই দিদির মাইনে প্রায় তাঁর সমান। বিয়ের আগে টানা পাঁচ বছর দিদি তার মাইনের টাকা দিয়ে এই সংসারের সাহায্য করে গেছে।

সেই সময়টায় ভবানীপুরের একটা তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটে উঠে আসা হয়েছিল। বেশ ভালো বাড়ি, জলের কোনো অসুবিধে নেই, তবু মায়ের পছন্দ হয়নি। বাড়িওয়ালারাও থাকতো ঐ বাড়ির তিনতলায়। ভাড়াটেদের সঙ্গে বাড়িওয়ালাদের ব্যবহারের মধ্যে কখনো প্রকটভাবে, কখনো সূক্ষ্মভাবে জমিদার-প্রজার সম্পর্কের মতন একটা ভাব ফুটে বেরোয়ই। পরের বাড়িতে থাকাটাই মা মেনে নিতে পারতেন না।

দিদির বিয়ের পর বিপর্যয় এলো দু'রকম ভাবে।

অর্চনা অবশ্য বিয়ে করেছে নিজে পছন্দ করে, তার বিয়েতে পণ-টন কিংবা বেশি গয়নাগাটি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি। তবু মেয়ের বিয়েতে কয়েক হাজার টাকা তো খরচ হয়ই। অনেক কষ্টে বাবা সেই টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। প্রতি মাসে কিছু ঋণ শোধের ব্যাপার ছিল। সংসার থেকে দিদির উপার্জনটাও বাদ হয়ে গেল, তখন ভবানীপুরের ঐ বড়ো ফ্ল্যাটটার ভাড়া টাকাও কষ্টকর মনে হতো।

অর্চনা বিয়ের পরেও চাকরি ছাড়েনি এবং সে তার মাইনের খানিকটা অংশ অন্তত বাপের বাড়ির জন্য দিতে চেয়েছিল। মা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির কাছে কিছুতেই তিনি ছোট হতে পারবেন না!

এরই মধ্যে মা আবার একটি জেদ ধরলেন।

পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলার কাছ থেকে জানা গেল যে বারুইপুরে খুব সস্তায় জমি বিক্রি হচ্ছে। সেই মহিলারা সেখানে এক বিঘে জমি কিনেছেন, সেখানে একটা বাড়ি বানিয়ে তাঁরা শিগগির উঠে যাবেন।

মা অমনি ধরে বসলেন, বাবাকেও ওখানে জমি কিনতে হবে!

একেবারে অসম্ভব প্রস্তাব, বাবার হাতে কোনো টাকাই নেই, বরং রয়েছে ধার। এখন জমি কেনা নিছক দিবা স্বপ্নেই সম্ভব।

মা তবু বেঁকে বসে রইলেন, কান্নাকাটি করলেন, শেষ পর্যন্ত বার করে দিলেন তাঁর গয়না। এতদিনের অভাব আর টানাটানির মধ্যেও কী করে ঐ গয়না বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তা কে জানে। সেই গয়না বিক্রি করে বারুইপুরের কাছে কেনা হলো সাড়ে চার কাঠা জমি। বেশ সস্তাই বলতে হবে, তিন হাজার টাকা করে কাঠা। কলকাতার মধ্যে জমির দাম আগুন, মধ্যবিত্তরা দ্রুত সরে যাচ্ছে মফঃস্বলের দিকে।

জমি কেনার পরেই মায়ের মেজাজ বেশ প্রসন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি না থাক, তবু তো এক টুকরো জমির মালিক। পশ্চিমবাংলায় নিজস্ব একটা পা রাখার জায়গা।

ঠিক হলো, বাবার ধার-টার একটু শোধ হলেই ভিত খুঁড়তে হবে ঐ জমিতে। কোনোরকমে একটা ঘর হলেই চলবে, সঙ্গে রান্নাঘর আর বাথরুম। মা তাতেই রাজি, কোনোক্রমে সেই একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে পারলে মাঝে মাঝে বাড়ি ভাড়ার টাকাটা বাঁচানো যাবে, সেই টাকা সাশ্রয় হলে বাড়ানো যাবে আরও দু'একটা ঘর। আস্তে আস্তে হবে, তাতে ক্ষতি কি।

সুমিতের তখন পনেরো বছর বয়েস। সে সবেমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেছে। সে দেখতো, মাঝে মাঝেই রাত্তিরের দিকে বাবা আর মা তাঁদের কাল্পনিক বাড়ির নক্সা নিয়ে আলোচনা করছেন। কাল্পনিক বাড়িটি দোতলা, তার ঘরগুলির আকার ও অবস্থান বদলে যাচ্ছে অনবরত। বাবা ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলতেন, দোতলার বড়ো ঘরটা হবে ঐ ডানদিকে। মা-ও আঙুল তুলে বলতেন, ডানদিকে তো একটা কারখানা দেখা যাবে, বরং পুবদিকটায় একটা পুকুর আছে…।

হঠাৎ এক সন্ধেবেলা বাবার হৃদযন্ত্রটি বন্ধ হয়ে গেল। তখনও তাঁর রিটায়ার করার পাঁচ বছর বাকি। নিজের বাড়ি আর দেখা হলো না। বাবাকে এই পৃথিবীটাই ছাড়তে হলো।

এরপর আর বাড়ি বানাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রায় আট-ন'বছর অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কেটেছে। মাঝে মাঝে বারুইপুরের জমিটা বিক্রি করে দেবার কথা উঠতো, সুমিতই তখন এ সংসারের প্রধান পুরুষ, সে বলতো, এখন থাক

জমিটা। এর থেকেও যদি খারাপ অবস্থা হয় কখনো···।

সুমিত চাকরি পাবার পর অবস্থা কিছুটা সামলালো। আর তিন বছরের মধ্যেই তার ছোট ভাই অমিত চাকরি পেল বম্বেতে। মাকে সে নিয়ে গেল তার কাছে। দু'বছর পর অমিত চলে গেল ক্যানাডায়। মা ফিরে এলেন সুমিতের কাছে। অর্চনা তার স্বামীর সঙ্গে থাকে কানপুরে, সে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার ছেলে-মেয়েদের সামলাবার জন্য মাকে সেখানে গিয়ে থাকতে হলো টানা আট মাস।

অফিস থেকে সুমিত এখন ভালো ফ্ল্যাট পেয়েছে বালিগঞ্জ প্লেসে।

চব্বিশ ঘণ্টা জল, প্রচুর আলো-হাওয়া। বড়ো বড়ো তিনটে বেড রুম, তাছাড়া লিভিং রুম ডাইনিং স্পেস। দুটো বারান্দা। মায়ের জন্য একটা ঘর আলাদা করে রাখা আছে। বারুইপুরের জমিটা পড়ে আছে, তা নিয়ে সুমিত মাথা ঘামায় না।

মা-ও আর কক্ষনো বাড়ির কথা বলেননি। একবারও না।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, খালি জমি ফেলে রাখলে জবর দখল হয়ে যেতে পারে। জমির দাম বারুইপুরেও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সুমিত তার অফিস এবং লেখালেখি নিয়ে এতই ব্যস্ত যে ওসব নিয়ে চিন্তা করারও সময় পায় না।

সুমিতের স্ত্রী রূপালি অবশ্য মাঝে মাঝে জমিটা দেখতে যায়। গত বছর সে জমিটার একটা ভালো ব্যবস্থাও করেছে। রূপালির খুব গাছপালার শখ, সে অনেকগুলো গাছের চারা লাগিয়ে এসেছে সেই জমিতে। বাড়ি না হোক, ঐ জমির ফুল-ফল উপভোগ করা যাবে।

গাছ লাগালেই গাছ বড়ো হয় না। জমির চারপাশে বেড়া লাগাতে হয়। নিয়মিত গাছে জল দেবার ব্যবস্থা করাও দরকার। রূপালি নিজের উদ্যোগেই রাধেশ্যাম নামে স্থানীয় একজন লোককে ঠিক করে এসেছে। সে নিয়মিত গাছে জল দেবে, বাগান দেখবে। মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে। রূপালি নিজেও দেখাশুনো করবার জন্য নিজেও প্রায়ই যায় সেখানে, মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মা গড়িমসি করেন, তাঁর কোনো আগ্রহ নেই মনে হয়।

অমিত তিন বছর অন্তর একবার ক্যানাডা থেকে দেশে ফেরে। খুব হৈ চৈ করে কয়েকটা দিন, টাকা খরচ করে দু'হাতে। প্রত্যেকবার এসেই সে মাকে নিয়ে যেতে চায় ক্যানাডায়, কিন্তু মা সাগর পাড়ি দিতে একেবারেই রাজি নন।

এবারে অমিত এসে বৌদির সঙ্গে একদিন জমিটা দেখতে গিয়েছিল। চারা গাছগুলো এখনো ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়নি, তবে বেঁচে গেছে কিছু কিছু। রাধে-শ্যাম নামে লোকটি তেমন যত্ন নেয়নি, গরু-ছাগল ঢুকে খেয়ে ফেলেছে কিছু গাছ। অমিত তাকে বকুনি দিয়েছে আবার একটা ঘড়িও উপহার দিয়ে এসেছে।

অমিত হঠাৎ বললো, দাদা, জায়গাটা এমনি এমনি পড়ে আছে। ওখানে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেললেই তো হয়। তুই একটা এস্টিমেট করে ফ্যাল, আমি আর্দ্ধেক টাকা দিচ্ছি!

সুমিত বললো, তোর মাথা খারাপ নাকি? ওখানে বাড়ি বানিয়ে কী হবে? কে থাকবে? আমি কি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে ঐ ধ্যাদ্ধারা গোবিন্দপুরে থাকতে যাবো নাকি?

অমিত বললো, তবু একটা নিজেদের বাড়ি থাকবে! আমি যখন দেশে আসবো, তখন ঐ রকম একটা ফাঁকা জায়গায় থাকতে ভালো লাগবে। কলকাতার বাতাসে আমার চোখ জ্বালা করে।

সুমিত হেসে বললো, তুই তিন-চার বছর অন্তর আসবি, তার জন্যে একটা বাড়ি করে ফেলে রাখতে হবে? ভাড়া দিলেও রিস্কি, একবার দিলে আর ভাড়াটে উঠবে না!

অমিত বললো, ভাড়া দিতে হবে কেন? মা গিয়ে থাকতে পারে!

এই কথাটা অবশ্য সুমিত উড়িয়ে দিতে পারলো না।

মা আজকাল খুব কম কথা বলেন। তা শুধু বয়েসের জন্যই না। মায়ের এখন কোনো নিজস্ব সংসার নেই। কখনো অর্চনার কাছে, কখনো বড়ো নাতির কাছে জামসেদপুরে, কখনো থাকেন সুমিতের বাড়িতে। এ বাড়িতে রূপালিই এখন গৃহিণী, মা-ও পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ মাথা গলান না।

বারুইপুরে একটা বাড়ি করলে মা সেখানে আবার একটা সংসার পাততে পারেন।

অমিত বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বললো, আমি কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি, তুই এক্ষুণি কাজ সুরু করে দে, দাদা!

সুমিত বললো, টাকা দিলেই হলো? বাড়ি তৈরির ঝঞ্ঝাট আছে না? কণ্ট্রাক্টরকে দিলেও নিজেরা দাঁড়িয়ে না দেখলে চুরি করে ফাঁক করে দেবে! আমার একদম সময় নেই।

রূপালি ফস করে বললো, আমি দেখাশুনো করতে পারি।

দেখা গেল একটা নতুন বাড়ির ব্যাপারে রূপালিরও খুব উৎসাহ। দেওর আর বৌদি মিলে শুরু হয়ে গেল জল্পনা-কল্পনা।

এক সময় অমিত বললো, দাদা, তোমার চেনা কোনো আর্কিটেক্ট আছে? তাহলে একটা প্ল্যান করিয়ে ফেললে হয়। আমি যাবার আগেই দেখে যেতে চাই।

তখন অনেকদিন আগেকার একটা দৃশ্য মনে পড়লো সুমিতের। সে একটুক্ষণ দেয়াল দেখলো। রাত্তিরবেলা মা আর বাবা আঙুল তুলে তুলে একটা কাল্পনিক দোতলা বাড়ির ছবি আঁকতেন। অমিত তখন বেশ ছোট, সে এসব জানে না।

সুমিত বললো, একবার মা-কে ডাক তো!

মা এ-ঘরে এলে সুমিত জিজ্ঞেস করলো, মা তোমার মনে আছে, তুমি আর বাবা মিলে একটা বাড়ির নক্সা বানিয়েছিলে? সেটা তোমরা এঁকে রেখেছিলে কোথাও!

মা উদাসীন ভাবে বললেন, সে কি আর মনে আছে। কতদিন আগেকার কথা!

অমিত বললো, মা, বাবার জায়গাটায় আমরা এবার একটা বাড়ি বানাবো ঠিক করেছি।

মা বললেন, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ওখানে বাড়ি বানিয়ে কি করবি? কে থাকবে?

অমিত বললো, আমরা সবাই যখন ইচ্ছে থাকবো। দিদি কলকাতায় এলে থাকতে পারে। তুমি থাকবে!

মা তবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। কখন তিনি উঠে গেলেন তা আমরা খেয়ালও করলাম না।

একটু পরে রূপালি ফিসফিস করে বললো, এই, মায়ের কী যেন হয়েছে। বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমি দু' তিনবার ডাকলুম। কোনো উত্তরই দিলেন না!

অমিত অবাক হয়ে বললো, কেন, মা কাঁদছে কেন? এই তো এখানে ছিল!

অমিত খুব ছোট ছিল, তার সেইসব দুঃখের দিনগুলোর কথা মনে নেই। মা যে তাঁর শেষ গয়নাগুলো বিক্রি করতে দিয়েছিলেন জমিটা কেনার জন্য, সে কথাও বোধহয় অমিত জানে না।

সুমিতের সব মনে পড়ে যায়। মায়ের কান্নার কারণটাও সে আন্দাজ করতে পারলো। স্বামীকে তিনি বাড়ি তৈরি করবার জন্য জোর করতে পারতেন,

ছেলেদের পারেন না। ইচ্ছেটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন এতদিন, কিন্তু এখন তাঁর বাড়ির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

সুমিত গল্প-উপন্যাস লেখে, তাতে অনেক মাতৃচরিত্র থাকে। কিন্তু নিজের মায়ের সঙ্গে তার যোগসূত্রটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। আগের মতন সে মায়ের সামনে বসে প্রাণ খুলে গল্প করতে পারে না।

অমিত থাকে বিদেশে, মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় খুব কম, তবু মায়ের সঙ্গে তারই বেশি বন্ধুত্ব। সে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো মাকে।

অমিতের উৎসাহেই দু' সপ্তাহের মধ্যে একটা বাড়ির নীল-নক্সা তৈরি হয়ে গেল। অমিতের ফেরার দু' দিন আগে ভিত্ পুজো হয়ে গেল পর্যন্ত। ডলার ভাঙিয়ে গুচ্ছের টাকা সে রেখে গেল বৌদির কাছে।

রূপালির প্রধান নেশা রবীন্দ্রসঙ্গীত। সে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে অনেকদিন, মাঝে দু' একটা অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসেও গান গায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট বাজে। তার যে বাড়ির তৈরির ব্যাপারেও এত আগ্রহ থাকতে পারে, তা সুমিত আগে কখনো বুঝতে পারেনি। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই বুঝি একটা নিজস্ব গৃহের আকাঙ্ক্ষা থাকে।

সুমিত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তবু তাকে প্রত্যেকদিনই এখন ইট, সিমেন্ট, বালির কথা শুনতে হয়। রূপালি তার এক মাসতুতো ভাইয়ের সাহায্য নিচ্ছে, ওরা দু' জনে মিলে মিস্তিরিদের কাজ তদারক করতে যায় প্রায় প্রত্যেকদিনই। বাড়ি ফিরে সেই সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। যে-সব মিস্তিরিদের চোখেও দেখেনি সুমিত, তাদের নাম এখন তার মুখস্থ। কোন্ মিস্তিরি ফাঁকিবাজ আর কে খুব ভালো কাজ জানে অথচ প্রায়ই ডুব মারে, তাও সুমিত জানে। রাধেশ্যাম নামে যে-লোকটিকে গাছে জল দেবার জন্য রাখা হয়েছিল, সে আর তার স্ত্রী সুবালা খুব গোলমাল করছে। কাজ কিছু করে না, কিন্তু প্রায়ই এটা সেটা চায়, তাদের ছেলে মেয়েরা এসে ঘুর ঘুর করে, রূপালিকে এর মধ্যেই দু'খানা শাড়ি ও বাচ্চাদের জন্য কয়েকটা প্যাণ্ট শার্ট দিতে হয়েছে। ওদের ছাড়ানোও যাচ্ছে না, এমন নাছোড়বান্দা!

ছোট ভাই টাকা দিয়ে গেছে, সেইজন্য সুমিতকেও এখন টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে। কিন্তু শুধু টাকা দিয়েও তো তার নিষ্কৃতি নেই, ইট সিমেন্টের কথা শুনতে শুনতেও তার কান ঝালাপালা হয়। বাড়ির প্ল্যানও বদলাচ্ছে ঘন ঘন, রূপালি এখন মাকেও যুক্ত করে নিয়েছে।

কয়েক মাস বাদে রূপালি একদিন বললো, এই শোনো, সামনের রবিবার কিন্তু তুমি কোনো কাজ রাখবে না। সেদিন তোমাকে বাড়ির ওখানে যেতে হবে!

সুমিত আঁতকে উঠে বললো, সে কি, এর মধ্যে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল নাকি? কমপ্লিট?

রূপালি বললো, ধ্যাৎ; তুমি কিছু বোঝো না। বাড়িটা কি আলাদিন বানাচ্ছে নাকি? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি হয়! জানলা-দরজার এখনো অর্ডার দিয়েছি?

সুমিত বললো, তা হলে আমি এখন গিয়ে কী করবো?

রূপালি বললো, সেদিন ছাদ ঢালাই হবে।

সুমিত বললো, তুমিই তো বললে আমি বাড়ির কাজ কিছু বুঝি না। ছাদ ঢালাইয়ের সময় গিয়েই বা কী করবো? সে তো শুনেছি অনেকক্ষণ লাগে!

রূপালি বললো, ছাদ ঢালাইয়ের সময় থাকতে হয়। মিস্তিরিদের মিষ্টি খাওয়াতে হয় সেদিন, বাড়ির লোকজন সেদিন না থাকলে চলে?

সুমিত হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও রূপালি জেদ ধরে রইলো। শেষ পর্যন্ত অভিমান করে বললো, বাড়ির জন্য আমি খেটে খেটে মরছি, গায়ের রং কালো হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি একদিনও যেতে পারবে না। টাকা দিয়েই সব দায়িত্ব শেষ?

শনিবার রাত্তিরে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল এক চোট। রবিবার সকালেও আকাশ মেঘলা। এসবই নাকি ভালো লক্ষণ। বিকেলের আগে ঢালাই শেষ হবে, তারপর বৃষ্টি নামলে ছাদ মজবুত হবে। সিমেন্ট-ঢালাই দশ-পনেরো দিন এমনিতেই জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।

সুমিত আর রূপালি যখন পৌঁছলো, তার আগেই ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। রূপালির ভাই বিমল তদারকি করছে সব কিছুর। সিমেন্ট আর বালি মিশ্রণের পরিমাণ বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান আছে। বালিগুলো চালুনি দিয়ে ছেঁকে নেবার নির্দেশ দিচ্ছে সে মিস্তিরিদের।

আজ এক সঙ্গে বেশ কয়েকজন মিস্তিরি ও জোগাড়ে এসেছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তলা থেকে তরল ঢালাইয়ের জিনিস ভরা পাত্র বাঁশের ভারা দিয়ে হাতে হাতে উঠে যাচ্ছে ওপরে। এরকমই চলতে লাগলো। একঘেয়ে ব্যাপার।

এখানে সুমিত কী করবে?

একটা বারান্দা তৈরি হয়ে গেছে আগেই, খোলসটা খানিকটা সাফ-সুতরো করে সুমিত বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলো।

একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে ঠিকই। ভাড়া বাড়ি নয়, নিজস্ব বাড়ি, এত-দিন পর। মাঝখানে কত কিছু ঘটে গেল! জমি কেনার সময়কার দিনগুলি বারবার মনে পড়ছে সুমিতের। বাবার অনেক আপত্তি ছিল, মায়ের গয়না বিক্রি করতে চাননি কিছুতেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জমিটা কেনা হলো, বাবা সত্যিই খুশি হয়েছিলেন খুব। আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না। জমি কেনার পর বাড়ি বানাবার স্বপ্ন দেখতেও শুরু করেছিলেন।

বাবা কষ্টই করে গেলেন শুধু সারাটা জীবন, কিছু উপভোগ করার সুযোগ পেলেন না। আজ তাঁর ছোট ছেলে ক্যানাডায় বহু টাকা রোজগার করে, বড়ো ছেলেও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় যদি একখানা ঘরেরও বাড়ি বানানো যেত, তাহলে যে তৃপ্তি ও সুখ পাওয়া যেত, তার সঙ্গে এখানকার অবস্থাটার তুলনাই হয় না।

একজন স্ত্রীলোক মাথায় আধ ঘোমটা টেনে সুমিতের সামনে এসে দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, দাদাবাবু, একটা কথা বলবো?

সুমিত অসহায় বোধ করলো। এ আবার কী বলতে চায়? বাড়ির কোনো জিনিসপত্র যদি লাগে, সে ব্যাপারে সে কিছুই বলতে পারবে না। সে ডাকলো, রূপালি, বিমল···

স্ত্রীলোকটি বললো, বৌদিকে আগে বলেছি···আপনি যদি একটু শোনেন··· আমরা এই জমির গাছে জল দিই, আমার নাম সুবালা।

আগে দেখেনি একে সুমিত, তবু এই চরিত্রটি তার চেনা। রাধেশ্যামের বউ, এর পরনের শাড়িটা বেশ চেনা লাগছে। বোধহয় রূপালিই দিয়েছে।

সুমিত তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

স্ত্রীলোকটি বললো, ঝড়ে আমাদের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে। যদি কিছু সাহায্য দেন আমাদের। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে।

সুমিত ঠিক যেন শুনতে পায়নি, জিজ্ঞেস করলো, কী বললে?

স্ত্রীলোকটি বললো, আমাদের ঘরের ছাদ উড়ে গেছে, দাদাবাবু!

এখনও কথাটা বিশ্বাস হলো না সুমিতের। এটা কি গল্প নাকি! তার নিজের বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে, বিকেলের মধ্যেই পাকা ছাদ তৈরি হয়ে যাবে

আর ঠিক এই সময় একজন বলছে, তার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে।

এটা বড্ড অতি নাটকীয়। এরকম বিষয়বস্তু নিয়ে সুমিত নিজে কখনো গল্প লিখবে না। প্যাচপেচে, সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার।

ঠিক এই সময় রূপালি এসে উপস্থিত। সে বললো, কী হয়েছে, সুবালা?

সুবালা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বললো, দাদাবাবুকে আমাদের ঘরটার কথা বলছিলুম।

রূপালি ধমক দিয়ে বললো, তোমাকে দিলাম যে পঞ্চাশ টাকা!

সুবালা বললো, ওতে হবে না। যদি আরও কিছু দেন।

রূপালি বললো, ছাখো, এই সময় আমাদের অনেক খরচ। আমরা আর দিতে পারবো না। তোমরা অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করো!

সুবালা চলে যাবার পর সুমিত জিজ্ঞেস করলো, সত্যি সত্যি ওদের ছাদ উড়ে গেছে? নাকি বানিয়ে বলছে?

রূপালি বললো, না, বানায় নি। এই কাছেই ওরা থাকে, মাটির ঘর একখানা, তার ওপর খড়ের চাল উড়ে গেছে কালকের ঝড়ে। আমি দেখে এলুম তো। কিন্তু আমরা আর কত দেবো? ওর স্বামীটা একটা অপদার্থ!

সুমিতের ইচ্ছে করলো হো-হো করে হেসে উঠতে! তাহলে এরকম সত্যিই ঘটে। একজনের ছাদ ঢালাইয়ের পাশে আর একজনের ঘরের ছাদ উড়ে যায়! একজন কিছু পেলেই আর একজনকে কিছু হারাতে হবে!

আশেপাশে আরও কিছু পাকা বাড়ি উঠেছে। কিছু খালি জমিও পড়ে আছে। পেছন দিকে খানিকটা দূরে বোধহয় জবর দখলের জমি, সেখানে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা মাটির বাড়ি। তারই একটা সুবালাদের।

কোনো কাজ নেই, সুমিত হাঁটতে হাঁটতে গেল সেই দিকটায়। কারুর বাড়ির ছাদ যদি ঝড়ে উড়ে যায়, তার জন্য ঝড় দায়ী, সেই খরচ রূপালি বহন করতে যাবে কেন? খড়ের ছাউনি দিতে কত লাগে, তাও সুমিত জানে না।

কাছাকাছি গিয়ে সুমিত দেখলো সুবালা আর রাধেশ্যাম ছড়ানো-ছিটোনো খড়গুলো জড়ো করছে এক জায়গায়। মাটির দেয়ালও ধসে যায়নি ভাগ্যিস। কয়েকটা বাচ্চা ছুটোছুটি করছে তার মধ্যে। একটি মেয়ে, আর দুটি ছেলে। মেয়েটিই বড়ো, একটা বেখাপ্পা ফ্রক পরে আছে সে, তার শাড়ি পরার বয়েস এসে গেল বলে।

সুমিত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। তার আবার হাসি পাচ্ছে।

গরিবের দুঃখ-কষ্ট দেখে হাসা যায় না, সেটা অমানবিক ব্যাপার। সুমিতের হাসি পাচ্ছে অন্য কারণে। সে একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পাচ্ছে। এরা তিন ভাই বোন, যেন অবিকল সুমিতদের এক সময়কার পারিবারিক ছবি। বড়ো মেয়েটি অর্চনা, তারপর সুমিত আর অমিত।

মাথার ওপর একটা নিজস্ব ছাদ তুলতে এদের এখনো কত দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে!

মোমবাতি

সুধীর মুখোপাধ্যায়

খোলামেলা জায়গা দেখে পার্কের পাশেই বাড়ি করেছেন সদানন্দবাবু। যেতে বলেছেন অনেকদিন, যেতে পারিনি কাজকর্মের চাপে। যা হোক, সেদিন দুপুরে ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম সদানন্দের বাড়ি। গিয়ে দেখি সদানন্দবাবু মুখ গোমড়া করে বসে আছেন, আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,—

—কি হে সৌমেন, এতদিন পর বুড়ো দাদার কথা মনে পড়ল, এসো—এসো···

তবু তো আসতে পেরেছি, কিন্তু আপনি দরজা খুলে বারান্দায় একা একা বসে আছেন? একটু রসিকতা করে বললাম, কি ব্যাপার বৌদির সঙ্গে কি এখনও···

—আরে রাখ হে তোমার বৌদি, এখন আমার কথা ভাবতে তার বয়ে গেছে। নাতি-নাতনীদের নিয়ে বেশ জমিয়ে আছেন, এইতো ছোট নাতনীর স্কুলে গানের ফাংশান, তা উনিই নাচতে নাচতে চলে গেলেন, আমার হয়েছে যত জ্বালা···

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন,—দেখনা, দাম একটু বেশি দিয়েই পার্কের পাশের জমি নিয়ে বাড়ি করলাম, ভাবলাম, একটু আলো বাতাস পাবো—দক্ষিণ খোলা, নিশ্চিন্ত মনে লেখাটেখা, বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেই জীবনটা কাটিয়ে দেব। তা দেখনা, পার্কের মাঝে দিনরাত্রি মহোৎসব চলছে। আজকে এই পুজো, নয় সেই পুজো, নয় তো কোনো কালচারাল প্রোগ্রামের নাম করে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ,—একদিকে চাঁদা আর একদিকে মাইকের গলাবাজি···বলতে বলতেই পার্ক থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে এল, তাকিয়ে দেখি মিটিংয়ের বন্দোবস্ত চলছে।

আমাকে ওদিকে তাকাতে দেখে সদানন্দবাবু বলে উঠলেন,—কি দেখছ, ইলেকশনের মিটিং, একটু পরেই জননেতাদের ভাষণ শুনতে পাবে।—

ঠিক তাই একটু বাদেই শুনতে পেলাম—"এবার জগন্ময়বাবু এম. এল. এ., মানে জগাদা,—আপনাদের কাছে তার ভাষণ রাখবেন, দেখবেন শ্ল্যা যেন গণ্ডগোল পাকাবেন না—বেসামাল হলেই শ্ল্যা থাব্‌ড়া মেরে দেয়ালে জলছবি ক'রে দেব। পছন্দ না হলে এখনি ফুটে যান্—পরে শ্ল্যা দুষবেন না।"—

একটু থেমে পাশের লোকটিকে মাইকটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল,—"লিন্ জগাদা, ভাষণটা জম্পেস্ ক'রে চালিয়ে যান"—

মাইকে জগাদার ভাষণ ভেসে এল—

"দোস্ত, ভাই অউর বহিন্, আমার পেয়ারে বাচ্চে লোগ্।

হামাকে, আপনারা পয়চান্ জরুর করিয়েছেন। হামি আপনাদের জগাদা।—আপলোগ্ হামাকে এম. এল. এ. বানিয়ে ছিলেন। হামি আপ লোগ্‌কো দেখ্ ভাল ভি করেছি।

হামি সাচ্ বাত্ বলি—ঝুট্ ঝামেলায় থাকি না। হামি—এম. এল. এ. হোয়ে দোস্তদের মিনিবাসের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছি, যার যখন পারমিটের দরকার হতো ওভি করিয়ে দিয়েছি, বহুৎ দোস্তকে থানা থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। আওর এ ভি সাচ্ বাদ, পাঁচ বছর মে হাম ভি দিশি বিলাইতি রূপিয়া কামিয়ে লিয়েছি—হামার ছেলেপুলে ভাইপো, ভাতিজা সব্বাইকে লিয়ে বহুৎ কুছ্ করে লিয়েছি। এবার আপনাদের হামি জবান দিচ্ছি,—"হামকো ভোট দেনেসে এবার হাম সব কুছ্ আপলোগকো লিয়ে করেগা। (হাততালির শব্দ) হাম শুনা হ্যায়—হামারা সাথ লড়নেকে লিয়ে—ইধার—গুপে শ্ল্যা কো টিকিট মিলা—লেকিন, গুপে শ্ল্যা কো ভোট দেনেসে ক্যা হোগা—? বলিয়ে···! উস্‌কা দু'বেলা হাঁড়িভি চড়ে না—শ্ল্যার ছেলে, ভাতিজা-বোনাই, সব শ্ল্যা বেকার। এম. এল. এ. হোলে গুপে শ্ল্যা তো সব কুছ্ উস্‌কো লিয়েই কোরে লিবে, আপকো লিয়ে কুচ্‌ভি মিলবে? ভাল করে সোচুন। আমাকে ভোট দিলে আপনাদের গ্রেস ভি বাড়বে।"

একটু থেমে আবার বলে উঠল, "দোস্ত লোগ্ হামারা পেট ভি ভরা হ্যায়—রূপিয়া কা ভি কমতি নেই হ্যায়। এবার যো করেগা—আপকা লিয়েই করেগা—আর গুপে শ্ল্যার নিজেই খাঁই মেটাতেই তো···সব হাপিস্ হোয়ে যাবে। এবার আপলোক—ভাল করে সোচুন—নিজের ভাল বুঝুন—দেশের ভাল বুঝুন—(হাততালি)—নমস্কার—"

[চিৎকার উঠল জগাদা-জিন্দাবাদ, জগাদা যুগযুগ জিও, ভোট ফর্ জগাদা··· মিটিং ভেঙ্গে গেল।]

আমার দিকে তাকিয়ে সদানন্দবাবু বললেন—এই জগাখিচুড়ি ভাষার কিছু বুঝলে সৌমেন, দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে?

—সত্যি আমরাও যুবক বয়সে রাজনীতি করেছি, পুলিশ আমাদের ঠেঙাতো

বটে, কিন্তু পাব্‌লিক্ মাথায় করে রাখত। আর এখন দেখুন সদানন্দদা,—পুলিশ এদের সেলাম করে, কিন্তু পাব্‌লিক কি সম্মান করে?

বিরক্তি দেখিয়ে সদানন্দবাবু বলে উঠলেন—ঐ তোমাদের এক কথা—কেন ছোটবয়সে দুধের পুকুরের গল্প শোননি,—এক ঘটি করে জল মেশানোর ফলে দুধের পুকুরটা জলের পুকুর হয়ে গেল। ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোকেরা যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিতে যোগ দিতে শুরু করে তবে কি পরিবেশটা পাল্টাবে না—!

এদেশের ভবিষ্যৎ একবার ভেবে দেখ। আজকাল তো নিগেটিভ ভোটই ভাগ্য নির্ধারণ করছে। যাক্‌গে অনেকক্ষণ বক্ বক্ করেছি, দাঁড়াও কালিকে দু'কাপ চা আনতে বলি।

দপ্ করে আলোটা নিভে গেল! কিছু বলার আগেই দেখি কালি এসে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

সদানন্দবাবু কালিকে চা আনতে বলতেই বাধা দিয়ে বললাম,—চা এখন থাক। বলেই বেরিয়ে এলাম। অন্ধকার পথে যেতে যেতে সদানন্দবাবুর কথাগুলি মনে পড়ছিল। সদানন্দ মানুষটি দিনে দিনে কেমন নিরানন্দ হয়ে পড়ছেন দেশনেতাদের মতিগতি দেখে।

আমিও তো একটা মোমবাতি হ'তে পারতাম। জ্বলতাম, ক্ষয়ে যেতাম, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য হলেও আলো তো দিতে পারতাম।

কর্জ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহলে সুদে-মূলে একুনে তিন হাজার দু'শ তিপ্পান্ন টাকা আট আনা দু পাই, বুঝলি? মহাজন বলেছে, সাতদিনের নোটিশ, সাতদিনের মধ্যে টাকাটা শোধ দিতে না পারলে—, বাকিটা উহ্য রাখে রিধে দাস। তার দু' চোখে তখন এক জোড়া ঘুঘরো পোকার ঘুরুনি।

যাকে বলা হলো সেই বিষ্টুপদর মাথাটাও তখন ঘুরছে। টাকাটা বেড়ে বেড়ে তাহলে অনেক হয়েছে। রিধেবাবু যতটা টাকা বলল, সেটা যে ন্যায্য কতটা টাকা তা মগজে সেঁধায় না তার। সবশেষের আট আনা দু' পাইটা মনে আছে। তার মধ্যে আবার দু' পাই শব্দটা বেশ গোলমেলে। ছোটবেলায় তার বাপ বলত, কাছে পাই-পয়সাটাও নেই রে—। যে নিজে জন্মে কখনো পাই পয়সা চোখে ছাখেনি। যা দেখেছে তা হলো নয়া পয়সা। সেও আবার এখন শুধু পয়সা হয়ে গিয়েছে। পাই পয়সা কী করে শুধতে হয় তা সে জানে না। তবু ঘোলা চোখে তাকিয়ে বলল, এঁজ্ঞে, ওই আট আনা দু'পাইটা দিলে যদি এ যাত্রা রেহাই হয় তো বলেন—

শুনে রিধে দাস খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠে, ভ্যালা বলেছিস মাইরী। তোর ঘটে মেলা বুদ্ধি রে বিষ্টু, তোর জন্যি আমার বড়ো ভাবনা হয়।

কী ভাবনা হয় রিধেবাবু? বড়ো বড়ো চোখ করে বিষ্টুপদ তাকিয়ে থাকে লোকটার ঘুরন্ত চোখের দিকে। লোকটা তাকে অবরে সবরে মেলা উপকার করার চেষ্টা করে। ধারের ব্যবস্থাটা তো সে-ই করে দিয়েছিল তাকে। তিন-তিনশ টাকা। তবে নগদে নয়।

রিধে দাস বলেছিল, তার মহাজন তার নামে বেনাম করে রেখেছে দশ কাঠা জমি। সে জমি চষে খাবার লোক নেই। এখন বিষ্টুপদ যদি জমিটায় ভাগে চাষবাস করে খায়—

আকাশ থেকে পড়েছিল বিষ্টুপদ, রিধেবাবু বলে কী। তার লাঙ্গল নেই, গোরু নেই, বীজ ধান নেই, টাকা পয়সা নেই, সে আবার ভাগে চাষ করবে!

রিধে দাস চোখ মটকে বলেছিল, সে ভাবনায় তোর কাজ কী। সে ভাবনা

হলো তো আমার। মহাজন সব দেবে, তবে হ্যাঁ—ধারে। জমি চাষ করে ধান উঠলে তার থেকে শোধ দিয়ে দিলেই হবে।

গোরু-লাঙ্গল-বীজধান সব মিলিয়ে তিনশ টাকার মতো ধার। অনেক খেটেখুটে বিষ্টুপদ চাষ করেছিল রিধেবাবুর বেনাম জমিটা। কিন্তু তার এমনই কপাল, আশপাশের জমিতে ধান ভালো হলেও তার জমিতেই অজন্মা। যা দু-চার ছটাক ধান হয়েছিল, তা একদিন রিধেবাবু লোক লাগিয়ে কেটে নিল মাঠ সাফ করে। বলল, এতে আসল তো শোধ হলোই না, সুদও নয়, কেবল মহাজনের সুদের সুদটা হলো। তোর এমনই কপাল, বিষ্টু—

সেই ধারটা ধারই রয়ে গেল। তারপরও রিধেবাবু অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করেছে যাতে বিষ্টুর ধারটা শোধ হয়। ব্যাঙ্ক থেকে একটা লোন পাইয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। ভাগ্য দোষে লোনটা হলোনি। তারপর ফের সরকারী লোন। বলল, সরকারী লোন নিলে আর শোধ দিতে হয় না। এই টাকাটা পেলে মহাজনের ধারটা শোধ করে দিবি। কিন্তু সেবারও হলোনি। সে প্রতিবার কেবল একটি করে টিপ ছাপ দিয়েছে, কিন্তু লোনের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ। প্রতিবার রিধে দাস এসে দাঁত মেলিয়ে বলেছে, হলো না, বিষ্টু। ঠিক আছে, আবার দেখি—

আসলে বিষ্টুপদর বরাত এমনই সে যেদিকে তাকায়, সবই খাঁ খাঁ। সমুদ্দুরে পর্যন্ত জল থাকে না।

সাতদিনের নোটিশ দিয়ে রিধে দাস লম্বা লম্বা পা ফেলে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায় গঞ্জের দিকে। গঞ্জে তার পানের ব্যবসা আছে। পান আসে সেই মোহনপুর থেকে। তাবড়া তাবড়া পানে জল ছিটোতে ছিটোতে রিধে দাস কতবার বলেছে, লেখাপড়া জানলে তোকে আমার ব্যবসায় হিসেবের কাজে লাগিয়ে দিতাম রে, বিষ্টু।

বিষ্টুপদ হাঁ করে তাকিয়ে ভেবেছে, কেন যে বাপটো তার লেখাপড়া শেখায়নি। তাহলে তো তাকে এমন ধারের জন্য হেনস্থা হতে হতোনি।

লম্বা লম্বা পায়ে রিধে দাসের চলে যাওয়ার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। এখন তার কী যে করা—। কী করে ধারখানা শোধ করবে ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বার করে আনে হাঁসুয়াখানা। চার পাশে বোশেখ মাসের কাঠফাটা রোদ্দুর। মাঠক্ষেতে খইখই করছে শুকনো মাটি। কখনো মাঠে ক্ষেতে ধান রুয়ে ধান কেটে, কখনো বাবুদের বাগানে আগাছা পরিষ্কার করে তার দিন-মজুরী জোটে। এখনো বর্ষা পড়তে ঢের দেরি, মাঠে লাঙ্গলই পড়েনি তো ধান

রোয়ার কাজ কোথায়। তাই হাঁসুয়াটা হাতে নিয়ে বাবুদের বাগানের দিকে নজর করতে করতে হাঁটে, যদি কোথাও আগাছা-টাগাছা, কি ঘাসঘাসালি জন্মে থাকে।

শুধু আজই নয়, রিধেবাবু তাকে প্রায়ই ধারটা শোধ দেবার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। বলে, ধার ফেলে রাখা ভালো কথা নয় বাপু। কত বিপদ-আপদ হতে পারে—

সে কথা বিষ্টুপদও ভালো জানে, কিন্তু সে তো নাচার। এখন তার মাথায় এক গণ্ডা চাঁটি মারলেও একটা পাই পয়সাও বেরুবে না ট্যাঁক থেকে। তার একদিন কাজ জোটে তো দুদিন জোটে না। যা দু' পাঁচ টাকা মজুরী পায়, তাতে তার আর বৌয়ের পান্তা জোটে তো নুন ফুরিয়ে যায়। যেদিন নুন থাকে তার বৌ বলে পান্তা বাড়ন্ত।

ভাবতে ভাবতে রায়বাবুদের মস্ত বাগানখানার দিকে তার নজর যায়। প্রায় আড়াই বিঘের বাগান, তাতে নেই হেন সবজী নেই। কী নধর চেহারা সবজী-গুলোর, বাগান করার ভারী নেশা রায়বাবুর। কিন্তু সারা বাগানে কোথাও এক টুকরো ঘাস কি আগাছা কিচ্ছু নেই। সে-ই দিনকুড়ি হলো বিষ্টুপদ রায়বাবুর বাগানে আগাছা পরিষ্কার করে গেছে, তারপর কি আশ্চর্য, আগাছা আর বাড়লনি! কিন্তু লকলক করে দিব্যি বেড়ে উঠেছে ঢ্যাঁড়শের গাছগুলো। তার থেকে ঝোড়ায় করে ঢ্যাঁড়শ তুলছেন রায়বাবু।

বিষ্টুপদ সেখানে দাঁড়াতেই রায়বাবু হাঁকাড় পাড়েন, কী হল রে তোর, দাঁড়িয়ে পড়লি যে বড়।

দাঁত বার করে বিষ্টুপদ, এঁজ্ঞে দেখতিছি, কোথাও ঘাসটাস আছে কী না।

নেই, নেই, রায়বাবু একটা ঢ্যাঁড়শ তুলে হঠাৎ মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখতে থাকেন, ঘাস তো কই তেমন বাড়ে না।

তাই তো দেখতিছি। সেই কবে ঘাস-আগাছা কেটে গেছি, তখন তো ঢ্যাঁড়শের এইটুকুন-টুকুন চারা।

তাহলে যা, এখন ভাগ্, বিষ্টুপদ হাঁ করে তাঁর নধর ঢ্যাঁড়শগুলো দেখছে বলে রায়বাবু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন।

আপনের ঢ্যাঁড়শের গাছগুলো ক'দিনে কীর'ম বেড়েছে বলুন?

বাড়বে না? কীরকম সব্ সার দিয়েছি তা বলবি তো।

তাই-ই, বিষ্টুপদ গাছগুলোর আগাপাস্তলা জরীপ করে, তাইলে ঘাস-আগাছায় টুকুন টুকুন সার দিলে পারেন। এ্যাদ্দিনে লকলকিয়ে বাড়তো বেশ। বেশ একটা রোজ হয়ে যেত আমার।

রায়বাবু বিস্ময়ে ট্যাঁড়শ তুলতে ভুলে যান, বলিস কী! তোর রোজের জন্য আমি ঘাসের গোড়ায় সার দেব? ভারী বুদ্ধি তো তোর! যা, যা, এখন ভাগ, আবার বর্ষার সময় আসিস।

বিষ্টুপদ আবার রোদ্দুরে ভাজা-ভাজা হয়ে হাঁটতে থাকে। কবে যে আবার বর্ষা আসবে কে জানে! সেদিন গঞ্জের হাটে শুনে এসেছিল, বর্ষা নাকি এবারে নাবি। বর্ষা নাবি হলে ফসল রোয়াও নাবি হবে। ঘাসও বাড়বে নাবিতে। তাহলে বিষ্টুপদ এখন কী করে। ঢনঢন করে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে পড়ল, সকালে তার বউ পাতাসী বলেছিল, চাল আনতে হবে আজ। চাল নিয়ে গেলে তবে তাদের খাওয়া জুটবে।

২

আলগোছে ছিটেবেড়ার দেয়ালে হেলান দিয়ে সেই কথাই পাতাসীকে বলছিল বিষ্টুপদ, বুঝলি, রিধেবাবু বড়ো ভালো লোক। কিন্তু দেনার ব্যাপারটা কিছুতিই ঠেকান্ দিতি পারতিছে না। বলতিছে তোর জন্যি বড়ো ভাবনা হয়—

বড়ো বড়ো চোখ করে পাতাসী শুনছে, আর বিষ্টুপদ ব্যাখ্যানা করছে তার সেই ভাবনার কথা। মহাজন নাকি ভারী টেঁটিয়া। বলেছে, দেনা শোধ না করলি—। রিধেবাবুর মতো বিষ্টুপদ বাকিটা উহ্য রাখে। তারপর বলে, মাত্তর সাতদিন সময়।

তা কর্জ কতো? এই তো গেল বছর নিলে—পাতাসী যেন জেরা করছে।

কর্জ কতো? ভাবতে গিয়ে বিষ্টুপদ আকাশ-পাতাল হাতড়ায়, ঠিক ন্যায্য কতটা টাকা তার হাল-হদিশ করতে পারে না। খানিক ভেবেচিন্তে বলে, ওই যে গো, কী যেন বলল, আট আনা দু'পাই। সে মেলাই টাকা। তুমি বুঝবে না।

পাতাসী চট্ করে বলল, তা এত টাকা হলো কী করে? মোটে তো তিন'শ টাকা নিয়েছ।

কী করে হলো, তা বিষ্টুপদ জানে না, সে মাথা চুলকোয়।

পাতাসী বলে, রিধেবাবুকে জিগেশ কোরো তো, কী করে এত টাকা হলো?

বিষ্টুপদও তাই ভাবতে থাকে, কী করে এত টাকা হলো। তার বাপ বলত, একপো তুলো ধুনলে এক সের হয়। ধুনতে ধুনতে এতটুকুন তুলো সারা ঘর ভরে যায়। কখন যে তার ধারের টাকা ধুনে ধুনে ঘর ভরে গেছে, সে ঠাহর করে উঠতে পারেনি।

তা বিষ্টুপদ জিজ্ঞাসা করে রিধেবাবুকে। রিধেবাবু তার খড়ের চালের ছোট্ট

ঘরখানার দাওয়ায় উবু হয়ে বসে, আর বিড়ির ধোঁয়া ওড়ায়। আর কেবল ঘরের দিকে ফালুকফুলুক তাকায়। ভিতরে পাতাসী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আধ-হাত ঘোমটা দিয়ে। সেদিকে একবার নজর করে গলা খাঁকরি দিয়ে বলে, হবে না? টাকার যে বাচ্চা হয়।

বাচ্চা হয়? বিষ্টুপদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, বাচ্চা হয়। তোর বউ-এর বাচ্চা হয় না বলে কি আর কারো বাচ্চা হবে না? দুনিয়ায় সবাই বাচ্চা পাড়ে। বাচ্চা পাড়ে বলেই দুনিয়াটা চলছে। টাকারও বাচ্চা হয়।

বিষ্টুপদর ঘরে যে বাচ্চা নেই, তাতেও রিধেবাবুর দান কম নয়। ফেমিলি প্লেনিং করলে একশো টাকা পাওয়া যাবে বলে রিধেবাবু তাকে সঙ্গে করে হাস-পাতালের কেম্পে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তার সদ্য বিয়ে হয়েছে। রিধেবাবু বলেছিল, তুই নিজে খেতে পাসনি, বউ-এর খাবার জোটাতে পারিসনি, তোদের আর বাচ্চা নিয়ে কী হবে। ওদিকে হাসপাতালের কোটা পুরছে না। চল্ চল্। একশো টাকা থেকে আবার রিধেবাবু ভাগ নিয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। বলেছিল, এটা মহাজনের সুদ। সুদ নয়, সুদের সুদ। না দিলে মহাজন আর রক্ষে রাখছে না।

টাকার বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা রিধেবাবু আরো খোলসা করে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যে টাকা বাড়ে, সে খবর রাখিস?

বিষ্টুপদ ঘাড় নাড়ে, জানি।

একটাকা রাখলে দু'টাকা হয়, দু'টাকা রাখলে চার টাকা হয়, তা জানিস্? রিধেবাবুর চোখে তখন ঘুরন্ত পোকা, সেরকম ধারের টাকাও বেড়ে যায়। ধারের টাকার আবার গতি বেশি। আরো জোরে জোরে বাড়ে।

তারপর হঠাৎ সচকিত হয়ে রিধে দাস মুখচোখ শক্ত করে, তা কী হলো, তিন-দিন তো হয়ে গেল। টাকাটা জোগাড় করেছিস?

বিষ্টুপদ ঘাড় নাড়ে, আজ্ঞে ওই আট আনা হয়েছে।

মোটে আট আনা? রিধে দাস যেন একটা টিকটিকি দেখছে এমন মুখ করে বিষ্টুপদর দিকে তাকায়, তারপর বলে, তোর বড়ো বেপদ, বিষ্টু।

বিষ্টুপদ সভয়ে বলে, কেন, রিধেবাবু।

মহাজন সেদিন খুব তড়পে গেল। বললো, তোমার কথা শুনে লোকটারে টাকা দিলাম, রিধে—আর সে এখন দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে? ভালো হবে না কিন্তু বলে দিস—

বিষ্টুপদ এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। তার গায়ে সারাদিন একটা গেঞ্জি-ও থাকে না, কেবল একখানা আট হাতি কাপড়, তাও টুকটাক ছেঁড়া। গা ঢাকা দিয়ে বেড়ানোর কথাই ওঠে না। তবু মহাজন যখন বলেছে—।

রিধে দাস বড়ো করে বিড়ি টানে, তোর যে কী হবে বিষ্টু, ভেবে আর আমার ঘুম আসে না। তাই সেদিন রাতে তোকে নিয়ে একটা স্বপন দেখনু—

কী স্বপন, রিধেবাবু? বিষ্টুপদর বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না।

দেখনু, তোর হাত দুটো কী করে যেন দুটো পা হয়ে গিয়েছে।

তাই? বিষ্টুপদর চোখে আবার ভয় ঘনিয়ে আসে।

হ্যাঁ রে, চার পায়ে হাঁটছিস ভঁস ভঁস করে। আর গায়ে কী কালো কালো লোম।

তাহলে কী হবে, রিধেবাবু?

তাই তো ভাবি রে। সাবধানে থাকিস, টাকার জোগাড় কর, নইলে মহাজন—

মহাজনকে কখনো চোখে দ্যাখেনি বিষ্টুপদ। লোকটা যে কীরকম তা মনে মনে আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। তার নিজের গায়ে যদি কালো কালো লোম হয়, তবে কি মহাজনের গায়ে হলুদ ডোরাকাটা? ভাবতে ভাবতে ঘেমে ওঠে। ফের একটা হাঁসুয়া নিয়ে আগান-বাগান ঢুঁড়ে বেড়ায়। বোসবাবুদের বাগান, রায়বাবুদের বাগান, সতু বদ্যিদের বাগান চারদিকে নজর রেখে ঘোরে। কোথাও একগাছি আগাছাও চোখে পড়ে না তার।

৩

দু'দিন না পেরোতে আবার রিধেবাবুর লম্বা লম্বা পা, কী রে বিষ্টু,—কিছু হলো?

বিষ্টুপদ একগাল হেসে বলল, হয়েছে রিধেবাবু, ওই যে, দু' পাই—

দু' পাই? রিধে দাস বিস্মিত।

হুঁ, সেদিন ঘরের ভিতর পুরনো একটা ভাঙা ঘটের ভিতর নাড়তে-চাড়তে দেখি দুটো কুচো পয়সা। গঞ্জের হাটে দেখাতে বলল, আগের দিনের পাই পয়সা। বাপটো আমার কবে রেখেছিল ঘটে, ভুলে আর খরচ করেনি।

দাওয়ায় উবু হয়ে বসে রিধে দাস বিড়ি ধরায়, নাহ্, তোকে আর বাঁচাতে পারলাম না। বলতে বলতে ঘরের দিকে ফালুকফুলুক নজর। নজর করে বলল, সেদিন রাতে তোকে নিয়ে ফের স্বপন দেখনু—

কী স্বপন? বিষ্টুপদর চোখে বিস্ময়।

দেখনু, তোর ভিটেয় ঘুঘু পাখিদের মিটিং বসেছে, শলাপরামর্শ করছে গোল হয়ে বসে—

—সে আবার কী?

ওই যে, মহাজন সেদিন তড়পে গেল না? বিষ্টুর ভিটেয় আমি ঘুঘু চরিয়ে দেব, তাই—

বিষ্টুপদর চোখে ভয় ঘনিয়ে আসে, তাইলে কী হবে রিধেবাবু?

তাই নিয়েই তো যত ভাবনা আমার, তোর যে কী দশা হবে এরপর। আর মাত্তর দু'দিন।

বিষ্টুপদ ভয়ে-ভয়ে দরজার দিকে তাকায়, তার বউ পাতাসী আধ হাত ঘোমটা দিয়ে সব শুনছে। ঘোমটায় ঢাকা থাকায় মুখখানা দেখাও যায় না, অথচ রিধেবাবুর সেদিকে ফালুকফুলুক চাউনি।

রিধে দাস ফের চলে গেলে পাতাসী ঘোমটা সরায়, তা টাকাটা শোধ দিয়ে দাও না কেনে—

বিষ্টুপদ ঘাড় নাড়ে, এইবার দিয়ে দেব। আট আনা দু'পাই হয়েছে। আর খানিক বাকি। নইলে বাপ-পিতামোর ভিটেয় ঘুঘুরা মিটিন্ করলে ভারী বেপদ।

বলে তার হাঁসুয়াখানা বগলে নিয়ে রোদ্দুরে ঢনঢন করে ঘুরতে বেরোয়। বর্ষা আসতে এখনো কত যে দেরি! বর্ষা এলে তবে বাগানে আগাছা জন্মাবে, ঘাস বেড়ে উঠবে লকলকিয়ে। তবে না বিষ্টুপদর রোজগার বাড়বে।

বিকেলে গঞ্জের হাটে গিয়ে রিধেবাবুর পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হিসেবের খাতা না হয় না লিখল, পানের তাবড়ায় জল তো ছিটোতে পারে। একটা মগ তুলে নিয়ে জল ছেটাবার উদ্যোগ নিতেই রিধে দাস হাঁ হাঁ করে ওঠে, করিস কী করিস কী। সবাইকে দিয়ে কি আর সব কাজ হয়? তোকে দিয়ে ঘাস কাটা ছাড়া আর কিচ্ছু হবে না। যদি লেখাপড়া শিখতিস—।

বিষ্টুপদ হাঁ করে রিধেবাবুর শক্ত-পোক্ত মুখখানা দ্যাখে।

পরক্ষণেই রিধে দাস মুখখানা মোলায়েম করে, দাঁড়া দেখি। আই. আর. ডি. পি-র লোন এয়েছে। পঞ্চায়েতের মেম্বারকে বলে দেখি। লোনটা পেলে যদি তোর ধার শোধ হয়—

সে কি আর বিষ্টুপদ পাবে? তার চাউনিতে মরুভূমিতেও বালি থাকে না। এর আগেও তো রিধে দাস চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তবে পঞ্চায়েতের মেম্বারের সঙ্গে রিধেবাবুর ভারী খাতির আছে, যদি তাই—

সন্ধেয় ঘরে বসে সেই কথাই পাতাসীকে বলছিল, বুঝলি, রিধেবাবু বড়ো ভালো লোক। আমার জন্যি কত ভাবে। যদি এবারে লোনটা পেয়ে যাই—

পরদিন সকালেই আবার রিধেবাবু—খুব বেপদ রে, বিষ্টু। মহাজন নাকি প্যায়দা দিয়ে নোটিশ পাঠাচ্ছে—

রিধেবাবুর চোখে সেই ঘুঘরো পোকা। বিষ্টুপদ ঘর থেকে একখানা কাগজ বার করে আনে, এঁজ্জে ব্যাঙ্ক থেকেও কাল একখানা লুটিস এয়েছে—লোন পেলমনি, অথচ লুটিস্।

রিধে দাস আড় চোখে কাগজখানার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ওরে ব্যাঙ্কের নোটিশ আর কোর্টের নোটিশে ঢের ফারাক। কোর্টের নোটিশে রীতিমতো শীল-ছাপ্পর থাকবে, প্যায়দা এসে দিয়ে যাবে ঘরে, টিপ ছাপ নেবে—। কোর্ট বলে কথা।

কোর্টের নাম শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে যায় বিষ্টুপদ। জীবনে একবারই কোর্টের মুখোমুখি হয়েছে সে। সাক্ষী হিসেবে, তাদের গাঁয়ের লখন খুড়ো তাকে নিয়ে গিয়েছিল কোর্টে, বলেছিল, ওদের উকিলবাবু যা জিজ্ঞেস করবে, সব 'না' 'না' বলবি। সাক্ষী দেবার জন্য কড়ার হয়েছিল, দশটা টাকা। তাছাড়াও যাতায়াত গাড়ি-ভাড়া, দুপুরে হোটেলে মাছ-ভাত আর একটা খিলিপান। এ-রকম সাক্ষী গাঁয়ের আরো অনেকে ছ্যায়। কিন্তু কাঠগড়ায় উঠে কী হেনস্থা। দু'বার 'না' 'না' বলতেই ওদের উকিল তাকে এমন ধমক দিয়েছিল যে তার কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যায় আর কি। বাকি সব জেরার উত্তরে সে হ্যাঁ বলতেই লখন খুড়ো ক্ষেপে কাঁই। হোটেলে খেতে তো পায়ইনি, এমনকি কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার বাসভাড়া পর্যন্ত দিতে চাইছিল না। সে এক গেরোর দিন গেছে বটে।

এবারেও সেই কোর্টের কথা শুনে সে শঙ্কিত হয়। তবে রিধেবাবু বলল, না, সাক্ষী হিসেবে নয়, তার নোটিশ আসবে আসামী হিসেবে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কাঠগড়ায়, একটাও কথা বলতে হবে না। সে তবু বাঁচোয়া।

দাওয়ায় উবু হয়ে বসে ততক্ষণে একটা বিড়ি ধরিয়েছে রিধে দাস। পিছনে দরজার কাছে আধহাত ঘোমটা টেনে পাতাসী দাঁড়িয়ে। সেদিকে একবার আড় চোখে নজর করে রিধেবাবু বললেন, কোর্টের হুকুম এখন কী হয় কে জানে।

কী হুকুম হবে, রিধেবাবু,—বিষ্টুরও একটা বিড়ি খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সে তার ইচ্ছেটা দমন করে।

কত কিছুই হতে পারে। জেল হতে পারে, জরিমানা হতে পারে, স্থাবর

অস্থাবর সব সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যেতে পারে, রিধেবাবু ঘনঘন টান দিচ্ছে বিড়িতে, আর তার নজর ঘুরছে।

পাতাসীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না বিষ্টুপদ, কিন্তু বুঝতে পারছে সেখানেও ভয় জমতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, তাইলে কী হবে, রিধেবাবু?

রিধে দাস দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। অত বড়ো শরীর, ছিটেবেড়ার দেয়াল ভেঙে না পড়ে! বেশ জুতজাত করে বসে বলল, কি জানি কী হবে! আমি দেখি, যদি ঠেকান দেয়া যায়।

বিষ্টু স্বস্তি-স্বস্তি চোখে তাকায়।

বুঝলি বিষ্টু, কাল রাতে ছাদে শুয়েছিনু। হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস দেখনু।

কী দ্যাখলেন, রিধেবাবু?

দ্যাখলাম, আকাশময় তারা, তার থেকে দুটো তারা হঠাৎ টুপ্ করে খসে পড়ল। কী সোন্দর যে তারা দুটো—

কুথায় খসে পড়ল, রিধেবাবু?

সেটা তো আর তখন দেখতে পেলমনি। কিন্তু রাতে একটা স্বপন দেখনু। সেইটেই তো রগড়।

বিষ্টু আশ্চর্য হয়, কী স্বপন দ্যাখলেন?

দ্যাখলাম, তারা দুটো খসতে খসতে একেবারে তোর ঘরের উঠোনে।

বিষ্টু হাঁ করে তাকায়, কই, কুথায়?

সেইটেই তো রগড়। দ্যাখলাম, তারা দুটো টুপ করে সেঁধিয়ে গেল তোর ঘরের ভেতর। তারপর পষ্ট দেখনু, সে দু'খান লুকাই পড়ল তোর বৌয়ের দু'খান চোখের ভেতর।

বিষ্টু বোবা হয়ে যায় সেকথা শুনতে শুনতে, পিছনে দাঁড়ানো পাতাসীর দিকে তাকায়। পাতাসীর মুখের উপর থেকে তখন ঘোমটা খসে গিয়েছে, সে বড়ো বড়ো দুটি উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে রিধে দাসের দিকে। মুখখানা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, শরীরখানা যেন কাঁপছে থরথর করে।

রিধে দাস সেই রক্তিম মুখের দিকে, দুটো জলজলে চোখের দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। শুধু তাকিয়ে নেই, গিলছে মনে হয়।

সম্বিত ফিরতে পাতাসী টুক করে সেঁধিয়ে গেল ঘরের ভিতর, আর বিষ্টু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞাসা করে, দেখতি প্যালেন, রিধেবাবু?

রিধে দাসকেও যেন বোবায় ধরেছে, বলল, দ্যাখলাম রে। সেই তারা দুটো। নিয্যাস্। কী সোন্দর!

রিধে দাস চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও বিষ্টু সম্বিত-বিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পায়ে পায়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। ঢুকে দ্যাখে, একটা ছোট্ট আয়নায় পাতাসী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মুখখানা দেখছে। মুখ নয়, চোখ দুটো। বিষ্টুও হাঁ করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে! তখনো হাঁপাচ্ছে পাতাসী, শরীরখানায় আন্‌ক লতার মতো কাঁপুনি ধরেছে মনে হয়।

পাতাসী ফিসফিস করে বলল, সত্যি?

বিষ্টু কিছু বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, রিধেবাবু যখন স্বপন দেখেছে—

৪

সকালে আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখতেই মনটা তা-থৈ তা-থৈ করে উঠেছিল বিষ্টুপদর। হাতে হাঁসুয়াখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে, মেঘের বহর দেখে ঘাসগুলো লকলকিয়ে বেড়ে উঠল কিনা তা পরখ করতে। কিন্তু ঘাসগুলো ভারী বজ্জাত, একইরকম ভাবে দরকচা মেরে পড়ে আছে।

ঘরে ফিরতেই কিন্তু আরেক অবাক করা দৃশ্য। দ্যাখে কি, রিধেবাবু বেশ জুত হয়ে তার ঘরের দাওয়ায় বসে, আর তার একটু দূরে মাথায় ঘোমটা খুলে পাতাসী। পাতাসীর মুখখানা বেশ হাসি-হাসি। আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গল্প করছে রিধেবাবু। বিষ্টুপদকে দেখেই বলল, তোর সঙ্গে ভারী পরামর্শ আছে, তাই সকাল-সকাল এসে পড়লাম।

কী পরামর্শ, রিধেবাবু? হাঁসুয়াখানা ঘরের বাতায় গুঁজে রাখে বিষ্টুপদ।

মহাজন নাকি কোর্টের রায় পেয়ে গেছে। শিগগির প্যায়দা কাগজ নিয়ে আসছে।

বিষ্টুপদর মুখখানা শুকিয়ে যায়, সে কাঠগড়ায় দাঁড়াল না, উকিলবাবুর ধমক হলো না, অমনি-অমনি রায় হয়ে গেল! কী গেরো রে বাবা। বলল, কী রায় হলো, এঁজ্ঞে।

সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। জেল-জরিমানা হলে তো বিপদ। আর স্থাবর-অস্থাবর হলে—। দ্যাখা যাক্, কী করা যায়। আমি যখন আছি—, বলতে বলতে হঠাৎ পাতাসীর দিকে তাকায়, গলার স্বর বদলে ফেলে বলল, তোর বউখানা কিন্তু খুব সোন্দর, বিষ্টু।

বিষ্টু মুখখানা হাসি-হাসি করে, তাই নাকি, রিধেবাবু, সে আমার ভাগ্যি। কোনটা ভালো, রিধেবাবু, ওর চোখদুটো?

হুঁ, নিয্যাস সেই তারা দুটো খসে এসে পড়েছে তোর বউয়ের চোখে। কী সোন্দর চোখদুটো—

শুনতে শুনতে পাতাসীর মুখ খুশিতে জমজম করে ওঠে, আর তেমনি জলজল করতে থাকে চোখের তারা দুটো, বিষ্টু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

বিষ্টু ঘরে ছিল না, এমন আরো দু'দিন নাকি রিধেবাবু ঘুরে গেছে তার বাড়িতে। বিষ্টুকে না পেয়ে পাতাসীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে গেছে। কোর্টের কাগজ নাকি এসে পৌঁছুল ব'লে। প্যায়দা ভিটেয় এসে কী না কী করে বসে, তাই নিয়ে রিধেবাবুর ভাবনা। বারবার পাতাসীকে বলে গেছে, বিষ্টুপদ যদি আর্ধেকটা টাকাও শোধ করে দিত—

দু'দিনই বিষ্টু ঘরে ফিরতেই পাতাসী বলেছে, কেন যে কর্জ শোধ করনি তখন। নইলে এমন হেনস্থা হতে হয়! কবে যে প্যায়দা এসে পড়ে কে জানে।

বিষ্টু বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকে পাতাসীর চোখের দিকে। চোখদুটোয় মিটমিট করে তারা জলছে। কর্জের ব্যাপারটা নিয়ে পাতাসী ভারী ভাবনায় পড়েছে।

সেদিন ঘুম থেকে উঠে কাজের ধান্দায় যাবার যোগাড়-যন্তর করছে বিষ্টুপদ, হঠাৎ বাইরে শোনে লম্বা লম্বা পা ফেলে আসার শব্দ। দাওয়ায় বেরিয়ে দেখল, রিধেবাবু। তার হাতে একটা কাগজ, সেটা দেখিয়ে বলল, সর্বনাশ হয়েছে বিষ্টু। কোর্টের রায় বেরিয়েছে। প্যায়দা এসে পৌঁছুল বলে—

বিষ্টুপদ ভয়-ভয় চোখে বলে, কী রায় হলো?

তোর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি ক্রোক হয়ে যাওয়ার রায় হয়েছে।

বিষ্টুপদ অবাক হয়ে তাকায়, তার আবার সম্পত্তি! এই তো এককাঠা জমির উপর ছিটেবেড়ার দেয়াল, খড়ের চাল। তাও বর্ষার আগে খড় না দিলে জলের ঢল বয়ে যাবে ঘরে।

রিধেবাবুর চোখে তখন ঘুঘরো ঘুরছে, বলল, এটা হলো তো স্থাবর সম্পত্তি। স্থাবর-অস্থাবর সবই যে ক্রোক—

বিষ্টুপদ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, অস্থাবর?

হুঁ, ওই যে তোর বৌটা, চোখদুটো ভীষণ সোন্দর যে ওর, মহাজনের ভারী নজর পড়েছে ওর দিকে। ওইটেই তো অস্থাবর সম্পত্তি। প্যায়দাকে বলে দিয়েছে

মহাজন, বিষ্টুপদর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়ে আসবি।

তাইলে কী হবে, রিধেবাবু?

সেইটেই তো ভাবনার কথা। তা আমি একটা উপায় বার করিছি। তোর বৌটারে আমি ক'দিন লুকিয়ে রাখি। কেউ তার হদিশ পাবে না। তোর নামে আই. আর. ডি. পি-র লোনটা হয়ে গেলেই মহাজনের টাকাটা শোধ করে দিতে পারবি। তখন আর মহাজনের সাধ্যি নেই তোর বৌটারে ক্রোক করে নিয়ে যায়।

বলেই ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে তাড়া দ্যায় রিধেবাবু, নাও, নাও বৌ, তাড়াতাড়ি কর। দেরি হলে আবার প্যায়দা এসে পড়বে।

বিষ্টুপদ দ্যাখে, রিধেবাবুর চোখে একটা লাটিম ঘুরছে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল বিষ্টুপদ, তার আগেই রিধে দাস লম্বা লম্বা পায়ে রওনা দ্যায় গঞ্জের পথে। আর তারপরই সে বিস্ফারিত চোখে দ্যাখে, তার বে করা বৌ পাতাসী মস্ত এক ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল দাওয়ায়। দাওয়া থেকে নামল উঠোনে, তারপর হনহন করে রওনা দিল লম্বা পায়ের পিছু-পিছু।

সে দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ দুটো জলে উঠল বিষ্টুর, সে এতক্ষণে বুঝতে পারল, রিধেবাবু একট শয়তান, পাক্কা শয়তান। বুঝেই ডাকল, পাতাসী, পাতাসী-বৌ, ফিরে আয়। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে, অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে।

'ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা' : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সমীর সেনগুপ্ত

স্বাদেশিকতা ব্যাপারটা বোঝবার আগে স্বদেশের সংজ্ঞা স্থির করে নেয়া প্রয়োজন, আর সেখানে এসেই আমরা আটকে যাই। বুঝতে পারি মানচিত্রে যাকে আমার স্বদেশ বলে দেখান হয়েছে তা নিতান্তই একটি রাজনৈতিক ধারণামাত্র, তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্বদেশের কোনো যোগাযোগ নেই। মানচিত্র স্থির হয় লিপ্সু রাজনীতিক ও ক্রুর ব্যবসায়ীর গোপন আঁতাতে, যার ফলে মানচিত্রে আমার স্বদেশের মুখ বারবার বদলে বদলে যায়। তাই প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করে নিতে হয় তার নিজস্ব শেকড়, তার ব্যক্তিগত স্বদেশ। এই ব্যক্তিগত স্বদেশের দিকে এই গোপন ও নিঃসঙ্গ যাত্রায় আমরা কবির সঙ্গী এই কবিতায়।

গোপন, কেননা ঘোষিত স্বদেশে সন্দেহের কণামাত্র প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর বর্ষিত হবে বিকট বিরোধিতার প্রবল আর্টিলারি। গোপন, কেননা যা কিছু ব্যক্তিগত তাই গোপন। যা কিছু আমার কাছে পবিত্র ও মূল্যবান তাকেই আমি সসংকোচে সরিয়ে রাখি লোকচক্ষু থেকে, মীডিয়ার প্রবল হুহুংকার থেকে, জনগণেশের স্থূলহস্তাবলেপের আওতা থেকে। গোপন, কেননা স্বাদেশিকতা বিষয়ে কারো ধারণা কারো সঙ্গে মেলে না—প্রত্যেক পুরুষের যেমন নিজস্ব প্রেমিকা, তেমনি প্রত্যেক মানুষেরই আছে আলাদা স্বদেশ। চিৎকার বলাৎকার রক্তপাত দ্বেষ হিংসার মৃতস্তূপ পার হয়ে-হয়ে তার সন্ধানে নিঃসঙ্গ যাত্রা আমাদের—যুধিষ্ঠির যেমন গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের ক্লেদ-রক্ত পায়ে-পায়ে অতিক্রম করে নির্জন ও ব্যক্তিগত স্বর্গের পথে।

শক্তির কবিতার মূল ধারায় আমরা সাধারণত কোনো গদ্যের লজিক পাই না কোথাও। পঙ্‌ক্তিগুলি কেন একটির পর আরেকটি আসছে তা আমাদের গদ্যপ্রবণ মনে কখনোই স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়ে না, যদিও ন্যায়শাস্ত্রের অব্যয়গুলির—তবু-কিন্তু-যদি-অথচ-বরং—প্রতি শক্তির ঝোঁক একটু বেশিই, বড়ো বেশিবার ফিরে-ফিরে আসে। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে কিন্তু বেশ সহজবোধ্য গদ্যন্যায় পাওয়া যায়। আমরা জানতে পারি, হৃদয় থেকে ক্রমে ঝরে গেছে যা-কিছু প্রিয় ও মূল্যবান। বিবেকবান

হৃদয়গুলি সব মানুষের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে গেছে—'গোলাভরা তেমন হৃদয়গুলি আজ মানুষের থেকে অরণ্যে বাসের দিকে চলে গেছে।'

'হে অনবরত তবু নিমন্ত্রণ আছে মানুষের।' নিমন্ত্রণ আছে প্রেমের দিকে, প্রকৃতির দিকে, স্নেহের দিকে। ঘুড়ির ছবিটি দ্বিতীয়বার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের একটি দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়, হয়ে ওঠে বিবেক, আশা, ভালবাসার প্রতীক। কিন্তু তার পাশাপাশি আরেকটি উড্ডীন বস্তুও এবার দেখা দেয়—বোমারু বিমান, ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নখ, অকরুণ ও নির্বিবেক। ক্রমে প্রতীয়মান হয় ঈগলের নখর থেকে ঝুলে আছে সিন্ধবাদ নাবিক, দেশহীন ঠিকানাবিহীন। পলকে বুঝতে পারি, অতি ক্রূর ওই ঈগলের নখ থেকে ঝুলে থাকা নিরালম্ব সিন্ধবাদ আসলে কবি স্বয়ং—অথবা আমাদের, আধুনিক মানুষের প্রতিষ্ঠানহীন বিবেক। তার পরেই যখন পড়ি, 'বরং স্বদেশ, তোমার মৃত্যুও নাই, তুমি অনশ্বর, শুধু হাত ফেরতা হতে পারো—' আমাদের মনে পড়ে যায় আমাদের জীবৎকালেই কতবার আমাদের স্বদেশের মানচিত্রের পরিবর্তন হলো, বিদেশে প্রকাশিত ভারতের মানচিত্রের নিচে এখনো লেখা থাকে boundaries shown are neither correct nor authentic, স্বদেশের কত অংশ বিদেশ হয়ে গেল, আবার বিদেশকেও স্বদেশ বলে মানতে হলো কখনো—তখন এই অনিবার্য প্রশ্ন মনে না-উঠেই পারে না, যে স্বদেশ তবে কাকে বলব? স্বদেশ বলে কি সত্যি কিছু আছে কোথাও, নাকি মানুষের তৈরি অসংখ্য ভুল স্বর্গের মধ্যে স্বদেশের ধারণাও একটি? প্রথমেই জেনেছি আমরা 'এ হৃদয় চোর নয়, বালুচরে কাঁকড়ার মতন নয় দ্রুতগামী'—এত দ্রুত পরিবর্তন মেনে নিতে গেলে আর কী উপায়ান্তর থাকে ভাবের ঘরে চুরি করা ছাড়া, অথবা পেশাদার রাজনীতিকের নির্ঘোষিত অনৃতনাদে অগত্যা বিশ্বাস করা ব্যতীত?

কবিতার দ্বিতীয় অংশে এই প্রশ্নটির গভীরতর স্তরে প্রবেশ করি আমরা—কবির সঙ্গে স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করি এক দীর্ঘ ও ঘোরান পার্গেটরির মধ্য দিয়ে। 'তোমারে দেখিতে আমি নদীতীরে কান পেতে থাকা বালুকায় হেঁটে হেঁটে অনেক অনেক দূর চলে গেছি।' একটি অদ্ভুত উৎপ্রেক্ষা আসে তারপর—গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর গাছবাসী পিঁপড়ের সারি স্তম্ভিত হয়ে আছে—'তাদের ক্রন্দন থেকে পৃথিবীর গভীর গভীরতর বিপদের সূচনার সূত্রগুলি পাওয়া যায়।' বৃক্ষ নেই—তার কর্তিত গুঁড়ির উপর বৃক্ষবাসীরা শোকরত। স্বদেশ থেকে উৎখাত, স্বদেশসন্ধানী মানুষের এই যাত্রা পিছন দিকে, চিরকালের স্বদেশের সন্ধানে। যে-স্বদেশ কোনো মানচিত্রে নেই, শুধু মানুষের স্বপ্নে আছে। কবিতাটি বারংবার পড়ে-পড়ে ক্রমে

তার নাম—'ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা'—তার সমস্ত অনির্বচনীয় দ্যোতনা নিয়ে পাঠকের মনের মধ্যে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে। স্বাদেশিকতা—অর্থাৎ স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের সামগ্রিক ভাবনাকে নিজের মধ্যে আত্মীকরণ করে নেবার প্রয়াস, নিতান্তই যে নিজস্ব, নিজস্ব প্রেমের মতো গোপন ও ব্যক্তিগত আবেগ, তা ময়দানে গর্জমান মাইকের তলায় যৌথভাবে দাঁড়িয়ে অনুভব করবার নয়। তাকে পেতে হয় একাকী—তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় নির্জন নদীতীরে, বটের শিকড়ে মুখ রাখতে হয়, অজ্ঞানের মাটির ভিতরে শুয়ে বুঝে নিতে হয় লালা ও জ্যোৎস্নায় মাখা চাঁদকে, অসহায় উলঙ্গ অনাথ তরল শিশুর মতো। খুঁজে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল কিনা কবি তা বলে দেননি, কোনো কবি তা বলেনও না। কবি কেবল নিঃশব্দ তর্জনী তুলে পথ নির্দেশ করে দেন, সমস্ত মানুষের বিবেকের ভার নিজের পিঠে বহন করে চলেন যিশুখৃষ্টের মতো। তিনি জানেন, বারাব্বাসেরা পথের বাঁকে-বাঁকে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

ব্যক্তিগত স্বাদেশিকতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

হৃদয় স্মরণাতীত কাল থেকে জানে এ-হৃদয় চোর নয় বালুচরে কাঁকড়ার
মতন নয় দ্রুতগামী
ধূর্ত বা ঝড়ের আনন্দে নয় দিশাহারা মেধাবী প্যাঁচার মতন কখনো
নয় এ হৃদয়
এ-হৃদয় থেকে উড়ে উড়ে গেছে ঘুড়ি অন্ধকার মাঠের ওধারে ভীতভাবে
এ-হৃদয় থেকে গেছে সব বি. এন. আর ট্রেন ভালোবাসা সম্বলপুরের
এ-হৃদয় থেকে গেছে মদ্যপান জিহ্বায় বিহ্বল গল্প,
পানসিগারেটজর্দাবেশ্যাদের নির্লিপ্ত চুম্বন
এ-হৃদয় থেকে গেছে ছেলেদের মুখের মতন নির্মলতা, অভিষেক যৌবনের হায়!
হৃদয় বলিয়া যাহা আছে তারে দোকানের ছাতা একাকী ঢাকিতে পারে
হৃদয় বলিয়া যাহা আছে তারে একাকী কাটলেট ওজনে হারাতে পারে
গোলাভরা তেমন হৃদয়গুলি আজ মানুষের থেকে অরণ্যে বাসের দিকে চলে গেছে
এখন হৃদয় বলে ধরা হয় স্তনের ওজন

পুরুষের স্তন নাই, স্তনের ওজনও নাই ঠিক, তাদের হৃদয়ও নাই বিধিমত।
পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা অথচ আসিতেছে—ট্রামে, বাসে,
এরোপ্লেনে, ট্রেনে, হেঁটে, চিঠিপত্রে মোহে

হে অনবরত তবু নিমন্ত্রণ আছে মানুষের
মানুষের বড় কাছে সমস্ত অনাথ সমসাময়িক মানুষেরা অনেক আশায়
ধীরে ধীরে আসিতেছে—মানুষ কি মেয়েমানুষ চায়?
আজ সেই বালকেরে চুম্বনের দিন হয়ে এলো
অন্ধকার হয়ে এলো
ঘুড়িগুলি উড়ে উড়ে যোগ্যতর অন্ধকারে দূরে যেতে চায়
পৃথিবীর পুরাতন জানলায় কতমুখ দ্রুত ট্রেনের ছবির মতন আবেশমাখা হতে থাকে
স্মৃতিগুলি কবেকার ২য় মহাযুদ্ধের বিমানের ক্রন্দনের মাঝে যায় ঝরে
রঙের যোগ্যতা আমি অন্ধকারে বহুবার বহুবিধ করে বক্তৃতায় কবিতায়
ছবি এঁকে বোঝাতে চেয়েছি
আমার মায়ের কোলে বসে-দেখা সিনেমায় বোমারু বিমান এল কেঁদে
যায় ঈগলের মতো
ঈগলের নখে-বাঁধা সিন্ধুবাদ নাবিকের দেশ আমি দেখেছি তোমাতে
হৃদয় তোমাতে নয়, হে বালক তোমাতেও নয়,
ঈগলের অতিক্রূর পাখার ভিতরে আমি দেখেছি স্বদেশ—আমিও তো মরে যাবো!
বরং স্বদেশ, তোমার মৃত্যুও নাই, তুমি অনশ্বর, শুধু হাত-ফিরি হতে পারো,
ভাষার বদল হয়ে যেতে পারে, কোনোদিন মারা তো যাবেনা
মানুষের মতো দুঃখ দিতে আর পারেনা কেহই—
নিষ্ঠুরতা জানে বটে মানুষই, তাই যুদ্ধ করে। বাঘে আর কত মারে মানুষেরে,
যতো মরে বাঘ!

মানুষই মানুষে মেরে শেষ করে দিয়ে যায়, হাল্কা করে দিয়ে যায়
পৃথিবীকে, অনেক পিছনে ফেলে দিয়ে যায় হায়
যুদ্ধ না ঘটিত যদি সৃষ্টি থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের, তাহলে স্বর্গের চেয়ে
সত্য উচ্চতর

কোনো দেশে আমরা নিতাম স্থান
মৃত্যু তো স্বর্গেই হতো, পৃথিবীতে নয়
পৃথিবীই পরিচালনা করত স্বর্গের দেবতাকে।

আজ বিংশ শতাব্দীতে ভেবেছিলাম, যুদ্ধ দেখবো না—মানুষ মানুষে খায়
দেখবো না—স্বর্গেরে নামাবো
পৃথিবীর অনেক গভীরে নীচে পরাজয়ে তারে স্থান দেবো
মানুষের ভালোবাসাপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্ল্যাটিনাম
সহৃদয় শিক্ষাহীন কবিরে কবির রাজা গ্যেটে
কবিসভা পার্লামেণ্ট, শিল্পী ও ভাস্কর সভ্যতার—
শান্তি দাও, শান্তি দাও, মানুষের হৃদয় ফিরিয়ে দিয়ে যাও,
হৃদয় স্মরণাতীত কাল থেকে জানে এ হৃদয় চোর নয় বালুচরে
কাঁকড়ার মতন নয় দ্রুতগামী।

২

তোমারে দেখিতে আমি নদীতীরে কান পেতে থাকা বালুকায়
হেঁটে হেঁটে অনেক অনেক দূর চলে গেছি
তোমারে দেখিতে আমি বটের শিকড়ে স্থূল স্বাস্থ্যবান মাটির
উপরে শুয়ে দেখিয়াছি
অঘ্রানের মাটির ভিতর হতে ভেসে আসে চাঁদ লালা ও জ্যোৎস্নায়
মাথা অসহায় উলঙ্গ অনাথ তরল শিশুর মতো।
ভালোবাসো? গাছের কাটার 'পরে স্তম্ভিত পিঁপড়ের সারি
গাছের জীবন নাই দেখে
ওদের ক্রন্দন থেকে পৃথিবীর গভীর গভীরতর বিপদের সূচনার
সূত্রগুলি কত আর্তনাদ করে টের পাওয়া যায়—
ভালোবাসো? ওদের মতন তুমি ভালোবাসো কিনা পৃথিবীর সকল মানুষে আজ,
কিশলয়ে?
ওদের ক্রন্দন থেকে ভেসে আসে ভাষাময় বিপদের আগুনের ধোঁয়াগুলি
ওদের ক্রন্দন থেকে টের পাওয়া যায় মানুষের ঝলসানো গন্ধগুলি,
বারুদ-পীড়িত
ওদের ক্রন্দন থেকে ভেসে আসে মোরগের আকণ্ঠ বিহ্বল গান ভোরবেলা
ওদের ক্রন্দন তাই ছেলেখেলা নয়
ওদের ক্রন্দন থেকে লালরঙ ছড়ায় আকাশে, পশ্চিমে ডিমের সাথে
মানুষের সৌভাগ্য ক্রমশ আঁধারে বিলীন হয়, চেনো নাকি?

এরকমভাবে সব কুমারী হইতে কুমারেরা পলায় বাসনা হতে ছাড়া পেয়ে
এরকমভাবে সব বিধবার-ই ভাগ্যলিপি লেখা হতে থাকে
অবলা চোখের জলে মনোমত
এরকম নৈঃশব্দ্যের তুলনা কোথাও হয় নাক'।

তোমারে দেখিতে আমি নদীতীরে কানপেতে থাকা বালুকায়
হেঁটে হেঁটে অনেক অনেকদূর চলে গেছি আজ!

একালের দ্রোণাচার্য

দীপঙ্কর দাস

—বেসিক্যালি আমরা সবাই একটা জায়গায় ভুল করছি। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন অরুণাংশু। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আসলে আমরা সবাই বোধহয় ধরে নিয়েছিলাম ওরা ঠিক আমাদের মতোই হবে, মানে ঐ আমরা যাকে লিবারাল, র‍্যাশানাল বলি আর কি! আর তাই বোধহয় আমাদের মধ্যে এতখানি হতাশা জেগেছে।

—কিন্তু অরুণাংশুদা ওদের মনভাব দেখলেন তো! আমাদের একটা কথাও শুনতে চাইল না। গ্রামের ভেতর ঢুকতেই দিল না। এত নন-কো-অপারেটিভ হলে আমরা কাজ করব কি করে? ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় জবাব দিল অশোক।

—তোমার কথা আমি মানছি অশোক। কিন্তু আর একটা দিক-ও তো দেখতে হবে। ওদের মধ্যে এতখানি অবিশ্বাস, আমাদের প্রতি এতখানি সন্দেহ আর ঘৃণা জন্মানোর পেছনে একটা বাস্তব প্রেক্ষিত আছে।···অনেকক্ষণ পা ভেঙে বসে থাকার জন্যই হয়তো দেবাশিসের ডান পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছিল। সে ডান পা-টা টান করে মেলে দিয়ে আবার বলল, দিনের পর দিন ওদের ক্যাপিটাল করে আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তো কম কিছু করে খাইনি। ওদের দুর্দশার সংবাদ ছাপিয়ে সাংবাদিকরা বিখ্যাত হয়েছেন। ওদের নিয়ে কল্পিত উত্তেজক কাহিনী লিখে কত লেখক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কেউ কেউ আবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-টুরস্কারও হাতিয়ে নিয়েছেন। অথচ ওরা কিন্তু এক শতাব্দী আগেও যে বিন্দুতে দাঁড়িয়েছিল, আজও সেখান থেকে একচুলও এগোয়নি। বরং পিছিয়ে গেছে আরো কিছুটা।···তাই আমাদের প্রতি ওদের মনে সন্দেহের বিষ জেগে উঠতেই পারে।

আমিও তো তোমাদের সে-কথাই বলতে চাইছি। আমাদের যে করেই হোক ওদের মনে বিশ্বাস জাগাতে হবে। আমরা, সত্যি সত্যি ওদের কিছু হোক,—মানে উন্নয়ন-টুন্নয়ন আর কি,—এমন একটা মিশন নিয়েই এসেছি। তাহলেই দেখবে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।···অরুণাংশু সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন।

—যা অভিজ্ঞতা হলো এ-ক'দিনে, এরপর তো আর মনে হচ্ছে না এ-জীবনে

ও-কাজটা আমরা পেরে উঠব। আমার তো মনে হচ্ছে এখান থেকে একেবারে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হবে।···অশোক শব্দ করে শ্বাস ছাড়ল।

একটু তফাতে বালির ওপর এতোক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিল নিরুপম। নিঃশব্দে বলা ঠিক হবে না, সে মনযোগী হয়েছিল সঙ্গের 'ডিপ্‌লোম্যাটে'র ছোট বোতলটার অবশিষ্টাংশটুকুর সদব্যবহারে। বোতলটা নিঃশেষ হওয়ায় সে চোখ ফেরাল নদীর দিকে। সামনে সুবর্ণরেখা। সময় এখন অভ্রানের শেষ। ফলত নদীর বুকে জলস্রোত একরকম অন্তর্হিত। চোখ মেলে তাকালে নদীর বুকে ঠা-ঠা বালির বিস্তার ভিন্ন আর কিছু চোখে পড়ে না। নিরুপম ডিপ্‌লোম্যাটের সদ্য শূন্য হওয়া বোতলটাকে নদীর দিকে ছুঁড়ে দিল। কোনো নুড়ি পাথরে ধাক্কা খেল বোধহয় বোতলটা। ঠুং করে একটা শব্দ গড়িয়ে এলো এদিকে।

আর ঠিক তখনই নিরুপম উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের পেছনে লেগে থাকা বালি ঝাড়তে-ঝাড়তে বলে উঠল, বেশ বলেছো ভাই দেবাশিস। আই অ্যাকনলেজ ইওর কমেণ্টস উইথ ডিউ কম্‌প্লিমেণ্টস। কিন্তু ভায়া কেবল সাংবাদিক আর লেখকদের এক হাত নিলেই কি তোমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে?···তাছাড়া যে-সব সাংবাদিক ওদের দুঃখ-দারিদ্রের খবর ছেপে টু-পাইস কামিয়ে নিচ্ছেন, কিংবা যেসব লেখকরা ওদের ক্যাপিটাল করে আদিবাসী দরদী লেখকের সম্মান কুড়োচ্ছেন,—ওদের এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পেছনে কি কেবল তাদেরই ভূমিকা আছে? তোমাদের মতো সংস্থাগুলোই বা কি করছে ওদের নিয়ে? ফিল্ড-সার্ভের নামে এইসব সুন্দর জায়গায় আসছ, ক'দিন আউটিডের স্বাদ ভক্ষণ করছ, কিছু আদিবাসী গ্রাম-ট্রাম ঘুরে দেখছ, মহিলাদের ছবিটবি তুলে শহরে ফিরে গিয়ে পেটমোটা রিপোর্ট বানাচ্ছ। সরকারের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার স্কিম থেকে মোটা টাকার গ্র্যাণ্ট আদায় করছ। তারপর সেই রিপোর্ট নিয়ে আজ কলকাতায়, কাল দিল্লিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে সেমিনার, কনভেনশন অ্যাটেণ্ড করছ। তারপর আবার একটা মোটা টাকার গ্র্যাণ্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়ছ আরো একটা রিপোর্ট বানাবার কাজে।···এইসব কিছুই নিশ্চয় আদিবাসী সমাজ জীবনে মস্তবড়ো রূপান্তর ডেকে আনছে, তাই না?

—কিন্তু এরজন্য আমাদের দায়িত্ব কতটুকু? আমরা তো ওদের ওপর সঠিক সার্ভে করেই রিপোর্ট দিচ্ছি। এখন সরকার যদি সেই রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে সঠিক প্ল্যান-প্রোগ্রাম না করেন, তার জন্য দায়িত্ব তো আমাদের নয়।···আর মোটা টাকার গ্র্যাণ্ট-এর কথা বলছেন,—আমরা যা পাচ্ছি, তা আমাদের হার্ড ওয়ার্ক-এর

বিনিময়েই পাচ্ছি। গালগল্প লিখে পাবলিক ঠকিয়ে আদায় করছি না।···দেবাশিসের কণ্ঠস্বর বেশ উত্তেজিত শোনাল।

আলোচনা সংঘর্ষের দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে অরুণাংশু হাত বাড়িয়ে ওদের কথা থামিয়ে দিলেন।—তুই থাম নিরুপম। তুই তোর রাস্তায় হাঁট, আমরা আমাদের রাস্তায় হাঁটি। বলে অরুণাংশু দেবাশিসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, এখন কি আমাদের মাথা গরম করার সময় দেবাশিস! সামনে এত বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ—যার সঙ্গে তোমার আমার ভাত-কাপড়ের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে,—কোথায় ঠাণ্ডা মাথায় একটা সমাধান খুঁজে বের করব না, মাথা গরম করে তর্কাতর্কি জুড়ে দিলে!

—আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম এই অ্যাসাইনমেণ্টটা না নিতে।···অশোক কাঁধ বাঁকিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বলল।

অশোকের কথায় ওরা কেউ সাড়া দিল না।

দিনের আলো মরে আসছে। শেষ অভ্রানের বেলা বড়ো ছোট। বিকেল বলে কিছু থাকে না। গাছ-গাছালির মাথা থেকে দিনের রোদ সরে যাওয়া মাত্র বিনবিনে আঁধার নেমে এসে ঢেকে দেবে নদীর চরা, পাহাড়-শীর্ষ, উপত্যকার ঢাল। সেই সঙ্গে তীব্র হবে হাড়ে সুঁচ বেঁধানো বাতাসের গতি।···তবু নদীর পার ছেড়ে ওঠার মতো উৎসাহ পাচ্ছিল না ওরা কেউ।

কিছুটা দূরে এক বোল্ডারের ওপর নদীর দিকে মুখ করে বসেছিল অঞ্জলি। ও যেন ওদের—মানে অশোক দেবাশিস অরুণাংশু কিংবা নিরুপমদের কোনো কথার মধ্যেই নেই—এমন এক বিচ্ছিন্ন উদাসীনতা ঘিরে রেখেছিল অঞ্জলিকে। অঞ্জলির পরনে আজ ঘন সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি। পাড় এবং আঁচলে হালকা জড়ির কাজ। গায়ে সবুজ রঙের শাল। বাতাসের গতি বেড়ে ওঠায় অঞ্জলি গায়ের শালটা ভালো করে বুকে পিঠে জড়িয়ে নিল।

নদীর মাঝবুক চিরে-চিরে ক্ষীণ এক জলস্রোত বয়ে চলেছে। অঞ্জলি দেখছিল সেই জলস্রোতের কিনারে জনাকয়েক আদিবাসী বৃদ্ধ চালুনি হাতে চরার বালি ছেঁকে চলেছে। ছাঁকাবালির স্তূপের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে তন্ময় হয়ে কি যেন খুঁজছে মাঝে মধ্যে। আবার মাথা তুলে চালুনিতে নতুন করে বালি ছাঁকা শুরু করছে।

অঞ্জলি জানে ঐ জনাকয়েক বৃদ্ধ বালি ছেঁকে-ছেঁকে সোনার কুচির সন্ধান করছে। এই এক বিচিত্র বিশ্বাস এদের। সুবর্ণরেখার জলস্রোত নাকি উত্তর-পাহাড়

থেকে স্বর্ণচূর্ণ বয়ে নিয়ে আসে নিয় অববাহিকায়। অঘান-পৌষের সময় যখন সুবর্ণ-রেখা হয়ে পড়ে স্রোতবিহীন এবং অসাড়, তখন সেই স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে দেয় চরার বালিতে। আর সোনা আছে বলেই না নদীর নাম সুবর্ণরেখা!

এই অন্ধ বিশ্বাসের গভীরতা ইদানীং একটু কমে এলেও এখনো ফেরাফেরি করে সুবর্ণরেখার পাড় জুড়ে। ফলত কিছু প্রবীণ মানুষ এখনো সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই চালুনি হাতে এসে জড়ো হয় নদীর চরায়। বালি ছাঁকে। ছেঁকে চলে যতক্ষণ দিনের আলো থাকে। তারপর চালুনি হাতে ফিরে যায় ঘরে। আবার পরের সকালে ফিরে আসে।

অঞ্জলির মনে হচ্ছিল ঐ জনাকয়েক বৃদ্ধ চরার বালি থেকে সোনা নয়, সোনার মতোই উজ্জ্বল আর মহার্ঘ এক বিশ্বাসকে আজন্ম চালুনিতে ছেঁকে ছেঁকে ক্রমশই স্বর্ণতুল্য করে তোলার চেষ্টা করছে। এখানে সামান্য কোনো ধাতুর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি নিতান্তই গৌণ। এই বিশ্বাস নিষ্প্রভ হয়ে গেলে, ঐ জনাকয়েক বৃদ্ধ মানুষ আর বেঁচে থাকবে না। নদীর চরার ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজবে চিরকালের জন্য।

এমনই এক নিখাদ বিশ্বাস নিয়েই তো অঞ্জলি একদিন যোগ দিয়েছিল এই সংস্থায়। নৃতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী, স্নাতকোত্তর পরীক্ষার শেষে যখন মনে মনে সংশয় হীন হয়ে তৈরি হচ্ছিল কোনো সরকারি কিংবা আধাসরকারি অফিসের করণিকের পদের জন্য পরীক্ষায় বসতে, ঠিক তখনই অরুণাংশুদা ডাক দিয়েছিলেন,—এসো অঞ্জলি, আমরা একটা কিছু গড়ে তুলি—যেখানে এবং যার মাধ্যমে আমাদের এতকালের অর্জিত বিদ্যার কিছু প্রয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পাব! অরুণাংশুদার সেই ডাক ফেলতে পারেনি অঞ্জলি। যেমন ফেলতে পারেনি দেবাশিস এবং অশোকও—যারা অঞ্জলির মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পর বিভ্রান্ত হয়েছিল সামনের ভবিষ্যতের ভাবনায়।—নৃতত্ত্ব! শুনতে কত সহজ বিদ্যা বলে মনে হয় তাই নারে অঞ্জলি? অশোক পরীক্ষার পরে বলেছিল একদিন।—বিশ্ববিদ্যালয়ে কত কিছু শিখলাম, মুখস্থ করলাম, পরীক্ষায় পাশও করলাম। অথচ দেখ সারা দেশে কোথাও এতটুকু সুযোগ নেই, যেখানে আমাদের এই জ্ঞানের প্রয়োজন ঘটতে পারে।—আমরাও অ্যাপলাই করতে পারি নিজেদের।

অরুণাংশুদা সেদিক থেকে মস্ত এক সুযোগ নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাদের সামনে। এই অরুণাংশুদার কাছেই ওরা একসময় নৃতত্ত্বের শিক্ষা নিয়েছে। বয়সের ব্যবধান খুব বেশি নয়,—পাঁচ সাত হবে বোধহয়। নিজের অধ্যাপনার নিশ্চিত

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলেন। বললেন, 'সরকার এবারের ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানে' 'ট্রাইবাল ওয়েল ফেয়ার স্কিম'-এর ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। প্রচুর ফাণ্ড অ্যালোট করেছেন। কিন্তু সরকারের হাতে এমন কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যা দিয়ে সারা দেশের অসংখ্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান আদিবাসী গোষ্ঠীর 'সোসিও ইকনমিক স্টেটাস'-এর ওপর ফিল্ড সার্ভে করিয়ে কোনো কংক্রিট রিপোর্ট দাঁড় করায়। তাই সরকার চাইছেন বেসরকারি উদ্যোগে কাজটা শুরু হোক। অরুণাংশুদা আরো বলেছিলেন,—তাছাড়া ট্রাইবাল ওয়েল ফেয়ার মিনিস্ট্রিতে আমার ভালো লবি আছে। এখন যিনি সেক্রেটারি, আই মিন মিস্টার আয়ার,—আমার অনেক-দিনের পরিচিত। আয়ারই প্রস্তাবটা দিয়েছেন আমাকে। বলেছেন, অরুণাংশু অধ্যাপক হয়ে কেন জীবনটাকে রট করছ! তোমার কিছু বিশ্বস্ত ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একটা এস্টাব্লিশমেন্ট গড়ে তোলো। আমি তোমাদের একের পর এক অ্যাসাইন-মেন্ট দিয়ে যাব। দেখবে আখেরে লাভ হবে তোমাদেরই।

সেই থেকেই শুরু। প্রথম প্রথম সে কি উৎসাহ, সে কি উদ্যম। অরুণাংশুদা মিথ্যে বলেননি। সরকারি মহল থেকে কাজের প্রবাহে ছেদ পরেনি কখনো। মাত্র চার-পাঁচ বছরেই এই সংস্থা পায়ের নিচে শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে গেছে। অংশীদারদেরও আর্থিক অবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে।

তবু মাঝে মধ্যে কোথা থেকে যেন এক অদৃশ্য ব্যথা—ব্যথা নয়, হয়তো সামান্য কিছু উদাসীনতা এসে অঞ্জলিকে আজকাল মাঝে মধ্যে আক্রমণ করে বসে। সবই হচ্ছে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখা বিদ্যার লাইনেই কাজ করছে, নানান আদি-বাসী গোষ্ঠীর ওপর ইন স্পট সার্ভে করে রিপোর্ট বানাচ্ছে তারা,—পরিবর্তে সরকারি দক্ষিণার অঙ্কটাও তাদের সারা শরীরে যথেষ্ট চাকচিক্য এনে দিয়েছে। ফুলে উঠেছে ব্যাঙ্কের সেভিং অ্যাকাউন্টস-এর অঙ্কও,—তবু এক ধরনের অবসাদ এসে ঘিরছে ক্রমশ। এতোগুলি রিপোর্ট জমা পড়ল, এতো সব তথ্য এবং পরি-সংখ্যান তুলে ধরা হলো, কিন্তু কটার ওপর সামান্য একটু কার্যকারী ব্যবস্থা নিলেন সরকার বাহাদুর! সবই তো সরকারি হিমঘরে বন্দী হয়ে রইল।

অঞ্জলির মনে হলো সেও যেন সংস্কার-আচ্ছন্ন ঐ জনাকয়েক আদিবাসী বৃদ্ধদের একজন হয়ে যাচ্ছে। চরার বালিতে সোনা নেই, সোনা থাকতে পারেও না, তবু বালি ছাঁকতে হবে। ছেঁকে চলা আর কি!

তফাৎ শুধু ওদের এখনো একটা বিশ্বাস আছে। সোনার চেয়েও দামি সেই বিশ্বাস। অঞ্জলির সেটুকুও নেই।

এবারের কাজটা—সুবর্ণরেখার নিম্ন অববাহিকায় শবর-খেড়িয়া গোষ্ঠীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওপর রিপোর্ট তৈরি করা। কাজটা নাকি খুবই আর্জেন্ট। আয়ার সাহেব বারবার অরুণাংশুকে বলেছেন, দেখবেন কাজটা যেন অতি দ্রুত সারা হয়ে যায়। মিনিস্টার চেয়েছেন। পার্লামেন্টে ঐ রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে তিনি একটা ডেভলপমেন্ট প্যাকেজের কথা ঘোষণা করবেন না। ইলেকশনের বছর তো। আর ঐ এলাকাটাই তো আমাদের মিনিস্টারের কনস্টিটুয়েন্সি!···

অরুণাংশু অনুরোধ গ্রহণ করেছেন।

তারপরেই দল বেঁধে ছুটে আসা এখানে।

অথচ দু দুটো দিন পার হয়ে গেল, কাজ শুরুই হলো না।

হতাশা আসা স্বাভাবিক। যেমন হতাশ অরুণাংশু, দেবাশিস, অশোক। হয়তো অঞ্জলিও।

এদিককার কিছু খোঁজ খবর যে আগে থেকেই জানা ছিল না তাদের এমনও নয়। ঐ যে দূরে, নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে গায়ে মুসাবনি, আশাবনি, রাকা মাইনস, তারও পরে যদুগোদা—এই সব পাহাড় জুড়েই ছিল একদিন শবর-খেড়িয়া উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। যেদিন ওখানে খনি বসল, খনিবাবুদের তাড়া খেয়ে এই শবর উপজাতিদের কিছু অংশ চলে গেল দক্ষিণের দেশে—ঝাড়গ্রাম, লোধাশূলির দিকে। আর কিছু অংশ এসে জায়গা নিল এই সুবর্ণরেখার নিম্ন অববাহিকায়। এখানেই গড়ে উঠেছে চেনজুরা, গোহাণ্ডি, উপর পাওরা, নিচা পাওরা নামের গ্রামগুলি। আর এই সব গ্রামের সার্ভে করার কাজ নিয়েই তাদের আসা এখানে।

কাল চেনজুরা গ্রামে তো তারা ঢুকতেই পারেনি। কী বিশ্রী সেই অভিজ্ঞতা। গ্রাম তো শুধু নামেই। আধমানুষ প্রমাণ উঁচু এক একটি চালাঘর, চালার খড় কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে চালার ভেতর প্রবেশ না করেও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় কাচা মাটির মেঝেয় চিৎ হয়ে শুলে পর দিনের রৌদ্রালোকিত আকাশ এবং রাতের অন্ধকারাবৃত আকাশের নক্ষত্রের দেখা যাবে অনায়াসে। এমনি অসংখ্য চালাঘর—একের ওপর আর একটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। যেন কোনো পরিত্যক্ত এক জনবসতি—দীর্ঘদিন কোনো মানুষের পায়ের স্পর্শ পড়েনি এই গাঁয়ের মাটিতে। দারিদ্রের এক জ্বলন্ত অয়েল পেইনটিঙস হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের চোখের সামনে।

একি চেহারা গ্রামের! বিস্ময়ের প্রথম কথাটা বেরিয়ে এসেছিল অঞ্জলির মুখ থেকেই।

—হ্যাঁ, রীতিমতো স্ট্রেচারার্স কণ্ডিশন। সাড়া দিল অশোক।

—কাউকেই তো দেখছি না। সবাই কি এভাকুয়েট করে চলে গেছে! দেবাশিসের গলা কাঁপল।—কোনো এপিডেমিক টেপিডেমিক হয়নি তো!

এভাবে হতবুদ্ধের মতো মুখ চাওয়া-চায়ি করে ওদের বেশিক্ষণ কাটাতে হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকটা ভোজবাজীর মতোই এক একটি ঝুপরি ঘরের আনাচে কানাচে থেকে একজন দুজন করে বেশ কিছু মানুষ ঘিরে ধরল তাদের, অবশ্য মানুষ বলতে হয় বলেই বলা। নর-কঙ্কাল বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। তবে কঙ্কালের গায়ে চামড়া থাকে না, এদের সেটুকু আছে। যদিও শেষ অঘ্রানের হিম বাতাসে সেই চামড়ায় ফাটল ধরে অসংখ্য সাদা দাগ পড়েছে। কোটরে সিঁধিয়ে যাওয়া চোখগুলি যেন ইট-ভাটার মতো জলছে গনগন করে। —ইখানে কুন কাজে আইসছো গো বাবু বিটিরা? কুন মতলব হাঁসিল কইরতে আইসছো, অ্যাঁ?

ওদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত এক বৃদ্ধ খড় খড়ে গলায় বলে উঠল।

বৃদ্ধের গলায় এমন অমানুষিক স্বর শুনে ওদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওরা সকলেই টের পেল তাদের শীত বোধটাও যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। অথচ এখন সকাল ন'টার রোদের তেজ যথেষ্ট। আর তাদের শরীরে গরম পোশাকেরও কোনো অভাব ছিল না। তবু ওরা টের পাচ্ছিল হাঁড় কাঁপানো এক শীতল স্রোত মাটি থেকে উঠে এসে পা বেয়ে বেয়ে পিঠের শিরদাঁড়া নাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রথমে কথা বললেন অরুণাংশু। কিন্তু কী যে বললেন নিজের কাছেই পরিষ্কার হলো না। হতাশায় দু-একবার সামনের দিকে শূন্যতায় ডান হাতটা বার কয়েক ছুঁড়ে স্থির হয়ে এলেন।

অশোক ফিসফিস করে বলল, ওদের চোখগুলো দেখছো? যত রাজ্যের ঘৃণা আর সন্দেহ যেন ওদের চোখের মধ্যে এসে শেল্টার নিয়েছে।

—ওদের কাছে ওয়েপেনস্ টয়োপনস্ নেই তো? ···মানে যদি আচমকা আক্রমণ করে বসে! দেবাশিসের গলায় ত্রাস।—শবর খেড়িয়ারা আবার তীর চালনায় খুব দক্ষ হয় কিন্তু!

—ধুর! দেখছো না অনাহার আর অপুষ্টিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না মানুষগুলি। সেখানে আবার তীর চালাবে! অরুণাংশুর গলায় বিরক্তির ঝাঁজ! —কিন্তু এভাবে পথের ওপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমরা! একটা কিছু তো করা দরকার! অশোকের গলা।

—আমি তো বললাম একবার। অরুণাংশু বললেন—তোমরা কেউ আর এক-বার বলে দেখ না!

অশোক বলল। বলল তাদের আগমণের উদ্দেশ্য। বিশদভাবে জানালো তাদের তৈরি এই সার্ভে রিপোর্ট-এর ওপর ভিত্তি করে সরকার এবার সুবর্ণরেখার খাতে টাকার বন্যা বইয়ে দেবে। তখন আর এই চেনজুরা গাঁয়ের একটি মানুষও অনাহারে, নিরাশ্রয়ে বিনা চিকিৎসায় দিন কাঠাবে না।

অশোকের দীর্ঘ ভাষণের পরেও জমায়িত কঙ্কাল সদৃশ মানুষগুলির মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটল না। অশোক এতক্ষণ যেন একদল জীবন্ত মানুষের সামনে নয় কোনো পাথরের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল।

বাবুসাহেব, তুমরা শহরে বাপাস চলে যাও। আমরা আর তুমাদের গাঁয়ে ঢুকতে দিব না। ঘরে ঢুকতে দিব না। জেনানা-আউরাৎদের তসবির খিঁচতে দিব না। তুমাদের কুনো সওয়ালের জবাব দিব না।···ওদের মধ্য থেকে এক সুঠাম যুবক এগিয়ে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে শ্বাস টেনে টেনে বলল,—টৌন থিকে এমন অনেক বাবুলোগ এর আগে আমাদের গাঁয়ে এসেছে। আমাদের দেহের মাপ, আমাদের খানা-পিনা, আমাদের রোজগারি—সব সওয়াল করে করে জেগে গেছে। আমাদের ঘর-গেরস্থির ভেতর ঢুকে জেনানা লোগদের তসবির খিঁচে নিয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, ইবারেই সরকার বাহাদুর হামাদের হাল বদলে দিবে। ক্ষেতি কারবারের জমিন দিবে। জমিনে ফসল রুইবার জন্য নদী থেকে নাহার কেটে দিবে। হাসপিটাল বসবে।···সব শালা বকওয়াস। ফালতু বাত। ঝুটা আদমি সব। ঐ সব সওয়ালের জবাব নিয়ে তসবির নিয়ে বাবুরা টৌনে গিয়ে মোটা মোটা রিপোর্ট বানিয়েছে। সরকার বাহাদুর ওদের মোটা টাকা দিয়েছে। আমাদের হাল বরবাদ করে দিয়ে গেছে।···আমরা শালা ভুখা মরছি।···ব্যস করো বাবু লোগ, ব্যস করো। তুমরা টৌন-এ ফিরে যাও।

এভাবে চেনজুরা থেকে ফিরে এসেছিল ওরা। পরেরদিনও একই অভিজ্ঞতা। গো-হাণ্ডি, উপর পাওরা, নিচা পাওরা—যেখানেই গেছে সব গাঁয়েই একরা। —ব্যস করো বাবু লোগ, ব্যস করো! তুমরা টৌন-এ ফিরে যাও। তোমাদের ফালতু বাত আর শুনছি না।

স্বভাবতই ওরা কিছুটা এখন টেনসড্। একটু আগে নিরুপমের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়াটা দেবাশিসের সেই টেনসড্ মনেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

নিরুপমের আর কি? ওর মাথায় তো আর অঞ্জলিদের মতো কোনো বোঝা

চেপে বসে নেই। নিরুপম এই সংস্থার কর্মীও নয়। সে সাংবাদিক। এসেছে তার পত্রিকার পক্ষ থেকে। সামনেই নাকি বনসৃজন সপ্তাহ পালিত হতে যাচ্ছে সারা দেশে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাকি আলমোড়ায় এক বৃক্ষহীন পাহাড়ের শীর্ষে একটি ইউক্যালিপটাস বৃক্ষের চারা রোপণ করে সূত্রপাত ঘটাবেন সারা দেশের 'বনসৃজন সপ্তাহ'র। এবারের লক্ষ মাত্রা নাকি সারা দেশের মোট আট লক্ষ সাতাশ হাজার হেক্টর বৃক্ষহীন অঞ্চলকে 'বনসৃজন প্রকল্পের' অধীনে আনা। এর জন্য আঠারো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর এই 'বনসৃজন সপ্তাহ' উপলক্ষ করে নিরুপম দের পত্রিকার একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে। কারণ ইতিমধ্যেই 'বনসৃজন সপ্তাহ'কে উপলক্ষ করে যে পরিমাণ বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হয়েছে, তার এক তৃতীয়াংশকে ছাপতে হলে দৈনিকের আটটি পাতাও যথেষ্ট নয়। হয়তো পত্রিকার নামটিকেও ছাপার মতো জায়গা দেওয়া যাবে না। ফলে বিশেষ ক্রোড়পত্রের ব্যবস্থা। আর ক্রোড়পত্র যখন, তখন বিজ্ঞাপনের ফাঁক ফোকরে দু-একটা ফিচার—বন সৃজনের ওপর, না ছাপলে দেখতে খারাপ লাগে। তাই নিরুপমের দায়িত্ব পড়েছে সুবর্ণরেখার ভ্যালিতে বনসৃজনের বর্তমান অবস্থার ওপর একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করার। সেই প্রতিবেদনের প্রয়োজনে কিছু পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দিন দুয়েকের জন্য এদিকে আসা। আর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হাওড়া স্টেশনেই অরুণাংশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দুজনেই দীর্ঘদিনের বন্ধু। সেই স্কুল জীবন থেকেই বলা যায়। ইদানীং দুজনের ব্যস্ততা দু ধরনের হয়ে পড়ায় দেখা সাক্ষাতে একটু ছেদ পড়লেও আকর্ষণে ঘাটতি পড়েনি। তারপর যা হয়,—একই সঙ্গে ট্রেনে চেপে বসা। এবং ট্রেনের ভেতরই নিরুপম ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে অরুণাংশুর টিমের আর সব সদস্যের সঙ্গে। কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতে নিরুপমের কথাবার্তা, হাব-ভাব দেখে কে বলবে অঞ্জলি, দেবাশিস এবং অশোকের সঙ্গে তার পরিচয়টা এতখানি নতুন।···নিরুপমের স্বভাবটাই এরকম।

—তোর কাজ হয়ে গেছে! পরিবেশের অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাতে জিজ্ঞেস করলেন অরুণাংশু।

—হয়ে গেছে—উইথ অল স্ট্যাটিক্স। হাসল নিরুপম। ঠিক আগের মতোই ঠাট্টার হাসি। হাসতে হাসতে বলল, আমাদের ব্লক অফিস বল, আর ফরেস্ট অফিস বল,—সেখানে তো আর শবর-খেড়িয়াদের বসবাস নয়। তারা কিন্তু ভেরি মাচ কো-অপারেটিভ টু এভরি ওয়ান। ফরেস্ট অফিস থেকেই জানতে পারলাম ওরা 'বনসৃজন সপ্তাহ' উপলক্ষে স্থানীয় জনগণের মধ্যে আটান্ন হাজার

বৃক্ষচারা বিলি করে ফেলেছে।

—আটান্ন হাজার! দেবাশিস একরকম আঁতকে উঠল।—এত লোকই বা কোথায় পেল এখানে! আর এত চারাগাছ পুঁতবেই বা কোথায়?

—আমি তো ভাই পপুলেশন সেনসাসের কাজে এখানে আসিনি। মাই অ্যাসাইনমেন্ট ইজ ভেরি স্পেসিফিক। তাই ফরেস্ট অফিসও ভেরি স্পেসিফিক পয়েন্ট ফুল কো-অপারেশন করেছেন।…"একটি গাছ একটি প্রাণ।" স্লোগানটা কিন্তু রীতিমত উদ্দীপক। এর বদলে যদি এরকম কোনো স্লোগান হতো—"এক মুঠো ভাত, একটি প্রাণ।" তবে নিশ্চয় আমাদের প্রশাসনে এত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতো না। বড়ো ক্লিশে, এক ঘেয়ে শোনাত স্লোগানটা কি বল?

—এখনও শুনতেন এই ব্লক অফিসও চোখের পাতা ফেলার আগেই আটান্ন হাজার কেন, আটান্ন লাখ মুঠো ভাত বিলি করার লক্ষমাত্রা পূরণ করে ফেলেছে। এই দেখুন স্টক রেজিস্টার আর এই দেখুন ইস্যু রেজিস্টার কোথাও এতটুক গড়মিল নেই।

অশোকের কথায় হেসে উঠল সবাই। অরুণাংশুও। পরিবেশ হালকা হলো।

গেস্ট হাউসের এই ব্যালকনি থেকে উপত্যকায় অনেকখানি দেখা যায়। প্রথম রাত পার হয়েছে সবে। শীতের কুয়াশায় নিথর হয়ে আছে উপত্যকার গাছ-গাছালি, মাটি-পাথর, গাঁ-বসতির মানুষজন। নদীর ওপারে মুসাবনি পাহাড়ে এক একটি খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্য মানুষের টাউন শিপের আলোক মালা যেন পাহাড় শৃঙ্গে দীপাবলী উৎসব পালন করছে। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অঞ্জলির মনে হচ্ছিল এক একটি খনিকে ঘিরে পাহাড়ে পাহাড়ে এই আলোর প্রাচুর্যের ভেতর কোথাও যেন একটা সজাগ প্রহরার ব্যবস্থা আছে। একদিন সে-সব বন্য অশিক্ষিত মানুষগুলিকে তাড়িয়ে এক একটি খনি বসেছে আশাবনি, মুসাবনি, রাকায়, আর যা মূলতই আধুনিক সভ্যতার গর্বিত অভিজ্ঞান,—সেই লোকালয়ে যেন কোনো অসতর্ক মুহূর্তে একটিও অশিক্ষিত মানুষ কোনো গোপন গিরিখাদ বেয়ে ঢুকে পড়তে না পারে, তার জন্যই বোধহয় পাহাড় শৃঙ্গগুলি প্রতি রাতে এমন আলোর প্রাচুর্যে ভরে যায়!

ব্যালকনির মাঝখানে বেতের টেবিল। টেবিল ঘিরে বেতের চেয়ার। চেয়ারে বসে আছে অঞ্জলি, দেবাশিস, অশোক, অরুণাংশু এবং নিরুপমও। অরুণাংশু ডিপলোম্যাটের একটি বড়ো বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে

বলল—কিছুই বুঝতে পারছি না ঠিক কোন ভাবে এগোলে সুবিধে হবে আমাদের।

নিরুপম গ্লাসে খানিকটা জল মিশিয়ে হুইস্কির ঘনত্ব একটু তরল করে লম্বা এক চুমুক দিয়ে বলল,—কেন মিছিমিছি ভাবছ ভায়া! আমার সঙ্গে কালকেই তোমরা সবাই কলকাতায় ফিরে চলো। তারপর ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বই-পত্তর ঘেঁটে একটা বই-টই খুঁজে নিও। আমি শিশুর, কোনো সাহেবের লেখা এদিককার ট্রাইবাল লাইফ নিয়ে—বই ঠিকই পেয়ে যাবে। সেটাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপডেটিং করে দু-চার দিনের মধ্যে একটা রিপোর্ট বানিয়ে ফেল। তা হলেই তো তোমাদের লক্ষমাত্রা পূর্ণ হয়ে যাবে।

—তুই থাম নিরু। বাজে বকিস না। সব কিছুই তোর ঐ সংবাদপত্রের তথ্য সমৃদ্ধ ফিচার নয়। বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন অরুণাংশু।

ক্ষণকালের জন্য নীরবতা নামলো ব্যালকনি জুড়ে।

দেবাশিস গ্লাসে দ্বিতীয়বার হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সিগারেট ধরাল। বলল, সেবার পালামৌ ডিস্ট্রিক্ট-এর সেই গ্রামটায়—কি যেন নাম,…হ্যাঁ, গুরগাঁও,—সেখানেও তো এরকম রেজিস্টেনস ফেস করেছিলাম আমরা।

—হ্যাঁ, ওঁরাও সম্প্রদায়ের ওপর প্রথম কাজ ছিল ওটা। বলতে পার আমরাই প্রথম কাজ করেছিলাম ঐ গোষ্ঠীর ওপর। অরুণাংশু নিচু গলায় বললেন।

—আর সেবার অঞ্জলিই তো ব্যাপারটা সামলে ছিল।…তোমার মনে আছে অঞ্জলি? অশোকের গলা ইষৎ জড়িয়ে আসছিল।

গ্লাসে জিনের সঙ্গে লাইমজুস মিশিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিল অঞ্জলি। গুরগাঁও! নামটা মনে থাকবে না আবার! উফ! সেকি রেজিস্টেনস! গ্রামে পা দেওয়া মাত্র একরকম তেড়ে মারতে আসে আমাদের।—ভাগো শালা সাহাব লোগ, ইসবখৎ গাঁও ছোড়কে ভাগো শালা!…মুখিয়ার সেই জোয়ান ছেলেটা—এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, কি যেন নামটা ছিল! শিউচরণ! হ্যাঁ, শিউচরণ। শরীর তো নয় যেন গ্র্যানাইট পাথরে কেটে কেটে খোদাই করা এক গ্রীক ভাস্কর্য! সেই হিংস্র জোয়ান মানুষটাকেও তো অঞ্জলি সামান্য চেষ্টায় পোষ মানিয়ে ফেলেছিল! ছেলেটার তখন কী অবস্থা! যেন একটা বন্য ভেড়া আর অঞ্জলি তার পালক। প্রেমটেমের হাবভাব ফুটে থাকত চোখে মুখে।…অঞ্জলির ঠোঁটের ফাঁক ঠেলে এক টুকরো হাসি লাইম মেশানো জিনের মতোই গড়িয়ে পড়ল। ভেড়া, ভেড়া, ভেড়া। ভেড়া নয় তো কি! অমন শরীর স্বাস্থ্য নিয়েও সাহস পায়নি অঞ্জলিকে বনের

কোনো নির্জনতায় পেয়ে শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে! অমন চাতাল-বুকের ওপর অন্ততঃ একটি বারের জন্য নিজের শরীরটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়ার কী যে তৃষ্ণা সব সময় আক্রান্ত করে রাখত অঞ্জলিকে।

—এ অবস্থাতেও তুমি হাসতে পারছো অঞ্জু! অরুণাংশু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন।

—ঐ গুরগাঁও-এর কথাটা মনে পড়ে গেল যে! বেচারা শিউচরণের কথা মনে আছে! যে ক'দিন ছিলাম আমাদের যেন ছায়ার মতো পাহারা দিয়ে রেখেছিল। ওর ভয়ে একটি গ্রামবাসীও আমাদের বিপক্ষে যেতে পারেনি। শিউচরণ তো এখন আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা যেদিন প্যাক-আপ করলাম,—রাঁচির বাস ধরব বলে গাঁও ছেড়ে ভোর সকালে রওনা দিলাম, বেচারা শিউচরণ আপত্তি করা সত্ত্বেও আমার কিডস কাঁধে নিয়ে বাসরাস্তা পর্যন্ত হেঁটে এসেছিল।···এবার একটু বেশি শব্দ করে হেসে উঠল অঞ্জলি। হাসির সঙ্গে ঢেউ ভাঙল অঞ্জলির শরীর, বুকের স্ফীতি, কোমরের ভাঁজ। জিনের হালকা নেশা অঞ্জলিকে বেশ ভারহীন করে তুলেছে। অঞ্জলির মনে হচ্ছিল আর একটু পরেই সে বোধহয় গেস্ট হাউজের এই ব্যালকনি ছেড়ে পরী হয়ে উড়ে যাবে উপত্যকার আকাশে।

—তুমিও কিন্তু একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়েছিলে শিউচরণকে। আর তোমার মধ্যেও কিছু দুর্বলতা জন্মেছিল ওর ওপর। ভুরু নাচাল দেবাশিস।

—অমন গ্রীক ভাস্কর্যের মতো সুঠাম এক যুবক,—যার সারা শরীরে বন্যতার ঘ্রাণ —এমন পুরুষের ওপর দুর্বলতা না জন্মানোর মতো আমি ফ্রিজড্ নই, জানই তো!

—খালি দুর্বলতা! আর কিছু দাওনি শিউচরণকে? অশোক টিপ্পনি কাটল।

—কেন, শুনতে খুব লোভ হচ্ছে বুঝি! ঠোঁটের মুদ্রা করল অঞ্জলি। মুদ্রা ভেঙে বলল,—ইন ডিটেইলস শুনতে পারবে? বুক ফাটবে না তো।

—আঃ! আবার কি শুরু করেছো তোমরা! অরুণাংশু আবার ধমকে উঠলেন।

ওরা আর কথা বাড়াল না। রাত একটু একটু করে ঘন হচ্ছে। ত্রস্ত পায়ে শীতের আকাশ ভাঙছে এক ফালি চাঁদ। কুয়াশা আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে আছে চরাচর। কাছে পিঠের কোনো বনাঞ্চল থেকে এক অচেনা রাত জাগা পাখি ডেকে উঠল হঠাৎ। শব্দটা ভাঙতে ভাঙতে ব্যালকনির রেলিঙ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিরুপম বোধহয় নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে চেয়ারের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিরুপমের আর কি! কাল সকালেই বাস ধরে রওনা দেবে টাটানগর। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা।

এই কাজের দায়িত্বটা না নিলেই ভালো ছিল।···ভাবল অরুণাংশু। কারণ অরুণাংশু দেবাশিস কিংবা অশোককে এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অঞ্জলিকেও যতই উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করুন না কেন, তিনি মনে মনে ঠিকই অনুভব করতে পারছিলেন তাঁর আত্মবিশ্বাসেও চির ধরে গেছে অনেকখানি। তবু তিনি এই টিমের লিডার। এই সংস্থারও প্রধান ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাসহীনতা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে তাঁর সহকারীরা তো আরো ভেঙে পড়বে। তাই তিনি এতক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন নিচের সঙ্গেই। উৎসাহ জাগাতে চাইছিলেন দেবাশিস কিংবা অশোককে। কিন্তু এখন, টিলার ওপর এই গেস্ট হাউজের ঝোলানো ব্যালকনিতে বসে অ্যালকোহলের আচ্ছন্নতার ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে তিনি টের পাচ্ছিলেন, এই অ্যাসাইনমেন্টটা ফুলফিল করা বোধহয় তাদের সাধ্যের অতীত।

এর ফলাফল কি হতে পারে! মিঃ আয়ার নিশ্চয় খুব ক্ষুব্ধ হবেন অরুণাংশুর ওপর! তিনি হয়তো অরুণাংশুকে যে পক্ষপাতের দৃষ্টি নিয়ে এতদিন দেখে এসেছেন, সেই পক্ষপাতিত্ব তুলে নিতে পারেন অরুণাংশুর ওপর থেকে! ফলশ্রুতিতে অরুণাংশুর এই সংস্থার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যেতে পারে। সরকারি দাক্ষিণ্যের ওপরই তো দাঁড়িয়ে আছে সংস্থাটা। সেই দাক্ষিণ্যে ঘাটতি পড়া মানেই তো, নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলা।···

—অরুণাংশুদা আপনার নিশ্চয় মহাভারতের সেই এপিসোডের কথা মনে আছে?···অঞ্জলির কাঁধ ছাড়িয়ে কোমরের ওপর নেমে এসেছে শাড়ির আঁচল। এয়ার হোস্টেজ কাট ব্লাউজের নিচু গলা ঠেলে উঁকি দিচ্ছে বুকের ঊর্ধ্বাংশ। গায়ের শালটা কখন যে পিঠ ছাড়িয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই। জিনের উত্তাপে অঞ্জলি বোধহয় রাতের এমন কাপকাটা ঠাণ্ডার উপস্থিতির কথা ভুলেই গেছে।

অরুণাংশুর তলপেটে চাপধরা এক অস্বস্তি জেগে উঠল। অঞ্জলির বুকের চোখ রাখতে সেই অস্বস্তিটা যেন আরো বেড়ে উঠছিল অরুণাংশুর। এরকমই হয় অঞ্জলির। মানে অরুণাংশু দেখেছেন ফিল্ড-এ এলে, পাহাড় অরণ্য আর অবাধ্য আদিবাসীদের সংস্পর্শে আসার পর অঞ্জলি কেমন যেন বদলে যায়। এক ধরনের আরণ্যক আকর্ষণ অঞ্জলির ভেতর জাগতে শুরু করে। ঠিক যেমন জেগে উঠেছিল সেই গুরগাঁও-এ। অথচ এই অঞ্জলিই কলকাতায় কত স্বাভাবিক, শান্ত। এই অঞ্জলির সঙ্গেই তো বিয়ে হওয়ার কথা অরুণাংশুর। অরুণাংশু যেদিন প্রোপোজ করেছিলেন সেদিন অঞ্জলি কত সহজে স্বীকার করে নিয়েছিল তাঁকে। বলেছিল, আমারও এরকম একটা প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিল অরুণ। ভাবছিলাম মেয়ে হয়েও

হয়তো প্রথম কথাটা আমাকেই বলতে হবে মুখ ফুটে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে এতোবড়ো লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছেন।

—হঠাৎ মহাভারতের কথা কেন? সাড়া দিলেন অরুণাংশু।

—পাণ্ডবদের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য একলব্যের কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে তার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা দাবি করেছিলেন, মনে পড়ছে?

—পড়ছে।

—এই একলব্যই কিন্তু শবর জাতি গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ। তাই আজও শবররা তীর চালনায় কখনো বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে না। তর্জনী এবং মধ্যমার সাহায্যে ধনুকের ছিলায় শর সংযোজন করে।

—ইন্টারেস্টিং।

কিন্তু এর পেছনে এক গভীর চক্রান্ত লুকিয়ে আছে। একলব্য—যেহেতু অনার্য—ফলত পাছে আর্য প্রতিনিধি অর্জুন-প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে কোনোদিন,—এই আশঙ্কায় দ্রোণাচার্য সুকৌশলে একলব্যের গুরুভক্তিকে এক্সপ্লয়েট করে ঐ বুড়ো আঙুলটা কেটে নিয়েছিলেন। আর এটাই বোধহয় আমাদের এই সাবকনটিনেন্ট-এ আর্যদের ছলচাতুরির কাছে অনার্যদের মস্ত বড়ো পরাজয়ের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ, তাই না?…অঞ্জলি নিচু হয়ে মেঝের ওপর থেকে শালটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালো। সে বোধহয় একটু একটু করে স্বস্থানে ফিরে আসছিল। তাই জাগতিক বোধগুলিও জেগে উঠছিল।

—এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কি করব? ঐ শবরদের আঙুলগুলি কি আমরাও কেটে নেব এক এক করে? দেবাশিস বিভ্রান্ত স্বরে বলে উঠল।

—আঙুল কাটতে যাব কেন? একটা ভাল উদাহরণ দিলাম। এই থেকে আমরা কি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছি না! অঞ্জলির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আত্মবিশ্বাস! আমরা তো হতাশায় একেবারে তলিয়ে গেছি। অশোকের নেশাচ্ছন্ন গলায় গোঙানি জাগল।—এদিককার শবররা কী অ্যাডামেন্ট! বাব্‌বা!

—অ্যাডামেন্ট হলেও ওরা শবর। নিরক্ষর। অশিক্ষিতও! আর আমরা শিক্ষিত। দ্রোণাচার্যের উত্তর পুরুষ!…অঞ্জলি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গ্লাশের জিনের শেষ তলানিটুকু গিলে ফেলে বলল আবার—কালকের সকালটা আসতে দাও না! তারপর দেখো!

—এখানেও কি কোনো শিউচরণের সন্ধান পেয়ে গেছ? অপেক্ষাকৃত হালকা গলায় বলল দেবাশিস!

শিউচরণ না হোক, হরিচরণ রামচরণ কেউ একজন আছে নিশ্চয়—যে এই দুই চরণে লুটিয়ে পড়ার জন্য ছুটে আসবে ঠিক।…গলা ছেড়ে শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল অঞ্জলি।

ওরা হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি দিতে দিতে দেখল গেস্ট হাউজের ব্যালকনিতে মধ্যরাতের হিমশীতলতায় অঞ্জলি হাসতে হাসতে কখন যেন সুদূর মহাভারতের কালে চলে গেছে। অঞ্জলি দ্রোণাচার্য হয়ে গেছে যেন।…আর্য আচার্যের কূটবুদ্ধির কাছে শক্তিমান একলব্য কত অনায়াসে বোকা বনে গিয়েছিল! আশ্চর্য! এতবড়ো একটা দৃষ্টান্তের কথা তারা এতক্ষণ ভুলে ছিল কি করে? ঐ তো কটামাত্র অর্ধভুক, অশিক্ষিত এবং নির্বোধ শবরগোষ্ঠী-ভুক্ত উপজাতি মানুষ। তাদের সামান্য একটু প্রতিরোধ দেখেই তারা এত সহজে ভেঙে পড়েছিল কেমন করে!…এ কথা ভাবতেই তাদের লজ্জা হচ্ছিল ভীষণ।

কেবল অরুণাংশু হাততালি দিয়ে উঠতে গিয়েও পারলেন না। অঞ্জলির সঙ্গে চোখাচুখি হয়ে গেল বার কয়েক। মাথাটা নিচের দিকে নেমে এলো তার। "শিউচরণ না হোক, হরিচরণ রামচরণ কেউ একজন আছে নিশ্চয়,—যে এই দুই চরণে লুটিয়ে পড়ার জন্য ছুটে আসবে ঠিক।"…অঞ্জলির শ্লেষ জড়ানো কথাগুলি যেন অরুণাংশুর গালে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিল।

…কিন্তু অঞ্জলিকে নিরস্ত করবেন কোন আশায়! আর তো দ্বিতীয় কোনো রাস্তা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

অঞ্জলি অরুণাংশুর ঝোঁকানো মাথার দিকে কান রেখে মনে মনে বলল, ভয় নেই। খুব বেশি দূর যেতে হবে না। বিয়ের পিঁড়িতে তুমি নিখাদ কুমারী কনেই পাবে অরুণ। কেবল যেটুকু না ছাড়লেই নয়, সেটুকুই ছাড়তে হবে। হাজার হোক কাজটার সঙ্গে আমাদের সকলের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা জড়িয়ে আছে যে!

গাঙ্গেয়

দুর্গাদাস ভট্ট

মেঘ দেখে আকাশের ভাবগতিক বোঝা যায়নি। সন্দেহ ছিল। পুব আকাশের খানিকটা জমাট কালো মেঘ ক্রমশই ভেঙে ছড়িয়ে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছিল। ঠিক এই ধরনের অবস্থায় দেখা গেল বাবুঘাটের দিক থেকে মাস্তুলে একটা জোরালো এবং দু-ধারে সবুজ আলো জালিয়ে প্রতীক্ষিত লঞ্চটি ফেয়ারলী প্লেস ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

ইতিমধ্যেই জেটিতে অফিস ফেরত যাত্রীদের ভিড়। একটা কোনো অজ্ঞাত কারণে বি গার্ডেন—ফেয়ারলী লঞ্চ সার্ভিসের ছ'টার ট্রিপটা বাদ পড়েছিল। ফলে জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি অধৈর্য। সারাদিন নানা কাজকর্ম করার পর ঘরে ফেরার টান থাকেই। বিশেষ করে এই লঞ্চ সার্ভিস চালু হওয়ার পর বাস বা মিনি বাসে চেপে হাওড়া ঘুরে বঙ্কিম সেতু পার হয়ে মল্লিক ফটক, সন্ধ্যা বাজার, কাজি পাড়া ইত্যাদি ছুঁয়ে বি গার্ডেন এলাকায় পৌঁছুনোর ধকল অনেকাংশে কমে গেছে। গঙ্গার ওপর দিয়ে ফুরফুরে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ঘরে ফেরাটা আর ধকল বলে তো মনেই হয় না বরং যাত্রীদের অনেকেই সারাদিন এই ফেরার সময়টির অপেক্ষায়। দিনভোর এই লঞ্চে ফেরার ছবিটা নরম সুরের মতো ছুঁয়ে থাকে।

আলোজ্বলা লঞ্চটি জেটিতে ভেড়া মাত্রই ওঠার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঘরে ফেরার ভাবনায় মশগুল হয়ে মনীশও জেটির ওপর ঠায় দাঁড়িয়েছিল। ক্রমাগত ভিড় বেড়ে ওঠায় সরে সরে জেটির কোণের দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল মনীশ। এদিন তার আবার একটা নতুন উৎসাহ। সঙ্গে তার শৈশব সঙ্গী রতন। যে সদ্য তার ফেলে আসা মফঃস্বল শহর থেকে এসেছে। ওর সব কিছু থেকে শৈশবের ঘ্রাণ অনুভব করতে পারছিল মনীশ। জন্ম থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত মনীশের যেখানে কেটেছে, তার সর্বত্র জুড়ে রতনও যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসার পরও রতন তার সঙ্গ ছাড়েনি। মনীশ প্রথম বাসা নিয়েছিল শিয়ালদা অঞ্চলের ট্যাংরায়। কলকাতায় এলেই রতনও অন্য দরকারি কাজ ফেলেও সেই বাসায় আসত। মনীশকে সর্বক্ষণ যেন লেপ্টে থাকত। সুযোগ পেলেই মনীশের স্ত্রী সুনন্দার পিছনে লাগত। তারপর সেই বাসা ছেড়ে মনীশ যখন গঙ্গার এপারে একটা

ফ্ল্যাট নিয়ে চলে আসে, তখন থেকেই রতন চিঠিতে জানাচ্ছিল—শীঘ্রই তোর অফিসে যাচ্ছি, তারপর তোর নতুন ফ্ল্যাটে হানা দেব।

আজই সেই দিন। আগে চিঠি দিয়েই রতন এসেছে। কথাটা গত পরশু মনীশ তার স্ত্রী সুনন্দাকে বলে। সুনন্দার চোখে কৌতুক ঝিকিয়ে ওঠে। ঠোঁট টিপে হেসে বলে—

—তাহলে আর কি? তোমাকে আর পায় কে, দু-চার দিন বন্ধু নিয়েই কাটবে।

—কেন, আমার কাজ, আমার দায়িত্ব কি তাতে বাদ পড়ে যাবে? এ জন্যে কারো কোনো অসুবিধা হতে দেখেছ?

—দেখিনি আবার, তখন সব সময়েই তোমার মন উড়ু উড়ু···

—তার মানে?

—মানে আবার কি? বাজার, দোকান থেকে যা যা আনতে বলব তার অনেকটাই উল্টে পাল্টে যাবে। পরে আবার আমাকেই যেতে হবে।

—সে আবার কি কথা?

—সেটাই কথা গো, সেটাই কথা। ধনের গুঁড়ো আনতে বললে জিরের গুঁড়ো আনবে, আদার বদলে কাঁচা লঙ্কা···

সুনন্দার কথায় কোনো ঝাঁঝ ছিল না। কিছু কৌতুক, কিছু বা রহস্যও। মনীশ হেসে ফেলে বলল—

—তা অমন একটু হতেই পারে। ওকে দেখলেই আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে। কি করব বলো?

—সে কি আর জানি না? অন্য দিন বাড়ি ফিরে তো মুখ গোঁজ করে বসে থাকো। কিন্তু বন্ধু দেখলে তো কথা তো ফুরোয় না। তখন এত কথা কোথা থেকে আসে গো?

—সে তুমি বুঝবে না সুনন্দা। ওর সবটাই নান্দনিক ব্যাপার। কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই। কোনো চাহিদাও নেই।

যত চাহিদা বুঝি আমার?

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরছে দেখেই তাড়াতাড়ি রেশন কার্ড আর থলির খোঁজ করেছিল মনীশ। সপ্তাহের রেশনটা তখনো তোলা হয়নি।

লঞ্চ অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েই ভোঁ দিল। একজন শক্তপোক্ত যুবক জেটির সঙ্গে পাক দিয়ে বাঁধা দড়ি খুলছে। তখনো গ্যাংওয়ে দিয়ে বহুলোক ছুটে আসছে। মহিলারাও

সকলেই কাঠের পাটাতন কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। মনীশ জনতার পিছু পিছু নিজে লঞ্চে উঠে রতনকে তোলার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। রতন ছোট একটা লাফ দিয়ে ওপরে উঠে মনীশের কাঁধের কাছটা চেপে ধরল। লঞ্চটা অল্প দুলে উঠেছিল। রতন এবার চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল—ওপরে দাঁড়াতে পারলেই ভালো হয়।

তারপর আকাশের দিকে চোখ রেখে বলল—বাঃ, চমৎকার তো?

কি চমৎকার! মনীশ বিস্মিত।

—দেখছিস না, কি রকম থরে থরে মেঘেরা সাজছে। জলের ঢেউগুলোও কালো। ভয়াল অথচ কি সুন্দর, তাই না?

—কিন্তু গতিক তো সুবিধার নয় মনে হচ্ছে রে।

—কেন?

—ঝড় উঠতে পারে।

—ঝড়, আহা, এর চাইতে ভালো আর কি হয়? গঙ্গাবক্ষে ঝড়। আমাদের লঞ্চ মোচার খোলার মতো দুলতে থাকবে। ঢেউ আছড়াবে, চারিদিকেই গর্জন। আমরা মুহূর্তেই একটা কোথাও হারিয়ে যেতে থাকবো, কেউ খুঁজে পাবে না···

রতন যে যথেষ্ট আবেগপ্রবণ এ কথা মনীশ খুব ভালোভাবেই জানে। কিন্তু এতটা? রতনের কথা শুনে চারপাশের চোখগুলি ভস্ম করে দিতে চাইছে। "লোকটা কি পাগল?" এ ধরনের প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আসল ভয়টাই এখন বিষয়। অল্প কিছুদিন আগে ডায়মণ্ডহারবারের লঞ্চডুবির খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। মনীশ আবার সাঁতারও জানে না। ঘোরতর সংসারী, স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চার আকর্ষণ। সঞ্চয় বলতে তেমন কিছু নেই। তাই কাঁপা-গলায় হালে বসা যুবকটির পার্শ্ববর্তী সাদা দাড়ি সারেঙকে বলে—

—সারেঙ ভাই, লঞ্চ কি ছাড়বেন?

—কেন ছাড়ব না বাবু?

—আকাশের অবস্থা তো তেমন ভালো বুঝছি না।

মুহূর্তমধ্যে সাদা চুলদাড়ির সারেঙ ভাই ছাদের ছোট খুপড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। সারা আকাশটা জরিপ করার ভঙ্গিতে দেখে বলল—সামান্য একটু ঝড় উঠতে পারে। আমি আজ হালে বসব বাবু, ভয় নেই।

ততক্ষণে জেটিতে লঞ্চ বাঁধার দড়িটা আলগা করা হয়েছিল। কিন্তু ঘণ্টা বাজেনি। এরপরেই ইঞ্জিন স্টার্টের সংকেত বেজে উঠল। জলযানটি জেটি ছাড়ছে। লঞ্চে ওঠার জায়গায়, ছাদে এবং ওঠার গেটের মধ্যে অন্তত শ'খানেক মানুষ।

বেশ ক'জন সুবেশিনী, যুবক যুবতী বয়স্ক এবং গোটাকয়েক শিশুও। আকাশের অবস্থার কথা ইতিমধ্যে যাত্রীমহলে চালু হয়ে গিয়েছিল। একজন সাফারি স্যুট, ব্রীফকেস হাতে ধরা যুবক সবজান্তা ভঙ্গিতে বলল—ওই বুড়ো সারেঙটা জানে কি? ও কি আবহাওয়া বিশারদ? ঝড় উঠলে ও কি ঠেকাবে?

রতন সেই কথা শুনে হাত নেড়ে বলে—বুড়ো সারেঙ যদি না পারে আপনি ঠেকাবেন। মনে হচ্ছে আপনি অনেক কিছুই জানেন···

—আপনি কে মশাই? আপনাকে কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে হয় না?

—আপনাকেও তো আমি কোনোদিন দেখিনি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, এখন তো দেখছি, আপনার কথাও শুনছি।

—কি শুনছেন আমার কথা? আপনি কি মনে করেন না যে আমরা একটা বড়োগোছের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি? চারিদিকে মেঘ ঘনাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না?

—যতই মেঘ ঘনাক। হেড সারেঙের কথাটাই এখানে বড়ো। জল আর আকাশ নিয়েই ওর কারবার।

রতনের কথা শুনে সকলেই কিছুটা স্বস্তি পায়। অভিজ্ঞতা বলে কথা। মানুষ তো এখনো অভিজ্ঞতারই দাম দেয়। একদিকে যেমন দ্রুত ঘরে ফেরার প্রয়োজন আছে অন্যদিকে ভয় ও উদ্বেগ। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই লঞ্চ ছুটতে থাকে। স্রোতের অনুকূলে ছোটা। দ্রুত অতিক্রম। জলের শব্দ, বাতাসের শব্দ এবং ঘনায়মান মেঘের ছায়ায় অন্ধকারের দ্রুত নেমে আসা। এ-সবের মধ্যে নিজে সমেত সব যাত্রীদেরই অসহায় মনে হয় মনীশের। বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ফেরার পথ নেই। নিশ্ছিদ্র কালো মেঘ চারিধারে আঁট হয়ে বসেছে। ক'দিন আগের লঞ্চডুবির সংবাদও তলে তলে কাজ করে যাচ্ছে।

অল্প পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সামনে পিছনে পাশে সবদিকে বৃষ্টিধারা জলরঙের ঘেরাটোপের সৃষ্টি করেছে। লঞ্চের মাথায় ফিট করা সার্চলাইটটা জ্বলছে। অন্ধকার ফুঁড়ে একটা বল্লমের মতো আলোর গতি এগিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ক্রমাগত জলধারায় সেই গতি বাধা পাচ্ছে। কাছ থেকে দূর পর্যন্ত যা দেখা যায় তার সবটাই ঝমঝম বর্ষণ। কিন্তু এই বিবশকারী অবস্থার মধ্যে রতন কিন্তু চুপ করে বসে নেই। ইতিমধ্যে যারা লঞ্চের ওপরে ছিল, তারা সকলেই বৃষ্টির ভয়ে লঞ্চের ভিতরে চলে এসেছে। সেই ফাঁকে রতন অনেকবার লঞ্চের ভিতর থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের অংশে মুখ বাড়াতে চেয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির ছাটে তাড়া খেয়ে মাথা গলাতে পারেনি।

বৃষ্টি নামার অল্প পরেই ভিতরের জানলাগুলো মোটা ত্রিপল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বাইরে কি হচ্ছে জানা যাচ্ছে না। গোঁ গোঁ শব্দ। বৃষ্টির তোড় এবং জলের ঢেউ ত্রিপল এবং লঞ্চের গায়ে আঘাত হানছে। ইঞ্জিনটা বিকট শব্দে চেঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে লঞ্চটা টলে যাচ্ছে। যাত্রীদের শক্ত করে কিছু না কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। ওপরের হালধরার ঘর থেকে সংকেত আসে এইসময়। দড়ি টেনে বিশেষ সংকেত। বেলটা বার পাঁচেক পরপর বেজে ওঠার পর কিছুক্ষণ টানা বেজে চলে। ইঞ্জিন চালক হেঁকে ওঠে—শিগগির জানলার ত্রিপল খুলে দিন। নইলে লঞ্চ উল্টে যাবে।

—তাহলে ঝড়ও ঢুকবে, জলও ঢুকবে। সবকিছু ভিজে একাকার হয়ে যাবে।

—দুর মশাই, আগে তো প্রাণ।

হুড়দাড় করে প্যান্ট ধুতি এমনকি চুড়িদার ম্যাক্সির মেয়েরাও জানালায় আঁটা ত্রিপল খুলতে থাকে। এবার হু হু বাতাস। নদীর জল লাফিয়ে কিছু কিছু ভিতরে ঢুকে যায়। কিন্তু লঞ্চটা আর তেমন হেলছে না। প্রবল বিক্ষুব্ধ গঙ্গার অনেকটাই জানলা দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

রতন এবার সীটের ওপর দাঁড়িয়ে গান ধরে

—ঝন্ঝন ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, বাজল ভেরী বাজল ভেরী···

—থামুন মশাই, আপনার ভয় ডর নেই?

—কিসের ভয়? শেলীর সেই কবিতাটা পড়েননি?

"ইফ উইনটার কাম্‌স্ ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইণ্ড?" ঘরের সার্সি দিয়ে ঝড় দেখে কি হয়? সে ঝড় তো গায়ে লাগে না।

মনীশ এবার ছুটে এসে রতনের হাত ধরে টানে—

—কি সব পাগলের মতো বকছিস? দেখছিস না আজ আমরা কি অবস্থায় পড়েছি। লঞ্চটা ডুবেও যেতে পারে। তোর না হয় ছেলে বউ কিছুই নেই, আমাদের তো আছে।

—কে বলেছে আমার কেউ নেই? আছে।

—তার সাথে তুই আবার বিয়ে করলি কবে?

—আরে না, বউ ছেলে সংসার মানেই কি একমাত্র আকর্ষণ? তাছাড়া বুঝি আর কিছু নেই?

এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রতনের পাগলামি অসহ্য মনে হচ্ছিল মনীশের।

—তুই কিরে? কি বলতে চাস তুই? এই···এই···মাথা নিচু করে বসে পড়; বসে পড়।

দুরন্ত ঝাপটায় লঞ্চটা একবার কাত হয়েই সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রীদের মধ্যে নানা মাপের শব্দ। একজন মহিলার মাথা দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে গেছে। দু-চারটে বাচ্চা গড়াগড়ি দিচ্ছে। তারমধ্যেই রতনই যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। ওর নিজের কথা নিজের কানেই ফিরে আসে—

—বলিনি, বলিনি এরাই আমার আপন, এরাই আমার সব।

রতনের কথায় কান দেওয়ার তখন কেউ ছিল না। লঞ্চের মধ্যে ছোটো বড়ো ঢেউ ঢুকে জমে উঠছে। লঞ্চ চালকদের অস্থায়ী সংসার এখানেই। জলযানটির পিছন দিকে উঁচু মতো জায়গায় ওদের রান্না খাওয়া। পিছনের চৌকো দরজা দিয়ে ওরা আকাশের সান্নিধ্য পায়। উনুন জ্বালায়, ভাত রাঁধে, বঁটিতে তরকারী কোটে, হাতা কড়াই গামলা বালতি সবই ভিতরের পিছন দিকটায় জড়ো করা, কাউকে কিছু বলতে হয়নি, যে যা হাতের কাছে পেয়েছে—তাই দিয়ে লঞ্চের ভিতরের জমা জল ছেঁচতে শুরু করেছে—কিন্তু ঝড় কমছে না। বৃষ্টির বেগ কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য ভাবে কমে গেছে।

রতন এবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে। সাদা রেলিং ঘেরা ছাদের অল্প-দূরেই হেড সারেঙের ঘর। সামনে একটা ফাঁক। তা দিয়ে হাতল লাগানো প্রকাণ্ড একটা কাঠের চাকা দেখা যায়। বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয়—সেই সাদা দাড়ি দেখতে পায় রতন। ওটার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস ঢুকে হেড সারেঙের সাদা রেশমী দাড়ি মাঝে মাঝেই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। রতন গলা ফেড়ে বলে—

—সারেঙ ভাই, সব ঠিক তো?

—সব ঠিক বাবু, কোনো ভয় নেই। দূরে তাকিয়ে দেখুন, কি, আলো দেখতে পাচ্ছেন না?

—আলো!

রতন চিৎকার করে উঠল। নিচের লঞ্চের পেটের মধ্যে কথাটা জোর গলায় ছেড়ে দিল রতন। আলো!···কিসের আলো? মনীশের মনে পড়ল তাদের গার্ডেন জেটির ওপরে কিছুদিন হলো একটা ফ্লাডলাইট বসানো হয়েছে। তীব্র আলো এই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে ভিতরে ঢুকে মানুষকে তার নিরাপদ আশ্রয়ের কথা বলছে। গার্ডেন জেটির উল্টো দিকের গঙ্গায় মেটিয়াব্রুজ গার্ডেনরীচ সংলগ্ন বেশ কিছু বোট, ষ্টিমার এবং খিদিরপুর ডক দিয়ে যেসব জাহাজ গার্ডেনরীচ শিপ রিপেয়ারিং-এর

দিকে চলে আসে—তারো কিছু কিছু আলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বৃষ্টির তোড় কমে গেলেও ঝড়ের বেগ কমছে না।

গন্তব্যস্থলের খুব কাছে এলেও লঞ্চটাকে জেটিতে ভেড়ানো গেল না। সবটাই হাওয়ার উল্টোমুখে হয়ে যাচ্ছে। লঞ্চের চালক গীয়ার চেঞ্জ করে প্রাণপণে চেষ্টা চালাল। ইঞ্জিন গজরাচ্ছে, টানছে। তবু ঝড়ের বেগের সঙ্গে এঁটে ওঠা গেল না। ঝড়ের জোর লঞ্চের ইঞ্জিনের শক্তিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিল। প্রবল টানে সেটাকে বিচালি ঘাটের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি যাত্রী বোধহয় তাদের হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ শুনতে পায়। চোখের সামনে থেকে তাদের চেনা ঘাটটা সরে যেতে দেখছে সকলে। জীবন থেকে বেঁচে থাকাটা খসে পড়ার মুখে।

একজন সারা মাথা টাক—সুস্থির যাত্রীও এতক্ষণে বিচলিত বোধ করেন। এতক্ষণ ইনি ভাবলেশহীন, "যা হবার হবে" হয়েছিলেন। লঞ্চের নিয়মিত যাত্রীরা অনেকেই এঁকে চেনেন। মজা করে, রসে ডুবিয়ে কথা বলায় সর্বদাই মুখর। সেদিন কিন্তু এই বিপরীত অবস্থার শুরু থেকেই কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ইনি চুপ ছিলেন। এখন তাঁর মুখে হাসি নেই। থমথম করছে। ঠোঁট ফাঁক করে যা বললেন—তাতে রসের কথা কিছুমাত্র ছিল না। প্রবল শঙ্কা ও ত্রাসে কম্পিত কয়েকটি শব্দ।

—বিচালি ঘাটেও সারেঙ এটাকে ভেড়াতে পারবে তো?

—"তাহলে"

ভয় ভাবনার সমস্বর।

—"তাহলে" আবার কি? এই গঙ্গা আমাদের কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে দেখা যাক। সমুদ্রও তো খুব একটা দূরে নয়···

—সে কি?

একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো বিপন্নতা, শেষের সেই ভয়ঙ্করই পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। বোধহয় শেষ আশ্রয়টুকুও তলিয়ে গেল। এই তরঙ্গসঙ্কুল তুমুল বিক্ষোভ যেন কারো মনে আঁচড় কাটতে পারছে না—সব স্থির, সব নিস্পন্দ। শুধু মনীশের বন্ধু রতনই এর একটা ভিন্নমাত্রা দিতে চাইল।

—হ্যাঁ, দেখাই যাক না, এই ঝড় আমাদের কতদূর নিয়ে যায়। এমনিতে তো আপনারা সব করে নিজের নিজের জায়গা ফেলে নদীতে ভাসবেন না···।

বাকি অন্য সকলেই মনে মনে ফুঁসছিল। মূল দোষটা সারেঙ-এর। ওই লোকটাই এই সবকিছুর মূলে। নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে বড়ো করার ফল। এখন

এই ঝড় কখন থামবে? বৃষ্টিও মাঝে কমেছিল, আবার চেপে এসেছে। আকাশ-চেরা বিদ্যুতের পরেই বাজের শব্দ। এখন কি করবে ওই পাকা দাড়ি বুড়োটা?

—ওটার দাড়ি ধরে টেনে আনো।

কয়েকজন যুবক ও মধ্যবয়স্ক চিৎকার করে উঠল। ওদের চোখ-মুখের অবস্থা লঞ্চের সামান্য আলোয় আর মানুষের বলে মনে হয় না। ত্রাসে ক্ষোভে বিকৃত—ভয়ঙ্কর। মুহূর্তেই বিকট শব্দ, নিকটেই একটা বাজ পড়েছে।

—এই বাজটা তো আমাদের মাথাতেও পড়তে পারত। বাড়িতে বসেও তো লোকের হার্টফেল করে, করে না?

রতনও ক্ষেপে উঠছে। ওকে সামলানো না গেলে মুশকিল।

—তুই মার খেয়ে মরবি রতন।

মনীশের হুংকার। তাকেও অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

—তাহলে ওকেই মারুন। ওই ব্যাটা ফক্কড়টা প্রথম থেকেই সারেঙ-কে উসকেছে। এখনো বকে যাচ্ছে।

চার পাঁচটি হাত শক্ত লোহার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে।

মনীশও রতনকে আগলে পাঁচিলের মতো দাঁড়ায়। সেই গোলগাল হাস্যময় চেহারাও কিছুটা দূর থেকে ঝাঁপিয়ে এসে রতনকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়। প্রবল একটা ঘুষিতে রতন সীটের ওপর থেকে কাঠের মেঝেয় ছিটকে পড়েছে এবং কয়েক-জন সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে—"লঞ্চ এখন আর মাঝ গঙ্গায় নেই।" কখন কিভাবে সারেঙ বিশেষ কায়দায় হালের চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লঞ্চটিকে নদীর ডান পাড়ে এনে ফেলেছে। বিদ্যুৎ জলে ওঠা মাত্রই গঙ্গার তীরবর্তী বোটানিক্যাল গার্ডেনের অজস্র গাছ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই ঝড়ে, বৃষ্টিতে, অন্ধকারে সীমাহীন বৃক্ষ তরঙ্গ যেন তাদের আদিপ্রাণ নিয়ে রাতের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে।

এখন আর ডুবে মরার ভয় নেই। এ ঝড় এখন অথবা কিছু পরে থামবেই। নিজের নিজের ঘরে ওরা কোনো না কোনো সময় ফিরে যাবে। শুধু এই মতিচ্ছন্ন সময়ের স্বাদকে জীবনের ক্ষেত্রে কে কিভাবে গ্রহণ করেছে অথবা কাজে লাগিয়েছে সে কথাটাই কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। সারেঙও নয়॥

তিয়াস

মণিশঙ্কর দেবনাথ

মরুভূমির তাপ দগ্ধানো উদোম বুকের মতো তামাম এলাকা। বেআব্রু আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। তরল নীলে ভেসে যাচ্ছে শূন্য। সেই নীলে রোদের চকমকি। তরল নীলের নাভি বরাবর সূর্য। আরো পরে, আরো নিচে নেমে যাবে তা। তবু তাপের দয়ামায়া নেই। মাটির গভীর থেকে তিলে-তিলে শুষে নিচ্ছে রসদ। রোদের তীব্র ঝাঁঝে দুনিয়া কাঁপে তিরতির। ঝাপসা হয়ে ওঠে চৌহদ্দি। এমন দিন আর কখনো এসেছিল কী?

কী পশ্চিম, কী পুব—আবার উত্তর বা দক্ষিণ-যোজন, যোজন খাঁ খাঁ। যেন শরীর থেকে যৌবন ভেস্তে আছে। পড়ে আছে খোলশ বাকল। শরীরের খড়িমাটি। শোষণ করেছে রস, মজ্জা। অস্থির ভূগোল। এলাকার কলজে জলছে দাউ-দাউ করে। এক ফোঁটা জল চাই। এক ফোঁটা জল মানে ক্ষুধার্ত শিশুর ঠোঁটে ভরন্ত নারীর স্তন্যের ফোঁটা। শিশু স্তন্যপান করে বেঁচে উঠবে। বেদম ক্রীড়া করবে ঝেঁকে ঝেঁকে, উদোম গায়। খাজান এই তামাম এলাকার শক্তপোক্ত লোক। এলাকার নাম কী হে? নাম—বেতসমারি। কিন্তু লোকে বলে, খাণ্ডবদহ। বলে ঝেঁকে ঝেঁকে দোলে। কলজের কান্না শুনতে পায়। কলজে বলে, সারা গরমে কী কষ্ট আমার, আমিই জানি হে। বুক খুবলে খুবলে যায়। অথচ ভোরে সূর্য ওঠে শিশুর মতো। খিল খিল করে হাসে। যেন চুমা দিতে ইচ্ছা করে তার মুখে। অমন বিষ নাই যার, সে দুপুরে কী করে ভয়ানক হয়ে ওঠে। এ ভারি জটিল অঙ্ক। খাজানের বুদ্ধি খোলে না। ঘিলুতে তরল নীল ছড়িয়ে যায়।

খাজানের শক্ত কাঁধে মুসো। কোথা যাও খাজান? যাই, জলের সন্ধানে। সঙ্গে দুইজন—দশরথ ও জানকী। তিনজনই ক্লান্ত। ধ্বস্ত। মরুপথের মাঝে তারা বসে পড়ে। খাজানের চেহারা কষাটে, ঠিক কষাটেও নয়—কেমন ধারা পাকানো। চোয়াল সুঁচলো। ধারালো। অগভীর কোটরে দুটি চোখ জলছে ভাঁটার মতো। তাতে রোদের দহন।

জঙ্গল কে খাঁক করল হে? কার এত পেটের খিদে? রোদে আধেক পাতাই

জলে গেছে। ঝাপসা ঝাপসা। মাটির ওপর পড়ে থাকা পাতাগুলি বর্ণহীন, ফ্যাকাসে। চারদিকে অরণ্যের কংকাল জেগে আছে।

খাজান সহসা মাটিতে বসে পড়ে। কাতরাতে থাকে। উঁচু পাথরে নখের কোণ লেগেছে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বাহিত হয়। জানকী এগিয়ে আসে, আহা··· খাজান কাতরানো থামায়। তামাটে ঠোঁটে দাঁত চাপে। লালা ঝরতে থাকে থুতনি বরাবর। আবার হাঁটতে থাকে।

থামলে চলবে হে? এ তো মহাযাত্রা। জলের অপর নাম জীবন।

বেতসমারি আদতে পাহাড়ের অশ্লীলতম জায়গাতে। এলাকা সামান্য। নিচে ধূ-ধূ সমভূমি। লোকলস্কর তেমন নাই। চাষবাস বলতে কিছু নাই। সামান্য ভুট্টা মাইলো। আর জঙ্গল আছে ঢের। তাতে শ্বাপদের আনাগোনা। তারা নামে রাতে। কখনো বা কালো আকাশে তারাদের ভ্রূকুটি থাকে। অথবা চাঁদের আলোর বৃষ্টিতে চরাচর ধুয়ে চক চক করে—তখন তারা আসে। লোক লস্করেরা খুবই অভ্যস্ত। ত্যাদড় রক্ত-খেকোরা থাকে আরো গভীরে; জঙ্গলের গুহ্যতম প্রদেশে।

প্রতি বছরই এমনতরো খরা আসে। মাটির রক্তরস শুষে নেয়। ঝাঁঝরা করে। ওলট-পালট করে মাটির কলজে। মাটির ছাতি হা হা করে। পাহাড় মাটিতে পাক খেতে থাকে আগুনের ডেলা। তারপর তা ফাটতে ফাটতে গড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। মানুষের নাভিশ্বাস জাগে। পশুদের দু' একটা কংকাল পড়ে থাকে মাটিতে। মায়াবী শকুন ডানায় ভর দিয়ে নেমে আসে। মহাভোজ লাগায়। তারপর আবার উড়ে যায় তরল নীলে। একদলের মৃত্যু হয়ে ওঠে আরেকদলের ভোজের উপকরণ।

তামাটে মাটির বুকে তিনজন হাঁটতে হাঁটতে থমকায়। সমভূমি বড়োই সাদাটে দেখায়। ঘাস পাতা রোদে ঝলসিয়েছে। মাটির বুক হা হা। আজ কুয়া তল্লাশ করেছিল খাজান। জলাশয় হা হা করছে আগুনের মতো। গুঞ্জন ওঠে, জল নাই। জল নাই। ফিস্‌ফিসানি জাগে, হা দুনিয়া জল নাই। ছাতি খা খা করে। তেষ্টাতে বুক ঝলসায়।

বিমর্ষ খাজান বলেছিল, জল নাই কোথাও···

দশরথ তামাম এলাকা তল্লাশের ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পেটানো শরীর। পিঙ্গল দাড়ি। দুটি চোখ ঘন, রক্তাভ। সে বলেছিল, নাঃ···

খাজান বসে বসে রুক্ষ মাটির বুকে আঁক কষেছিল। শিরা বহুল হাতে রোদ চলকায়। বলেছিল, নিচের তল্লাটেও জল নাই?

জানকী বলেছিল, নাঃ ···

জানকীর চেহারা কষাটে। এক মুখ দাড়ি। কোটরাগত চোখ। নিঃশ্বাস নেবার সময় বুক ওঠানামা করে। তামাম এলাকার নাড়িনক্ষত্র তার জানা। সে বলেছিল, তল্লাশে জল নাই।

—কী হবে? দশরথ বলেছিল, তবে তো জলের খোঁজে যেতে হবে। খাজানকে খুবই চিন্তান্বিত দেখিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠেছিল,—কোথা যাব? পূবে?

জানকীর একটি চোখ ছোট হয়ে আসে, অন্য চোখের তারাতে নীল রশ্মি ঝলসায়, না। পূব খাঁ-খাঁ···

—তবে দক্ষিণে?

জানকীর ক্ষয়িষ্ণু দাঁত ঝিলিক তোলে। বাদামি শুকনো পুরো ঠোঁট নড়তে থাকে, নাঃ লাভ নাই···

বাকি দুজনেই নীরব। মেঘ রৌদ্রের ছায়া খেলতে থাকে দুজনের চোখে-মুখে।

জানকী এবার তাকালো উত্তরের দিকে। গাছপালা শীর্ণাতি শীর্ণ। যেন রোদের হলকা রক্তরস শুষে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

অস্থি ফেলে গিয়েছে বিসর্জনের জন্য। উত্তরকে তন্নতন্ন মাপ জোক করে জানকী বলেছিল, উত্তরেই জল মিলতে পারে।···

খাজানেরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বুক তৃষ্ণাতে জলছে। তখন বেলা বইছে মধ্য-বেলার দিকে!

এখন, এই মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকালো খাজান। পূব পশ্চিম নীল, উত্তর দক্ষিণ নীল। আকাশের বুকে মেঘ বসতে ভয় পাচ্ছে। রোদ গলছে হু-হু করে। টগবগাছে আকাশ। সূর্য কারোকে ক্ষমা করে না। তাপে ছাতি ঝাঁ ঝাঁ করে। খাড়াই অতিক্রম করতে থাকে তিনজনে।

দশরথ খাজানের দিকে তাকালো, নিচের লোকেরা পূজাপাট বসিয়েছে হে? যদি মেঘ আসে—

চকিতেই কাঁসরের বাদ্য কানে এলো খাজানের। মেঘ যাঞ্চার জন্য পূজাপাট।

বুড়ো পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। ফলমূলের উপচার।

আবার হাঁটতে লাগল তিনজনে। দশরথ ক্লান্তিতে কাহিল, ধ্বস্ত। একটু ছায়া পেয়ে জিরানের চেষ্টা করে।

—চলো হে। ফিরতে রাত হবে। জানকীর পোড়াটে মুখে-চোখে তীব্র সতর্কীকরণ।

—ইবার যেন ভয়ানক খরা। এমন তেজ আগে দেখিনি। খাজান বলল, বলে আগ, বাড়লো।

রোদে ছিন্নভিন্ন গাছপালার রন্ধ্র থেকে তীক্ষ্ণ বর্শার মতো রোদ। আকাশের মাঝামাঝি আগুনের ডেলা। ঘাতক রাক্ষসের মতো তার চিক্কণ দাঁত নেমে আসে তল্লাটে। এবার কী সূর্য অতি ক্রুদ্ধ? বয়স বাড়ার সাথে সাথে এমন ক্রুরতা? খাজান মাথা নাড়ল। এই প্রশ্নের উত্তর নাই।

—রাতের আঁধার নাবার আগেই, আমাদের ফিরতে হবে।···জানকী কথাটা বলে ভ্রূ কুঁচকোল, চকমারির জঙ্গল বড়ো ভয়ানক—

খাজান বড়োই উদ্বিগ্ন বোধ করল। তথাপি তৃষ্ণাতে ছাতি হা হা করে। শরীরের শিরা উপশিরাতেও আগুন লক-লকাচ্ছে। জঙ্গলের মানুষেরও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে হে। ভুখ লাগে। তৃষ্ণাও। খাজানের তিনকূলে কেই বা ছিল? নাঃ মনে পড়ে না। শুধুই বিস্মৃতি। জঙ্গলের ভিতরেই শুরু হয়েছিল জীবন। কখনো সে সমভূমিতে নামে, কচ্চিৎ। তবে সারাক্ষণই থাকে জঙ্গলে। ফলপাকুড় সংগ্রহ করে। আধেক রাখে নিজেদের জন্য। আধেক বিলায় সমভূমিতে। বদলে মেলে সামান্য ভুট্টা, মাইলো। এইভাবেই দিন কাটে খাজানের। এমন করেই জীবন কাটিয়ে দেবে সে। মেঘ যাঞ্চা করতে করতে।

আকাশে কী এক টুকরো মেঘ দেখা দিল? পশ্চিম কোণ বরাবর? টুকরো মেঘ তরল নীলে গলিত হলো। খাজানের চোখে টগবগে লোভ। আবার তাকালো খাজান। নাহে, দিক, পাশে মেঘ নেই। মেঘ দেখলেই আশাতে বুক বাঁধতে ইচ্ছা হয়।···কিন্তু রোদ বড়ো ক্রুর। মনে হয়, সূর্যের মস্তিকে অন্য মতলব আছে।

চকমারি আরো অর্ধেক পথ। উত্তুঙ্গ পাহাড় থেকে এবার খাড়াই। পাহাড়ের বুক, রাস্তার আদল ধূসর ছাইমাখা সিঁথির মতো। তপ্ত মাটি থেকে তাপ উঠছে। বাতাস কাঁপছে থিরথির করে। অনেকটা উষ্ণ জলের উপরিভাগের মতো।

—যেতে যেতে পেট কষে যাবে না তো? দশরথ কাতরোক্তি করল। সে ঘুরে তাকালো খাজানের দিকে। খাজানের রুখু জট পাকানো চুলে রোদের ঝিলিক। দু চোখ আধো রক্তিম। বাদামি ঠোঁট যার পর নাই শুকনো। জিব ভিজিয়েও সিক্ত করা যাচ্ছে না। খাজানের চেহারাতে পোড়াটে ভাব। দেখলে মনে হয়

লোকটা বহুক্ষেত্রেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, বঞ্চনার ফল ভুগেছে। তাই, দৈবাৎ হাসলেও মুখে রক্তিম মেশা ছায়া ঝলসায়। যা কিনা তার তিক্ত অভিজ্ঞতার বাহক।

—কিন্তু উপায় নাই। খাজান দশরথের হাত টানলো, এ তো নতুন কিছু নয়।···

দশরথ হাত ছাড়িয়ে নিল। খাজানের সঙ্গে তাল মেলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সহসা খাজান হাসতে লাগল। শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে হাসি। শরীর ছিন্নভিন্ন করে হাসি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। হাসতে হাসতে দশরথের দিকে তাকালো। জানকী, দশরথ রীতিমতো শিহরিত। খাজান কী পাগল হয়ে গেছে? তার গলাতে লাল শিরা ফুলে উঠেছে। দুটি রক্তিম চোখ শূন্য শূন্য লাগছে। অতঃপর খাজান থিতিয়ে আসে। ঈষৎ গম্ভীর হয় মুখ। জানকী দেখল, খাজানের ভাঁটার মতো দুই চোখে বিষণ্ণতা।

—পাগলের মতো হাসছিলে কেন হে? জানকী বেশ উদ্বিগ্ন গলাতে জিগ্যেস করল।

—হাসি পেল! বলেই দশরথকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে দিল খাজান। ঠেলে আবার হাসতে লাগল। অমসৃণ দাঁতগুলি ঝিলিক দিতে থাকে, কলজের ভারি জ্বালা হে···উড়পুড় করছে—

—থাম্ থাম্। অত উল্লাসের দরকার নাই। জানকী খাজানের এ রকম ব্যবহার দেখে রীতিমতো শঙ্কিত। অথবা দীর্ঘ এই পথ চলাকে লাঘব করতে খাজান ঠাট্টা তামাশা করছে, জানকী ধারণা করল।

খাড়াই-এর বুকে রাক্ষসের মতো ডানা মেলতে মেলতে নামছে রোদ। আকাশের বুকে আগুনের ডেলাটিকে ক্রূর দেখাচ্ছে। যেন সর্বগ্রাসী দুটি চোখ। এখন, এই মুহূর্তে খাড়াই-এর ঢালে জঙ্গলের পাতা বুড়ি তালুর মতো ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এসেছে। যত এগোচ্ছে, ততই জঙ্গল খাঁক হয়ে এসেছে। একের পর এক গাছ ধর্ষিতা। অরণ্য পথগুলিতে পাখির ঝাপটানি শোনা যাচ্ছে। অদূরে, গাছের আড়ালে একটি ছায়া কাঁপছে। খাজানের চোখ গেল সেইদিকে। সে সচকিত হলো। বাকি দুজন এগিয়ে যাচ্ছিল; খাজানকে থমকাতে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল।

—'এ তল্লাটে মানুষ?' খাজান জানকীর দিকে তাকাল, অগম্য জঙ্গলে ওরা আগে তেমন আসেনি। ওদের রেয়াৎ পূব-দক্ষিণে।

খাজান আবার তাকালো গাছের দিকে। ঘন গাছপালা। পাতা ফাঁকা, কিন্তু গাছের জট চার চৌহদ্দিতে। সেখান থেকে খসখস শব্দ ভেসে আসছে। তিনজন স্থির। খাজান ডাকল, ভিতরে কে হে?

কোনো জবাব এল না। আবার ডাকল খাজান, ডেকে এগিয়ে গেল। অতঃপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন বৃদ্ধ। অস্থিসার। কোটরাগত চক্ষু। চেহারাতে একবিন্দু মেদ নেই। অশক্ত বৃদ্ধের দুটি চক্ষু কিন্তু ঝলসাচ্ছে। উজ্জ্বল দীপ্তি নয়, লাল জমাট রক্ত জলজল করছে।

—মহাশয়ের কী জঙ্গলেই বাস? খাজান হাঁকল। তার গলার আওয়াজ শুকনো, ক্লান্তির ছাপ।

বৃদ্ধ চিত্রার্পিত। বয়স অনুমান করা শক্ত। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে সে।

—মহাশয়ের বাস জানতে পারি? খাজান বললো, এই জঙ্গলেই কী বাস? এবার মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। চোখে মুখে অপ্রস্তুত ভাব কাটেনি। দু চোখে কেমন এক বিহ্বলতা। বিহ্বলতা কাটিয়ে সে বললো, হ্যাঁ। আপনারা?

—আমরা পাশের জঙ্গলে থাকি।

খাজান এগিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখল, বৃদ্ধের গলার শিরাগুলি জলজল করছে। টলটল করছে।

চারজনে একটা জটলা হয়। বৃদ্ধ বলল, জলের জন্য ভারি কষ্ট হয়। ছাতি ফেটে যায়। বলে সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। খাজান তাকে ঘিরে ধরল, ঘিরে এগিয়ে গেল। এই অগম্য জঙ্গলে বৃদ্ধ কীভাবে থাকে, কে জানে!

—আমাকে নিয়ে যাবে? বৃদ্ধ টলতে টলতে উঠে পড়ল, ওকে যে জল খাওয়াতে হবে। ওর কলজে ফেটে যায়।

—আর কে আছে?

বৃদ্ধ ঈষৎ যেন লজ্জাবোধ করল। এবার যে বামের জঙ্গল, অর্থাৎ যেখান থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল—সেখানে তাকালো। গাছের আড়ালে খসখস শব্দ হচ্ছে। খাজান রীতিমতো শিহরিত বোধ করছে।

কস্তুরী, কস্তুরী···বৃদ্ধ-র ভাঙা গলার স্বর অনেকটা বাঁশির মতো বাজতে থাকে। খাজান নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। উৎকণ্ঠাতে তার ঘাড়, বুক ঘেমে উঠেছে। কস্তুরী বলে ডাকছে অর্থাৎ নারীই হবে। কিন্তু এই দুর্গম জঙ্গলে? ···খাজান তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল। অবশ্য, দুনিয়ার সমস্ত অগম্য স্থানেই তো নারী বিরাজমান।

খাজান তাকিয়ে রয়েছে। রুদ্ধশ্বাস। ক্ষুধা তৃষ্ণা, এই মুহূর্তে লোপাট হয়ে গিয়েছে। বার দুই বাঁশির মতো ডাকেও ভিতর থেকে সাড়া মেলে না।

অরণ্য বড়ই নির্জন লাগছে। নির্জনতা মাঝে-মাঝে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। বৃদ্ধের ছায়া কাঁপতে লাগল। খাজান দুটি চোখে বিস্ফোরণ অনুভব করল। গাছের নিকষ

অন্ধকার থেকে বছর বিশেকের একটি যুবতী বেরিয়ে এল। ডাগর, ঝামা পাথরের মতো রং। কিন্তু তামাম শরীরে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নাকে নথ। শরীরে তেমন আব্রু নেই। দুটি চোখে থরোথরো লজ্জা।

—এই আমার কস্তুরী। বৃদ্ধের গলাতে সোহাগের তারল্য, আয়—ইদিকে আয়।···

কস্তুরী নিচু করে আছে মাথা। শরীরের নিকষ অন্ধকার থেকে যেন আলো কিরণ তুলছে। ঝলসাচ্ছে ললিত আগুন। খাজান তাকালো। তার বড়ো আপশোস, এতদিনের জীবনে সে একে খুঁজে পায়নি ? শরীর তো নয়, কলজেতে আগুন ধরাবার কাঠখণ্ড। সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেজস্ক্রিয়তা।

—বেচারী জলের জন্য ধুঁকছে। বৃদ্ধ বলল, তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তবে সামিল হই···

তিনজনে মুখ চাওয়াচায়ি করল। খাজান বলল, কে হয়গো তোমার ?

—পরিবার। অন্ধের যষ্টি। বৃদ্ধ হাসল, হাসির মধ্যে বিশেষ অর্থ ফুটে ওঠে, শরীরে নাই বল—ডাগর যুবতী করে টলমল—

ভারি অবাকই হলো খাজান। মরণাপন্ন বুড়োর কপালে ডাগর যুবতী ! আবার সে কস্তুরীর দিকে তাকালো। খাজানের চোখে চোখ পড়তেই, কস্তুরী মাথা সরিয়ে নিল। তার মুখে রক্তিম আভা, ভোরবেলার পূব আকাশের মতো। যে আভা মধ্য দুপুরে আগুন হয়ে ঝলসায়। কলজে খাঁক করে।

খাজান বলল, চলো—আমাদের কুনো আপত্তি নাই।

আকাশের বুক থেকে আগুনের ডেলা সরে যাচ্ছে। পশ্চিমে তার ঢাল, মসৃণ গতিপথ। পূব পশ্চিমে একবিন্দু মেঘ নাই। আকাশের তরল নীলে এখনো বিভীষিকা।

রোদে হাঁটতে কষ্ট হবে না ?

সহসা কস্তুরী হাসতে লাগল। বাদামি পুরু ঠোঁটের ফাঁক থেকে মুক্তোর দানার মতো দাঁত বেরিয়ে এল, কষ্ট কেন ? জল পাব জানলে যোজন যোজন হাঁটতে পারি···

—এখনো তো ঢের দূর।

কস্তুরী হাসি থামালো না। সম্ভবতঃ পুরুষ দেখে তার ভিতরটা উল্লসিত। দু-চোখে বিদ্যুতের ছোবল তুলল। খাজান যেন ধীরে ধীরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সামনে আরো খাড়াই। আরো বিপজ্জনক গতিপথ। দুধারে খাদ। নিচে অতল জমি। তাকালে মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে।

—জঙ্গলে মানুষ থাকে নাকি ? বাঘভাল্লুকের বড়ো ভয়—কস্তুরী বলে এগিয়ে গেল।

—সমতলে তো আরো বাঘভাল্লুক—

—বাঘভাল্লুক ?

—হাঁ। তারা বড়ো ভয়ংকর—

এবার খাজানের ইঙ্গিত ধরতে পারল কস্তুরী। মুহূর্তের জন্য রক্তিম দেখালো মুখ। অতঃপর স্বাভাবিক হয়ে এল মুখমণ্ডল। দুচোখে ভেসে গেল দুটি বলাকা—বড়োই উদাস সে ঘরে ফেরা।

খাজান চুপ করে রইল। কস্তুরীকে দেখে অবাকই হচ্ছিল। বিশেষ করে পিচ্ছিল চেহারার যুবতীর এই দশা দেখে। মনে হচ্ছিল, একেবারে সর্বনাশের গভীর কুয়োতে ফেলে দিয়েছে তাকে।

—তা মরতে বুড়োর সঙ্গী হলে কেন ? খাজান কস্তুরীর দিকে তাকালো। খাজানের কথাতে কস্তুরী বড়ো অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ল। সে দ্রুত এগিয়ে গেল।

খাড়াই ততোধিক নিচু, বড়ো সংকীর্ণ দেখাচ্ছে রাস্তা। পাহাড়ের আশপাশে পাথরের চাঙর, বুনো গাছ। অবতরণে ক্লান্তি কম। জানকী সবার আগে, মাঝে তিনজন। পাঁচজনের দলটি বিধ্বস্ত। তথাপি অবতরণ থামে না। সঙ্গী বেশি হওয়ার দরুন দলে গতি। সহসা অরণ্যের বুকে খসখসানি ওঠে। ভিতরে ছায়া কাঁপতে থাকে। খাজান সচকিত হলো। তাকিয়ে দেখল, ভিতরে ঝটাপটির শব্দ। দশরথের ছুরিতে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে হরিণ। হরিণটি শিশু। তাকে তুলে নেয় কাঁধে, দশরথ। তামাম জঙ্গলে সোরগোল ওঠে। পাখির ঝটাপটি। খাজান, কস্তুরী চোখ চাওয়া-চায়ি করে।

—খাসা শিকার হয়েছে রে।···জানকীর গলাতে রীতিমতো উল্লাস। থরথর করে কাঁপে তার পেশল গলা।

তপ্ত বাতাসের এক ঝটকা উড়ে আসে খাজানের বুকে। তপ্ত বুক আরো তেতে ওঠে।

দশরথ আর জানকী লাফাতে লাফাতে নিচে নামতে থাকে।

কস্তুরী অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছে। খাজান দেখল, একটি আগুনের হলকার মতো সে নেমে যাচ্ছে। নিচে নামতে নামতে শরীর মোচড় দেয় খাজান। আগুনের হলকার দিকে ধাবিত হয়।

—কদিন বাদেই দেহ রাখবে বুড়ো। তখন তো হরিণশিশুর মতো ছিন্নভিন্ন হবে—

চোখ তুলে, শরীর ফণার মতো বাঁকিয়ে তাকাল কস্তুরী ; দুচোখে অদ্ভুত আর্তির ভাষা।

—শিকারির ভয় পাই না।···কস্তুরী প্রায় ছুটতে ছুটতেই বলল। তার চোখে নীল বিদ্যুৎ শিখা। তাতে কিছুবা ঝড়ের ইঙ্গিত।

খাজান তার পিছু ধাবিত হয়।

আরো নিচে নামতে থাকে পাঁচজনের দলটি। বৃদ্ধকে ধরে ধরে নামায় জানকী। পাহাড় ক্রমশ ভঙ্গুর। পশ্চিম প্রান্তে রক্তের স্বাক্ষর। পাখিরা বড়োই ক্লান্ত, ঘরে ফেরার তাড়া তাদের। তামাম চত্বরে বেলা শেষের প্রস্তুতি আছে। অস্ফুট আলো অন্ধকারে পাঁচজনকে বিচিত্র দেখায়।

—হক কথা বলি। অমন খাসা ডাগর যুবতী হয়ে বুড়োর গা আঁকড়া হলে কেন ? প্রশ্ন করেই, খাজান তির্যক দৃষ্টি ছুঁড়ে মারে।

—না আঁকড়া হয়ে উপায় কী ?

—উপায় নাই মানে।

—সে অনেক কথা।

—সে অনেক কথার মানে কী ?

স্থির চোখে তাকাল খাজান। সে অনেক কথার মানে কী ? নিথর প্রস্তরভূমিতে মাথা ঠোকে সে। প্রস্তরভূমি যেন হাসে, জবাব দিতে পারে না।

—ঝড়ের মতো হেঁটো না। বুড়োর গতি ভালো না—

—প্রাণে মায়া আছে তা'লে।

বৃদ্ধ রুইদাসের ভঙ্গুর মুখে বেলা শেষের রোদ বেঁকেচুরে পড়েছে। টলটল করছে কমলা লেবুর রঙ। নরম আচে আক্রমণ নেই। বড়ো দয়াপরবশ, এই রোদের আলো।

ব্যাকুল খাজান নিজেকে খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে ঘাম ভিজিয়ে দেয় সারা-শরীর।

—সে কথার মানে কী ?

কস্তুরী ঝটকা মারে। তারপর ঝিলিক তোলে চোখে, বনে কাঠ কেটে সোমসার (সংসার) চলতো। বাপকে বাঘ নিয়েছিল আগেই। মা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল। ফেরে নাই। তখন বুড়ো রুইদাস আমাকে আশ্রয় দিল।···

—কিন্তু বুড়ার শরীর নাই। কলজে নাই। হাড় কাঠি-কাঠি।

কস্তুরী অপলক চোখে তাকালো। সূর্যাস্ত নতজানু তার চোখে মুখে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে তা পড়ছে চিবুক থেকে।

বৃদ্ধ রুইদাস সহসা আর্তনাদ করে উঠল। জানকীর পেশীবহুল হাতে হাত রেখে বসে পড়ে। অতঃপর ফিস্‌ফিসানি জাগে ফ্যাকাসে ঠোঁটে, জল আর কদ্দূর হে—

—এলো বলে।

—কস্তুরীর বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

খাজান আর কস্তুরী চোখাচুখি করল। খাজানের বুকে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। সে বলল, চকমারির বেশি দূর নাই—

তামাম দুনিয়া অন্ধকার। পশ্চিম কোণে লাল আভা অন্তর্হিত। সমভূমির বুকে দাঁত বসিয়েছে নিকষ অন্ধকার। আকাশও। উজ্জ্বল তারারা ঝিকমিক করে কস্তুরীর চোখের মতো। এবার সমভূমির বুকে নামতে লাগল তারা। প্রান্তরে এসে থমকে দাঁড়ালো খাজান। এর নাম চকমারি। জানকী বলল, মাঠ ডিঙোতে হবে হে—

রুইদাসকে বড়ো সঙ্গিন দেখাচ্ছে। কস্তুরী তার হাত ধরতে যেতেই, খাজান হাসল, বুড়োকে নিয়ে ঢং ত্যাখাচ্ছ নাকি ?

অন্ধকারে কস্তুরী খাজানের দিকে তাকাল। অন্ধকারে কিছু ঠাহর হয় না।

রুইদাস শ্বাস ছাড়ল। অন্ধকারে শব্দ শোনা যায়। হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কস্তুরী, রুইদাস তাকে ফিরিয়ে দেয়, তুই যা। আমার অত তেষ্টা নাই। জল আনতে পারলে আনিস···

অন্ধকারে কস্তুরীর চোখ তল্লাস করল খাজান। বারবার তাকালো। এগিয়ে এল। রুইদাস তখনো বলছে, বিকারগ্রস্তের মতো, তুই যা—কস্তুরীর চোখ প্রান্তরে। কিন্তু মনে দ্বিধা। সে সামনে এবং পিছনে তাকালো।

—তোমার বুড়োর জন্য দশরথকে রেখে গেলাম।

কস্তুরী প্রান্তরে পা বাড়ালো।

প্রান্তর ধূ-ধূ লাগে। পূব কোণে চাঁদ। নিকষ অন্ধকারের শাখা-প্রশাখা মাটি থেকে উড়ে যাচ্ছে। কীরকম ঘোর-জাগা নিশির মতন। আলো-আঁধারির ঘোর খাজানকে অস্থির করে তুলেছে। এমন নারীসঙ্গ সে কখনো পায়নি। এমন শুনশান রাতও। কস্তুরী এই আলো আঁধারির জাল ছিঁড়ে এগোতে থাকে।

খাজানের মতো অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেতে তার ভয় করে উঠেছিল। কিন্তু তেষ্টায় তার ছাতি ফাটছে। তৃষ্ণা তাকে সাহসী করে তুলেছে।

—আমাকে ভয় করছে ? খাজান কস্তুরীর দিকে তাকালো। তাকিয়ে মুখ সরিয়ে নিল।

—নাহ! ভয় কীসের?

এইবার খাজান হাসল, ভয় এই আলো-আঁধার—এই শুনশান—কস্তুরী মিহি শব্দে হাসল। ঘোর-জাগা আলোতে তার দাঁতগুলি উদ্ভাসিত হয়। বলে, এমন নিশি-জাগা রাত অনেক দেখেছি। দুজনের মধ্যে ফারাক কমতে থাকে। দশরথ আগে আগে হাঁটছে। খাজান রীতিমতো টলছে। তুলনায় কস্তুরী অনেক স্বচ্ছন্দ। মাটি পোকার মতো সে উড়তে উড়তে চলে।

প্রান্তর যেন কাছে ডাকছে। হাতছানি দেয় গোপনতম ইঙ্গিত-সহ। বুকের ভিতর ঢুকিয়ে সোহাগে দলে মুচড়ে দিতে চায়।

নিথর প্রান্তরে, নারী শরীরের গন্ধে খাজান মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। নারী শরীরের কী রকম গন্ধ? মৃগের নাভির মতন?

বুভুক্ষু খাজান আরো টলতে লাগল।

সহসা দশরথ আঙুল তুলে জানান দিল, ওই যে—ওই যে—

কস্তুরীর চোখ সহসা ব্যাকুল দেখাল। খাজানের দিকে তাকিয়ে অস্থিরভাবে বলল, আর কতদূর। গলা বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

—আর বেশি দেরি নেই।

শিরদাঁড়ার মতো খাল বহে গিয়েছে। মৃদু জল। কাছে যাওয়ার আগেই চিৎকার ভেসে এল। দশরথ চিৎকার করছে। আতঙ্কে পিছিয়ে আসছে। খাজান দেখল, সরু খালে নেমে আসছে প্রমত্ত হস্তী দম্পতি। জল খাচ্ছে, শুঁড় দিয়ে জল ছেটাচ্ছে।

আরো আসছে দলে দলে, পালে পালে। কয়েক পলকেই, হাতির দল দখল করে নিল খাল। পাল-পাল হাতির বুকেও তৃষ্ণা।

দশরথ বোকার মতো ছুটে যাচ্ছে। চাঁদের আলোতে হাতির দাঁত ঝলসাচ্ছে। তাদের সঙ্গে যুঝবার শক্তি খাজানদের নেই।

—ফিরে যাই, চলো—কস্তুরী কাঁপন ধরা গলাতে বলল। দু চোখ রুদ্ধশ্বাস।

—পাগল আর কি!

হাতিদের চিৎকারে তামাম তল্লাট কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঝড় নামতে থাকে তাদের বিশৃঙ্খল ডাকে।

এ পারে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজনে। চিক্‌চিক্ জল দেখে খাজানের বুক ভেসে গেল। সে খুব রেগে গেল। হাতিদের ঈর্ষা করতে লাগল।

তার ভয় হতে লাগল।

সহসাই, খাজানের মাথাতে বিদ্যুতের নীল শিখা জলে উঠলো। কোচর থেকে বের করল দেশলাই। সমতলভূমি থেকে কেনা। মরা গাছের ডালে আগুন ধরাতেই দাউদাউ করে জলে ওঠে ডালপালা। আগুনের জিব লকলকিয়ে নাচতে থাকে। বনভূমি আলোকিত হয়।

অবশেষে মানুষের বুদ্ধির জয় হলো। হাতিগুলি ফিরে যেতে লাগল। কস্তুরী এতক্ষণ বাকরুদ্ধ ছিল। সে এবার বিস্ময় ভেঙে হেসে উঠল। খাজান তাকে টেনে নিয়ে এল জলাশয়ের দিকে। দুজনে, টলতে টলতেই জলাশয়ের দিকে এগিয়ে এল। নিষ্পাপ শিশুর মতো, স্তন্যপানের মতো গলা পর্যন্ত জলপান করে। মুসোতে জল ভরতে ভরতে খাজান বলল, আরো জল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আরো—আকণ্ঠ পিপাসা তৃপ্তির পর দুজনে টলছে। কস্তুরীর নরম করমচা পাতার মতো চোখের পাতা বুজে আসছে, নেশায়। খাজান তার একটি হাত ধরল।

প্রান্তরে নেমে এসেছে চাঁদের কণা মাখানো রাত। ঝিকমিক করছে নক্ষত্রগুলি।

খাজান রীতিমতো সম্মোহিত। কস্তুরী বেগ সামলাতে পারছে না। খাজানের হাত শক্ত করে চেপে বলে ওঠে, ছাখো—ছাখো—

চোখ ফেরালো খাজান। জলাশয়ের ওপারে এক হরিণ দম্পতি। তাদের মসৃণ পিঠে গড়িয়ে পড়ছে চাঁদের আলো। জল খাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে। আবারো ফিরে আসছে। পুরুষ হরিণটি হরিণীর পিঠে নাক ঘষছে। মৃগনাভির গন্ধে পৃথিবী ভরে আসছে। হরিণীর নাভিতে কী কস্তুরী? চাঁদ মাখানো রাতে ওরা মিথুন ক্রীড়াতে মেতে ওঠে।

খাজান অভিভূত। কস্তুরীকে বাহুলগ্ন করে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে থাকে অবিকল হরিণ দম্পতির মতো। নাভি, স্তন, উরু যুগলে। কলজের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় ঘ্রাণে, সম্ভোগে। এ এক পূর্ণ তৃষ্ণা নিবারণ। চরাচরে পড়ে থাকে দুটি নরনারী। চাঁদ তাদের উপর মায়াজাল বিছিয়ে দেয়।

হয়তো আবার মেঘ দেখা দেবে আকাশের হৃদয়ে। বৃষ্টি সম্ভবা মেঘ প্রার্থনার ভঙ্গিতে ছড়িয়ে পড়বে আকাশের কানায় কানায়। সেদিনের প্রতীক্ষা করবে মানুষ। মাটির তৃষ্ণার ক্ষান্তি হবে। আবারো জলে উঠবে মাটির বুক। আবার ওরা বেরিয়ে পড়বে জলের সন্ধানে। কিন্তু মানুষের পিপাসা এমনি জলপানে মেটে না। সে অনেক গভীরের দিক। অনেক অতলান্ত। সে তৃষ্ণায় জল খুঁজতে মানুষ চিরদিনই তীব্র অনুসন্ধানী।

ভূমিশয্যা থেকে উঠে খাজান বলল, চলো। ওদের তেষ্টায় ছাতি ফাটছে—

নিতাই জানার কবিতা

দেবারতি মিত্র

নিতাই জানার কবিতায় বাঙালি ঐতিহ্য এবং লোকজীবনের ছাপ খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। নিতাইয়ের প্রথম কবিতাটি লক্ষ্যণীয়। তার কবিতায় রাধাকানু, পদাবলী, গাজন, শিব, নূপুর ইত্যাদি যেমন এসেছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ঘামসা, মাদল, নাকছাবি, দুধলিলতা, ধানচুর প্রভৃতি শব্দ। এইসব শব্দের রঙ-বেরঙের সুতোর নির্ভেজাল গভীর দিশি আবহাওয়া একটা নিজস্ব বুনোট সৃষ্টি করেছে। 'মুখোশ' কবিতাটি থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর এই শিল্প বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় দেওয়া হলো, তা কিন্তু তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই পাওয়া যাবে। নিতাই এইভাবে একটি নিজস্ব আকাশ ঘন করে এনেছেন তাঁর কবিতায়।

নিতাই পুরোপুরি বাঙালি কবি হয়েও কতটা মৌলিক এবং কতটা সীমানাহীন দেশের অধিবাসী, তার একটি নমুনা দেওয়া যাক—

'পাথর নড়ে না ছায়া চাপা স্বপ্নে হাঁটে
পা দুটি সবুজ পাকা ফসলের রাগে
ছায়া পথ ঘুরে সেইখানে তুমি থামো'

এর একটি লাইন পরেই রয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গানে সম্মোহিতা সেই জননী ও শিশুর বিখ্যাত অনুষঙ্গ—

'মা ভুলে কুয়ায় শিশুকে কলসি করে'

এখানে তাঁর কবিতার রসগভীর ধারা চিরন্তন বাঙালি সংস্কৃতির নদীতে এসে মিশে গেছে। কিন্তু তার পরের দুই লাইনে নিতাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দূরত্ব রচনা করেন—

'ঝাউ ও সাগরে মজে যান পদকার
আমি তুমি ভেঙে ফের জুড়ে ভাসি জলে'

নিতাইয়ের আঁকা একটি অনবদ্য ছোট্ট ছবির কথা বলি—

'তুষ আর গোবরে গড়া পিটুলির রেখায় মেয়েটি
কাঠগোলাপের নিচে জেগে আছে মরণ রাতুল।'

এই সময়ে বসে তুষ আর গোবর দিয়ে পিটুলির রেখায় রেখায় এমন একটি মেয়েকে

এত সহজে নিতাই ছাড়া আর কেউ বানাতে পারতেন বলে জানি না। এই মেয়েটির রূপপ্রতিমা যদিও গ্রামের চিরাচরিত টুসুর, তবু নিতাইয়ের অভ্রান্ত শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময় জাগায়। দু লাইন পরেই আবার সেই মেয়ে অনেক দূরে, পরাবাস্তবের দিকে চলে যায়—

'…সে মেয়ের নখ
জলের ভিতরে নড়ে : আসি সই',

'গুহা' কবিতায় এই পৃথিবীরই আরেকটি মেয়ের মর্মবর্ণনা—

'একটি মেয়ের ভোর হয়ে ওঠা মুখ'

নারীটির মুখের জলে ধোয়া ছায়া, নিষ্পাপ কারুণ্য এবং কবির প্রতিফলিত হৃদয় আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'…ঝেঁপে আসা রাঙা রোদ
পিঠ ঘাড় বেয়ে ভরে দেয় খালি কোল।'

এই নতুন ধরনের মাতৃমূর্তির পিছনে যেন লালচে বিধুর সূর্যোদয়ের চালচিত্র। কিন্তু খালি কোলে কি কোনোও শিশু আছে? যে শিশুর কড়িবসা মুখচোখ? এ মেয়ের সম্পূর্ণ ছবিটি জীবনের ঘনত্বে, রহস্যে, হাহাকারের রূপকথায় আঁকা।

'বারোমাস্যা' কবিতায় নিতাই তালপাতার পুঁথির কথা বলেন—আসলে তালপাতার পুঁথির মধ্য দিয়ে কবি দেখতে পান বহুদূর সময়, সময় যেন ঢেউয়ের মতো বয়ে যাচ্ছে।—

'প্রতিটি পাতার শেষে খড়মের ছবি, নিবেদিত স্বর' কিন্তু তার মধ্যে দেখা পাওয়া যায় বিপরীতের, জীবন্ত উত্তাপের—'দীপনেভা ধোঁয়া ঝাঁজ গুমরে উঠলো।' পরিণামে কিন্তু 'পোকা গোল গোল দাঁতে রাখে উপহার'—এই কি আমাদের জীবনের এবং সময়ের শেষ আঘাত, শেষ উপহার? নিতাই কি তা জানেন, জেনেও মগ্ন হন ঢেউ তোলা ধান শিষের আদিম শ্যামলতায় ও শিহরণে?

নিতাই জানার পাঁচটি কবিতা

মুখোশ

ঘন কালো মেঘ তুলে যত সখী গোল হ'য়ে ঘুরে ;
রাধাকানু ঢেকে গিয়ে ফের ফোটে ধানীরঙা চাঁদ।
সুঠাম হাতের ঘায়ে মেঘ ডাকা ধামসা মাদল
ঝুরামাটি পদাবলী বুনে দেয় চাষীর মতন।

আয় মেঘ আয় মেঘ : গাজনের শিবের মাথায়
মেয়ে ঢেলে দেয় জল ছেলে নাচে শিব ঘুরে ঘুরে।
মুখোশের মুখগুলি হাসে, নাচে ; সখার আদর
দুর্বলিলতার বনে নাকছাবি চুমায় কাজল।

ছেনি কেটে ভাঁজ তোলা আশরীর ; মেঘের মতন
ঝলসানো নাচ তুলে জেগে থাকে কামিন পাথর।
আর ধুলো ঝেঁপে নামা মেয়েদের মিনতী নুপুর
ফসলের কথা ব'লে ঘুমে ভাসে বরষা মাথায়।

মাটি মরে ; জল ঝরে : মেঘ ঢাকা মুখোশের রাত
ভেজা শাড়ি মেলে রাখে, মুখে হাত চেপে কুলুকুলু
যত সখা কাছে আসে ঘুমে পাওয়া ধান চুরচুর
সুর তুলে মাঠ ভাঙে, পিছু ডাকে শাঁখ তুলে ফুঁ…

কুমারী

দোলার পিছনে ঢেউ, শয়ে শয়ে মাটির কুমারী :
ঝলমল চুড়ি, শাড়ি ; পাটে রাঙা রোদের ছায়ায়
ছলকে উঠেছে গান আবাহনী ; এঁকে বেঁকে পথ
নদীটির দিকে ছুটে নদী মানে তাদের সোদর :
তুষ আর গোবরে গড়া পিটুলির রেখায় মেয়েটি
কাঠগোলাপের নিচে জেগে আছে মরণ রাতুল,

কাজল কামিন সুরে সখী সব ডাকছে : এসোগো,…
মেয়েটি বলে না কথা ; তুষ ঝরে মাঠের ভিতর ;
গোবরের ছায়া নামে ন্যাড়াক্ষেতে, সাদা-লাল আভায়
কাঠগোলাপের ফুলে মেঘ সাজে, সে মেয়ের নখ
জলের ভিতর নড়ে : 'আসি সই' ; ঢেউ তুলতুল :
ফেনার ভিতর ফোটে ধানমুখী জিয়ন ঝিয়ারী।

গুহা

দরজা খুললো : বাঁকা ঝকঝকে রোদ
ধারালো ঝরনা শিশুদের ভিড়ে মিশে
কড়ি খেলবার ঘর খোঁজে কড়ি চোখে
পাতাও নড়ে না, শুধু কোলাহলে ভিজে
গুহা ঘুরে যায় হাতে হাত ধ'রে গোল।

গুহা থেমে যায়, ছায়াপথ বেয়ে নামে
একটি মেয়ের ভোর হ'য়ে ওঠা মুখ।
শিশুরা ছুটছে ; ঝেঁপে আসা রাঙা রোদ
পিঠ ঘাড় বেয়ে ভ'রে দেয় খালি কোল।
মেয়ে হাত রাখে কড়ি বসামুখ চোখে :

ঝরনা নামলো, পাথরের সাজ ভিজে
গ'লে গ'লে যায় কড়ি ঝরা গুহা মুখ,
মেয়ে থেমে আছে যেন সে কড়ির থামে
পাড়া জুড়ানোর ঢেউ তোলা ধান শিষে।

সীমা

চোখে ছায়া ফেলে উঠে আসা কাঁপা মুখ
শ্বাসে ভ'রে যায় চুল ঝাঁপা ঝুপড়িতে
তোমার চোখের ছায়া চুমে নীল কায়া
উজিয়ে বসেছে আঁজলায় নত মুখ

একটি নদীতে মিশে যায় আরো নদী
যেন আকাশের বিপরীতে কাটা লিপি
রঙ ধুয়ে যাওয়া পাথরের কারুকাজ

পাথর নড়ে না ছায়া চাপা স্বরে হাঁটে
পা দুটি সবুজ পাকা ফসলের রাগে
ছায়াপথ ঘুরে সেইখানে তুমি থামো
গাই নেমে আসে হাতিও নামছে শাদা
মা ভুলে কুয়ায় শিশুকে কলসি করে
ঝাউ ও সাগরে মজে যান পদকার
আমি তুমি ভেঙে ফের জুড়ে ভাসি জলে

বারমাস্যা

জল দিয়ে লেখা পুরাতন তাল পুঁথি।
কে লিখেছে নাম নেই, বর্ষা আর মেঘ :
ছায়াটুকু ধ'রে আছে ছেঁড়া জরি পাড়,
পেছনে আভাস রেখে গেছে দিনলেখ।

প্রতিটি পাতার শেষে খড়মের ছবি ;
নিবেদিত স্বর, দীপ নেভা ধোঁয়া ঝাঁজ
গুমরে উঠলো, যেই এলো খোলা হাওয়া
ময়লা আঁচলে আরো মুখ ঢাকে কবি।

বারোটি পাতায় ধুলো জমে যাওয়া নতি :
চাঁদের কপালে চাঁদ ডোবা কারু কাজ,
অবিরল জলে পাতা না পড়ার রাত ;
পোকা গোল গোল দাঁতে রাখে উপহার।

বছরের পর বছরের আসা যাওয়া ;
জল দিয়ে লেখা : পাড় ভাঙা জল আঘাত।

জনসাধারণ

পরিমল রায়

[মাঝে মাঝে পুরাতন লেখায় নজর দেওয়া একটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। নিচের লেখাটি পরিমল রায়ের। লেখাও প্রায় ৪০/৪৫ বছর আগের। সে সময় পরিমল রায় নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের লেখক অর্থনীতির ছাত্র এবং শিক্ষক ছিলেন। মৃদুভাষী এবং সতর্ক দৃষ্টি তাঁকে বাঙালি সমাজের একজন অসাধারণ কথক হতে সাহায্য করেছিল। এঁর একটি মাত্র বই আমি পেয়েছি 'ইদানীং'। যত্ন করে রক্ষা করছি। আমার পুত্র তাতে একটা ছাপ মেরে দিয়েছে "এই বইটি দেওয়া হয় না"। বাঙালি জন-সাধারণ সম্বন্ধে এই কৌতুক লেখাটি আজো প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে। হাস্যরসের ধারাটি যখন বাঙলা সাহিত্যে ক্ষীণ হয়ে আসছে তখন পরিমল রায়ের লেখা দারুণ গ্রীষ্মে বৃষ্টি ধারার মতো স্নিগ্ধ বলে মনে হবে। — স. বি]

সংখ্যা-শাস্ত্রে 'র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্‌প্লিং' বলিয়া একটা কথা আছে। নমুনা পরীক্ষা করিয়া একটি সমষ্টির দোষ-গুণ বিচার করিতে হইলে নমুনা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ফেরিওলার নিকট হইতে আম কিনিবার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বন্দ্বটা ভাবিয়া দেখুন। নমুনা দেখাইবার জন্য ফেরিওলার দু'একটি আম নির্ব্বাচিত হইয়া আছে। সে উহাই তুলিয়া ধরে ও ছুরি দিয়া কাটিয়া দেখায়। ক্রেতা তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। সে যে-কোনো একটি উঠাইয়া লইয়া চাখিয়া দেখিতে চায়, কারণ আসলে উহাই প্রকৃষ্টতর পরীক্ষা। নির্ব্বাচন এড়াইয়া নমুনা সংগ্রহের নাম 'র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্‌প্লিং'। নমুনা যত নির্ব্বাচন-বর্জ্জিত হইবে, সমষ্টির বিচার তত খাঁটি হইবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইবার কারণ নাই।

শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের একটা র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্প্‌ল্ কী প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত হইতে পারে, একদা সেই কথা ভাবিতেছিলাম। পাছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পড়িয়া যাই, তাই প্রথমে মোট জনসংখ্যা হইতে অহিন্দু অংশটা বাদ দিয়া ফেলিলাম। অতঃপর চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কাঁচা ও পাকা আমের র‍্যাণ্ডম্ নমুনা অর্থহীন। সুতরাং পুনরপি ছাঁটিতে হইল। হরিজন বর্জ্জন করিয়া যাহা দাঁড়াইল, তাহা লইয়া আবার আরেক ফ্যাসাদ! স্ত্রীলোক রহিয়া গেল যে! উহাদের সংস্রবে যথাসম্ভব না আসাই ভালো। কাজেই তৃতীয় দফায় কাঁচি চালাইতে হইল। দেখিলাম, সংখ্যাটি এখন অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। এবারে বালকগুলিকে খেদাইতে

হইবে। উহারা আবার জনসাধারণ কি? খুন করিলেও যাহাদের ফাঁসি হয় না, তাহারা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বালক অন্তর্হিত হইয়া বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে যে সংখ্যাটি প্রকট হইল, তাহার আয়তনটি বৃহৎ নহে।

এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হইল, এতগুলি বিয়োগ অঙ্ক এই বয়সে অনর্থক করিলাম। র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্প্‌ল্‌-এর জন্য ইহার দরকার ছিল না। বাংলা দেশে যে-কোনো ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীতে যে কয়টি যাত্রী পাওয়া যায় (হালের কথা নহে, বলা বাহুল্য) তাঁহারাই শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের অনির্ব্বাচিত নমুনা, অর্থাৎ র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্পল্। এই অতি সহজ পন্থাটি যে কেন মনে আসে নাই ভাবিয়া পাই না। মনে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্যার সমাধানও হইয়া গেল। কারণ রেল-ষ্টিমারের মাধ্যমিক জগৎ আমার অপরিচিত নহে।

শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণ লেখাপড়া-জানা লোক। কিন্তু লেখার অর্থ চিঠি লেখা এবং পড়ার অর্থ সংবাদপত্র পাঠ। দৈনন্দিন জীবনে লিখন ও পঠন এই দুইটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। মাসিক-পত্রাদি কিংবা দু একখানি গল্প-উপন্যাস যে একেবারেই কেহ পড়েন না, তাহা নহে। তবে, উহা সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে, সাহিত্যানুরাগের জন্য নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা সাহিত্যিক-মতামত-বর্জ্জিত বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি এবং শরৎচন্দ্র অপরাজেয় কথাশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন সে-রকমটি আর কোনো কালে হইতে হয় না, ইহাও তাঁহারা প্রত্যেকে জানেন। রবীন্দ্রনাথও কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। বিবাহের উপহার দিতে হইলে এক খণ্ড 'বলাকা' কে না কিনিয়া দেয়? উহাতে কী উচ্চশ্রেণীয় সব কবিতা! আর সেই যে "বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস"? উহার মতো আর কিছু আছে নাকি? শরৎচন্দ্রও নমস্য। ক্যারাক্টার ফুটাইতে এমনটি আর কে পারিল?

কবিতা ইহারা কেহ পড়ে না। কারণ, কবিতা এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের উপজীব্য। অপেক্ষাকৃত প্রবীণের মধ্যে যাঁহারা একটু কাব্যামোদী, তাঁহারা অতখানি ছাড়িয়া দিতে রাজী নন! তাঁহারা "দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে, দাঁড়া রে যবন" বলিয়া ঈষৎ উত্তেজিত বেগে মস্তক সঞ্চালন করিয়া থাকেন।

বিচার বিশ্লেষণাদির প্রতি ইহাদের কোনো পক্ষপাত নাই। মানিয়া লইতে পারিলে আর কথা নাই। এই শিরোধারণ প্রবৃত্তি দেশের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। "গীতায় আছে—" তবে তো মিটিয়াই গেল। "উপনিষদ বলে—" আর

কথা কি? ইহারা শ্রোতার দল। যাঁহারা বক্তা, তাঁহারা কোথাও কোনো বিদ্বানের আলোচনা শুনিয়া থাকিবেন। যাহা কর্ণগোচর হইয়াছে তাহার কিছুটা তাল-গোল পাকাইয়া মাথায় রহিয়া গিয়াছে। ফলে, বর্ণাশ্রম—সনাতন—দ্বৈত-অদ্বৈত—তৈত্তিরীয়—ছান্দোগ্য—খনা—গার্গী—রামমোহন-কেশব সেন ইত্যাদি শব্দচ্ছটা বিকীরণ করিয়া গোয়ালন্দ না পৌঁছানো পর্য্যন্ত অনর্গল বকিয়া যান। শ্রোতার দল মুগ্ধ হইয়া শোনে। মনে মনে বলে, লোকটা পণ্ডিত।

ইহারা মোটামুটি ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। যাঁহাদের তারুণ্যের ছোঁয়াচ এখনো কাটে নাই, অথবা অকালে লাগিয়াছে, তাঁহারা পথে কালী মন্দির পড়িলে কপালটা অন্ততঃ একবার চুলকাইয়া লন। দৈবে প্রবল বিশ্বাস। ষ্টিমারে স্টেশনে স্বপ্নলব্ধ মাদুলির অজস্র বিক্রি। দুই আনা দাম বলিয়া কাহারো গায়েও লাগে না। দু এক জন মুখে বলেন, উহা বুজরুকি। কিন্তু কাজে ব্যতিক্রম হয় না, যদিও সাফাই স্বরূপ বলেন, টাকাটা ভাঙাইয়া লইলাম আর কি। দশটা-পাঁচটার তাড়ায় পূজা-আহ্নিক-বর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মটা এখন তেত্রিশ কোটিকে ঘিরিয়া একটা ব্যঞ্জনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নব্য, শিক্ষাভিমানী ও সংস্কারমুক্ত তাঁহারা—নিজেদের অজ্ঞাতসারে—অন্যান্যদের মতোই অন্ধ বিশ্বাসী। "শাস্ত্রে বলে—" বলিলে তাঁহারা হাসিবেন, কিন্তু "বিজ্ঞানে বলে—" বলিলে আর আপত্তি নাই। একটা কিছু অবলম্বন চাই, তারপর উহার নামে যাহা খুশি চালাও, দ্বি-রুক্তি হইবে না। যদি বলা হইল, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশিপালন পঞ্জিকামতে প্রশস্ত, ইহারা হাসিয়া আকুল হইবেন। কিন্তু যদি বলা যায়, চন্দ্র-সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্র মথিত হয় আর তাহারই হেম্মা-টেন্সা-হাইড্রেশনে শরীরের ফ্যাগোসাইটো-গ্লোবিয়ার ক্যাটাবলিজম্ নিবন্ধন শরীর অসুস্থ হয়, এবং সেজন্য রাত্রে অনাহার প্রশস্ত, তাহা হইলে আর মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। ইহারা পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন নাই, পুত্তলিকার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। ইহাদেরই একজন ট্রেন-শুদ্ধ লোককে তুষ্ণীভূত করিয়া দিয়া বলিতেছিলেন, "আরে মশাই, আমাদের দেশের কথা আর বলেন কেন? এই ধরুন না, এ মাসটা যাচ্ছে মলমাস। মাসে দুটো অমাবস্যা পড়লো তো পুজোপার্ব্বণ বন্ধ! এই সব কুসংস্কারের জন্যেই তো—"। হিন্দু জ্যোতিষ কি কারণে মলমাসের কল্পনা করিয়াছে, তাহা যাঁহাদের জানা আছে, আশা করি তাঁহারা এই অর্ব্বাচীনকে ক্ষমা করিবেন।

গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার অভ্যাসটা যেন একরকম অসম্বরণীয়। ট্রেনে-

ষ্টিমারে কদাচিৎ কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। যাঁহার যেখানে বাস, সেখানে দুগ্ধ-মৎস্যাদি সুলভ কিনা তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইদানীং যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এ প্রসঙ্গটি আরো প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যুদ্ধটাও আলাপের একটি নূতন বিষয়। তবে বিশদ আলোচনায় ভূগোল-নিষ্ঠা দেখা যায় না। যিনি আলাপে যোগদান না করিয়া আপন মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, তিনি বিনামূল্যে পাওয়া সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে লজ্জা নাই। কারণ আত্মপর জ্ঞানটা বিজাতীয়, আমাদের পক্ষে ওসকল কৃত্রিমতা অসম্ভব।

ভাষা-জ্ঞান খুব প্রথম শ্রেণীর নহে। বাংলার সহিত প্রচুর ইংরাজি শব্দ মিশাইয়া কথা বলিবার অভ্যাস। কয়েকটি ইংরাজি শব্দ একেবারে অসহ্য। 'যাত্রীদের মধ্যে কেহ ওয়াইফের অসুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছেন; অন্য কেহ ভগ্নীপতি ফরেইন্-এ যাইবেন বলিয়া বিদায় দিতে চলিয়াছেন; অপর একজন অনুপস্থিত কোনো ভদ্রলোকের জামাতা-নির্ব্বাচনের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণ করিবার জন্য বলিতেছেন; ছেলেটা একেবারে লুস ক্যারাক্টার, ড্রিঙ্ক্ তো করেই—।' বাংলা কিংবা ইংরাজি কোনোটাই ভালো জানা না থাকাতে অহরহ শব্দের অপব্যবহার ঘটে। চিঠিপত্রে বর্ণাশুদ্ধি, ব্যাকরণ-দুষ্টতা ও রচনার ত্রুটি দেখিয়া মনে হয়, কাগজ-কলমের সংযোগটাই যেন অশুভ। পত্রখানি যদি বা কোনো রকমে উৎরাইলো, উপসংহারে 'শারীরিক কুশল' চাহিয়াই সমস্ত মাটি হইয়া গেল। শব্দের অপব্যবহার অত্যন্ত কৌতুকজনক। ট্রেনে একদিন গাড়ি ধরিবার কথা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। একজন বলিতেছিলেন, তিনি এক ঘণ্টা সময় থাকিতে স্টেশনে আসেন, কারণ মুহুর্মুহুঃ সময়ে আসিয়া দৌড়াদৌড়ি করা তাঁহার পোষায় না। মুহুর্মুহুঃ সময়ের অর্থ বোধহয়, যে সময়ে আসিলে হুড়মুড় করিয়া গাড়িতে উঠিতে হয়। অপর এক ষ্টিমারযাত্রী বলিয়াছিলেন, তিনি রেল-ষ্টিমারে চা খান না, কারণ তাঁহার একটা 'হবি' (hobby) আছে, বাহিরে চা খাইলেই গলা খুস্‌খুস্ করে। তবে, বোধ করি ভাত-মাংসতে আপত্তি নাই, কারণ, দেখিলাম বাট্‌লার-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার রাইস্-কারির ভিজিট কত?

যাঁহারা জ্ঞানী-গুণী ও বিখ্যাত লোক, তাঁহাদের প্রতি ইঁহারা শ্রদ্ধাশীল। এবং শ্রদ্ধাটা একেবারে আকাশচুম্বী, —গগন-ভেদীও বলিতে পারেন। বিচারবুদ্ধি-রহিত হওয়াতেই এই মাত্রাবিপর্য্যয়। এক যাত্রীকে বলিতে শুনিয়াছি, প্রফেসর সত্যেন বসু মহাশয় একখানি পুস্তকের মলাট দেখিয়াই উহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়টির আদ্যোপান্ত বলিয়া দিতে পারেন। অন্যেরাও কথাটা মানিয়া লইলেন। না পারিবার কথা

কি? যিনি আইন্‌স্টাইনের ভুল ধরিতে পারেন তাঁহার পক্ষে ইহা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। বাগ্মিতার কথা উঠিল। একজন বলিলেন, "সে, মশাই, শুনিয়াছি বিপিন পালের বক্তৃতা। কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু যা' শুনিলাম সে এক মহাকাব্য।" এই ধরনের গ্লানিকর প্রশংসা গুণগ্রাহিতার পরিচয় যে নয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। অনুমান করি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে উত্তরকালে যে-সকল রোমহর্ষক কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়, তাহার উৎপত্তি এখানেই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের সাহিত্য-প্রীতি নাই। এই কথাটির একটু সংশোধন আবশ্যক। ইঁহাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাঝে-মাঝে একটু-আধটু সাহিত্য-রচনাও করিয়া থাকেন। এই রচনা সাধারণতঃ দুই প্রকারের, ভ্রমণকাহিনী ও কাব্য-সমালোচনা।

কেহ সপরিবার দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফলাও করিয়া সেজবৌদি রানুপিসি ও রাঙাদিদি সম্বলিত এক বিরাট প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা বাহির হইল। বিবরণী আরম্ভ হয় বাড়ীর ফটক হইতে। তাহার পর তুচ্ছতম ঘটনাটিও বাদ না দিয়া ভ্রমণকাহিনীর ছলে ভ্রাম্যমান পরিবারটির একটি অবান্তর চিত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। সেজবৌদির পা মচ্‌কাইয়া যাওয়াতে কী বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, রাঙাদিদি তাহার জর্দ্দার কৌটা ফেলিয়া আসাতে কী অনর্থ বাধিয়াছিল, এই জাতীয় তথ্যাদি-পূর্ণ একখানি ঘরোয়া রোজনামচা ভ্রমণকাহিনীর নামে বাহির করা হয়। লিখিতে লিখিতে মাঝে-মাঝে বোধ হয় 'ভ্রমণ'-এর কথাটা মনে পড়িয়া যায়, আর তখনই একটি 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য'-এর বিবরণ বসাইয়া লেখক বলেন, আমার তখন কবির সেই পংক্তিগুলি মনে হইতে লাগিল—। এবং বলা বাহুল্য, পংক্তিগুলি যথাযথ উদ্ধৃত হয় না। এই প্রবন্ধে অনেক ছবিও ছাপা হয়। বাতাসিয়া লুপ, টাইগার হিল্ তো বাজারেই কিনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সেগুলির জন্য হাঙ্গামা নাই। আর যে-কয়টি চিত্র ছাপা হয়, সেগুলি ভ্রাম্যমান পরিবারের অন্তর্গত একজন ফটোগ্রাফারের তোলা। প্রথম ছবি: রানুপিসি—একটি ঝর্ণার সম্মুখে দণ্ডায়মানা; দ্বিতীয় ছবি: অশ্বপৃষ্ঠে রাঙাদির ছেলে নন্তু; তৃতীয় আলেখ্য: পর্ব্বতগাত্রে উপবিষ্টা সেজবৌদি ও তাহার ভগ্নী বকুল (লেখকের উৎসাহটা কোথায়, বুঝিতে নিশ্চয়ই বাকী নাই)। প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদে সেজবৌদি এণ্ড কোং সহ লেখক আবার বাড়ীর ফটকে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, আবার সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই খাঁচা!

এখন কাব্য-সমালোচনার নমুনা দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সমালোচনার

ধাক্কাটা সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের উপর দিয়া যায়, সে ভালোই। তিনি বনস্পতি, বারো মাসের তেরোটা ঝড় সামলাইয়া যাইতে পারিয়াছেন। এই সকল রচনার মাথামুণ্ডু বুঝিবার কোনো উপায় নাই। যদি বা বাহির করিতে পারিলেন যে লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞাটা কি তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। অতঃপর জটিলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যাহা সুন্দর তাহাই সত্য, যাহা সত্য, তাহাই নিত্য, এবং যাহা নিত্য তাহাই সাহিত্য! আপনি একেবারে তলাইয়া গেলেন। খানিকটা নাকানি-চুবানি খাইয়া যখন আবার ভাসিয়া উঠিয়াছেন, ততক্ষণে সমালোচক ভূমাটুমা পার হইয়া কবিকে লইয়া আসরে নামিয়াছেন। তিনি তখন বলিতেছেন: কবি এই সুন্দর ভুবন ত্যাগ করিয়া মরিতে চাহেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। যদি কথাটা ভালোয়-ভালোয় মানিয়া নেন তো চুকিয়া গেল। যদি আপত্তি করেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কোথা হইতে যে কতকগুলি অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা সিপাই ছুটিয়া আসিবে, আপনি আর পলাইয়া পথ পাইবেন না। বিষম-ভয় পাইয়া প্রবন্ধ পাঠে ইস্তফা দিয়া পুস্তক বন্ধ করিবেন।

কিন্তু অলমতি বিস্তরেণ। জন-সাধারণ চোখ রাঙাইতেছেন, টের পাইতেছি।

সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা

গৌতম গুপ্ত

সুধেন্দু মল্লিক পঞ্চাশের অন্যতম যোগ্য কবিনাম। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সেই শব্দ-দাপানো তুলকালাম কবিকুলের অনেকের কলমই আজ যখন স্তিমিত, পুনরাবৃত্তি-প্রবণ, নতুন কোনো উন্মোচনের প্রত্যাশা যখন প্রায় বিলীন, তখন সুধেন্দু সেই অতিবিরল কবিদের অন্যতম, যার কবিতা এখনো আমাদের প্রত্যাশাকে উজ্জীবিত রাখে।

এই কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত কবিতাগুলি এতই হৃদয়তল্লাসকারী ও অনাময় যে পড়তে পড়তে ছন্দ, প্রকরণ, প্রকাশশৈলীর মতো চলিত নির্ণয়প্রণালীসমূহ একবারও এই প্রতিবেদকের মনে আসেনি! সুধেন্দু মল্লিকের প্রায় সব কবিতাতেই এক ধরনের অধ্যাত্মবাদ সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। এই অধ্যাত্ম-চেতনায়ও এক বিশেষ উত্তরণ লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে আজকাল। মাঝে দীর্ঘকাল তাঁর কবিতায় আরাধ্য দেবতার সরাসরি নামবাচক উপস্থিতি অনেকের (এখানে অনেকে অর্থে সাধারণ ধারণার কবিতা পাঠক) তেমন স্বাদু মনে হয়নি। অনেকেই হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীই শেষ অবধি যেখানে গিয়ে পৌঁছায়, তা নশ্বর জীবনের একধরন অবিনশ্বর অধ্যাত্মসিদ্ধি। যদি রামায়ণ থেকে শুরু করি, যদি বেদ উপনিষদের কবিত্ব পার হই, তাহলেও কি দেখা যাবে না সেই ভারতীয় ধর্মনির্ভর কবিতার যাত্রাপথ গীতাঞ্জলি অতিক্রম করেও থেমে থাকেনি, অতি-সাম্প্রতিক কাল অবধিও এগিয়ে এসেছে! সুধেন্দু সেই অতি-সাম্প্রতিকের একজন সার্থক প্রতিভূ। মূলত আত্মচেতন ও অধ্যাত্মসংসর্গে স্নিগ্ধ আলোচ্য এই কবিতাগুচ্ছে এক নতুন প্রত্যয়মান সুধেন্দুকে আবিষ্কার করি আমরা।

সুধেন্দু মল্লিকের তিনটি কবিতা

আমার বাসনা ইন্দ্রজাল

এখন দেখছি আমি সব পারি, যদিও কখনো
বাস্তব বৃষ্টির মতো বাধা কিছু থেকে যায় এগিয়ে যাবার—
তবু দেখি সব পারি। কি সামান্য শব্দের গুহায়
অনন্তবছর আমি কাটিয়ে দিয়েছি সন্ন্যাস সাধনা
দেখেছি ঈশ্বর আজ ঘরে ঘরে পুষ্প প্রসাধন। বালিশের নিচে
শাস্ত্র রেখে শুলে খুব ভালো ঘুম হয়—উপরি লাভ মধু-বৃন্দাবন।
মধুর স্বপন। লোকে বলে পাগলামির মাত্রা রোজ বাড়ছে আমার
যেমন বয়স বাড়ে, পড়া ছেড়ে চাকরি ধরে ছেলে দিন ছেড়ে রাতে ধরে ছায়া!
সময় তো গলিত দর্পণ রোদ্দুরে নদীর মতো মায়া শরীর জড়িয়ে ধরে
রজত পাবকে।

তবু আমি সব পারি। এ বয়স ছুঁড়ে দিয়ে জান না আলনা থেকে
আলগোছে একফালি আলো কাঁধে ফেলে
সটান সমুদ্রে আমি মিশে যেতে পারি সশরীরে ফেনার সাঁতারে।
পারি। পারি। সব পারি। বিদেশী মুদ্রারো চেয়ে দামি
আমার সহসা ইচ্ছা আমার বাসনা ইন্দ্রজাল।
বর্ষার সকাল হলে আমি আজো ডাকি নীলিমা নীলিমা।
এক গলা ঘোমটার থেকে তখনি সন্দেহ কি বিকট বীভৎস মুখ বার করে
জরা জীর্ণ ভ্যাঙায় আমাকে—নীলিমা নীলিমা
সে আবার কোথা থেকে জুটলো এখন, এতোদিন শুনিনি তো নামও!
আমি বলি থামো শোনো হে সুন্দরী অসূয়াপ্রবণা
নীলিমা আমার প্রাণ সে আমার আজন্ম অসুখ যেন, সে আমার
বেড়ে ওঠা যেমন আকাশ বেড়ে যায় যতো এই গ্রহ তারা
নক্ষত্র সংসার তাকে বেঁধে রেখে দ্যাখে উদাস উদ্দেশে
সে গেছে অনেক দূরে ভেসে। আমি জানি সেই নীলিমাকে।

ভালোবাসা কোনদিন শূন্য হাতে যায়নি কোথাও
ভালোবাসা কোনদিন শূন্য হাতে ফেরেনি রাত্রিতে। তার করতলে
অন্তত একটি স্নিগ্ধ বেলফুল কোমল কন্যার মতো নির্ভয় শিশিরে নিদ্রিত।
চিত্রিত কে তাকে জাগাবে—তুমি? চেষ্টা করো। চেষ্টা সতত নির্দোষ।
কে তাকে জাগাবে? আমি! আমি সব পারি।
চারিদিকে ভূরি ভূরি প্রমাণ আমার।
যেখানে ফেরাও মুখ সেখানেই আমার যৌবন অজস্র পাতায়
গাছ হয়ে শিকড়ে কামড়ে মাটিকে রেখেছে চোখে চোখে।
নিদাঘ কাঠিন্য তার ভালো লাগে। ভালো লাগে সজল মমতা।
কিন্তু এও শেষ নয় শেষ কিছু হয় না সুন্দরী
যেমন আরম্ভ নেই—মাত্র বলা যায়
অর্থের প্রাসাদ হতে ফিরে আসি শব্দের গুহায়।

ছবির সখা

ছবি দেখলে চিনতে পারবো। মুখ মনে নেই।
বিস্মৃতির অহংকার। ছবিতে সে নেই জানি
যে আছে সে আমার পিছিয়ে পড়া মন। এ জীবন
বহুদূরে গিয়েছিলো বিস্তৃত আলোর মতো
বৃষ্টি অন্ধকার যেমন অনেক দূরে যায়
মানুষের মাথায় মাথায় পা ফেলে অদৃশ্য হাঁটে
আমি সে রকম কিছু হয়ে গেছি কখন জানি না।
ভালোবাসা ঘৃণা কে ছিলো হৃদয়ে পরবাসে
হঠাৎ পাহাড় থেকে পথের ঢালুর মতো নেমে আসে
আশা, ভোরে বা রোদ্দুরে বলে মাটির সজল ভিত খুঁড়ে
বার করে আনো ছিন্নমূল ধুলোয় ব্যাকুল—
কিন্তু দেখাবে বা কাকে?
কি হবে দেখিয়ে সেই হৃৎপিণ্ড ছবির সখাকে।

কবি

আজ তোমার স্খলিত চরিত্র গরীব কবি
আকাশ আর সমুদ্রের সেতু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
তার মুখে পড়েছে সূর্যাস্তের আলো। কবি!
জানিনা কথাটায় কতোটা সম্মান আর কতোটা ব্যঙ্গ
কতোটা অভিনন্দন আর কতোটা উপেক্ষা। কবি!
জানিনা কথাটায় কতোটা গতি কতোটা স্থিতি
কতোটা আলো আর কতোটা অন্ধকার। কিন্তু
আর যাই থাক তার না আছে অর্থ না আছে
চরিত্র। এই গর্বেই সে কবি।

ভালোবাসার কথা সে প্রতিপদে ভোলে বলে তার
ভালোবাসার কথা আর ফুরোয় না। এই দেখলো গাছ
তো দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলো এক টুকরো গেরুয়া মেঘ তো
ছুটলো তার পিছু পিছু। টাকা দেখলে তার হাসি পায়।
খিদে তার ভোরের আলোর মতো গ্রাস করে জগৎ সংসার।
একটি পাখির ডাক শুনে উড়ে গেলো আকাশে আবার
স্তিমিত কুসুম গন্ধে মিশে গেলো অরণ্যে। আবার যেই
দেখলো জলের ধারে ধুলোয় ঢাকা ধূসর মুখ
যেন কার; অমনি তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে বসলো
—কোথায় ছিলে তুমি এতোদিন! তুমি কি আমার
বাড়ি না ললাট যে এতোকাল পালিয়ে বেড়ালে?
কাঁদতে কাঁদতে যেই দেখলো ঝড়ে উড়ে যায়
মলিন কাগজের টুকরো তখনি ঝাঁপ দিয়ে ধরে
অট্টহাস্য করলো—এই তো আমার সেই হারিয়ে
যাওয়া ঐশ্বরিক অমোঘ দলিল, এই তো স্পষ্ট
লেখা আছে তোমাকে আমি সরল চিত্তে সুস্থ
শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় নিব্যূঢ় স্বত্বে
অমরত্ব দান করলাম।

আবার সেই মুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো
কর্কশ শব্দে চলেছে আবর্জনার গাড়ি, তখনি
কাগজটা মুঠো পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলো তার মধ্যে।

তুমি নমস্কার করার আগে সে তোমাকে নমস্কার করে।
তুমি ভালোবাসার আগে সে তোমাকে ভালোবাসে।
তুমি দান করার আগে সে তোমাকে প্রমত্ত দানে ঢাকে।
তুমি তাকে ভোলার আগে সে তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

তোমার স্খলিত চরিত্র গরীব গর্বিত কবির দিকে
তাকিয়ে আজ অপলক বিস্মিত সূর্যাস্ত।

ঘর

বরুণ চৌধুরী

বেরুবার মুখেই প্রভাসবাবুর মনটা খিঁচড়ে গেল। যতসব শুকনো ঝামেলা। পুজোর মাসে এটাই শেষ শনিবার। মেয়ে জামাইদের দুপুরে খেতে বলেছেন। ওদের অবশ্য অন্য ধান্দা। বাচ্চাদের বাপের বাড়ি গচ্ছিত রেখে দিব্যি ঝাড়া হাত-পা পুজো বাজার। বৌদি গুঁইগাঁই করবে ঠিক। সেটুকু হজম করতেই হয়। ওটা আচারের তেল। এখনো গুচ্ছের কেনাকাটা বাকি। শেষ পর্যন্ত গড়িমসি করলে যা হয়। নাতি-নাতনির সাজানো সংসার তেতো লাগার কথা নয়। তাছাড়া বৌমার থেকে প্রভাসবাবুর মেয়েদের দিকে টান বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তা নিয়ে আদিখ্যেতা করারও কোনো ব্যাপার নেই। আসলে এই আদিখ্যেতাটা প্রভাসবাবুর মোটে আসে না। তাঁকে নিয়ে পুত্রবধূ সরমার বেশি বাড়াবাড়ি বা দুশ্চিন্তার ঘট, কোনোটাই প্রভাসবাবুর পছন্দ নয়। যত্ন-আত্তির আঁটসাঁট কম্ফটারে বাষট্টিতেও প্রভাসবাবুর দমবন্ধ লাগে। অথচ মুখের ওপর কিছু বলাও যায় না।

প্রভাসবাবুর দুই মেয়ে, এক ছেলে। স্ত্রী শোভা বছর দুয়েক আগে এক কার্তিক মাসের দুপুরে পান গালে দিবানিদ্রার মধ্যেই চিরনিদ্রায় ডুবে যান। প্রভাসবাবু তখনো রিটায়ার করেননি। অফিস-টফিস যেমন থাকে। শোভা হয়তো নিশ্চিন্তেই বিছানায় গড়িয়ে নিতে চেয়েছিল। কে জানত সে-ঘুম কোনোদিন ভাঙবে না। লোকে বলে গলায় কাঁচা সুপুরি আটকে—প্রভাসবাবু নিজে পুরোনো হেটোরুগি হিসেবে ব্যাপারটা ঠিকই জানেন। বিশুদ্ধ হার্টফেল। আগে লোকে মায়ের কোলকেই ইন্‌টেনসিভ কেয়ার ভাবত। ক্রমশ ধারণা দ্রুত বদলাচ্ছে। হৃদরোগ মানেই খরচের খাতায় নাম লিখে রাখার দিন নেই। কিন্তু সুযোগ না দিলে কি করা। বাসি টোস্টের মতো চিমড়ে হেটো রুগিও এখন জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে ট্রাম ধরছে, বাসের রডে ঝুলছে। জুরুথুরু ভাবলেই খতম। তবে দুটো দিন বেশি বাঁচবার জন্যে প্রাণপাত নিয়ম আর ঘড়ির কাঁটায় ওঠা-বসা—এগুলোও প্রভাসবাবুর বেশি হ্যাংলামি মনে হয়। সেই কারণে প্রাতঃভ্রমণেও ঘেন্না ধরে গেছে। বুড়োগুলো যেমন লোভী তেমনি স্বার্থপর। দুদিন পরে ঘাটে উঠবে এখনো কাঙালপনার শেষ নেই। এদের বেশির ভাগ

গুছিয়ে নিয়েছে, টাকাপয়সার দিক থেকে যথেষ্ট নিশ্চিন্ত। ছাপোষা আত্মীয়-স্বজন ঠেকাতে কুকুর পোষে, অথচ মৃত্যুকে খ্যাদাবার সময় পা জড়িয়ে লুটোপুটি।

প্রভাসবাবু পাঞ্জাবিতে মাথা গলিয়ে চটিটা পায়ে দিতে যাচ্ছেন আর তক্ষুনি পুত্রবধূ সুরমার গলা শুনতে পেলেন—'এই ঠা-ঠা রোদে কোথায় বেরুচ্ছেন বাবা?' 'রোদ? তাতে কি। রোদের ভয়ে সারাদিন ঘরে খিল এঁটে বসে থাকা যায় নাকি।'

'না, মানে এই ভাদ্দর মাসের রোদটা বড্ড চড়া। এ বয়েসে মাথায় লাগলে ভালো না, তাই বলছিলাম—।' এ-নধর গাভীটিকে কিভাবে বোঝানো যায় যে মাথায় লাগানো ভালো নয় শুনলেই প্রভাসবাবুর মাথাটি আপনি বিগড়ে যায়। সব সময় বয়েস তুললে কার না মেজাজ খিঁচড়ে যায়। 'এই বয়েসে' রোদ হিম চলবে না, দু ফোঁটা বৃষ্টি যেন গজাল পেরেক। সেবার বড়ো মেয়ে নমু গোরখপুর থেকে ইয়া মোটা কালাকাঁদ এনেছিল, কিন্তু এই বয়েসে ওসব ক্ষীর ঘি···। পৌষ মাসে ছুটকি সোনাগলা অমন নলেন গুড় আনল—কি সুবাস। কিন্তু এই বয়েসে অত মিষ্টি। অথচ এত মিষ্টি ভালবাসায় যে গলা পর্যন্ত কিরকির। নধর গাভীটির চিক্কণ গলকম্বলে টোকা দিয়ে জিগ্‌গেস করতে সাধ যায়, এ ধরণীর আলো হাওয়ায় নিশ্বাস টানাও কি তাহলে এই বয়েসে বড্ড বিপদের!

স্ত্রী শোভা কিন্তু ঠিক এমনটি ছিল না। আদিখ্যেতা ব্যাপারটাই তার ধাতে নেই। পরে যে সব কচিমুখ একে একে এলো তাদের সবাই প্রায় ছেলে। পুত্র সুখেন্দুর সবেধন নীলমণি ছেলে ঐ জোজো। বড়ো মেয়ে নমুরও দুটোই ছেলে। শোভা প্রভাসবাবু কেউই বহুকাল মেয়ের মুখ দেখেননি। এক ছুটকিরই যা একটামাত্র মেয়ে নিনি। প্রভাসবাবুর কোনোদিকেই তেমন হুঁস নেই, কিছুতেই ইতিউতি নেই। তবে শোভার খুব নাতনির শখ। সে বলত ছেলের চেয়ে মেয়েরা বেশি মায়া কাড়ে। নেটিপেটি হয়। নিনিটা এলে এমন গায়ে হাত দিয়ে শোয় যে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। প্রভাসবাবু যেন দেখতে পাচ্ছেন মাটিতে বসে সেলাই করতে করতে এখনো শোভা তেমনি কলের পাশে কথা বলছে। তবে ইদানিং শোভার গলাটাও আর যেন ঠিক মনে পড়ে না প্রভাসবাবুর।

বিস্মৃত কোনো পাড়াগাঁয়ে কচিৎ ঘুঘুর ডাক হয়ে সে কণ্ঠস্বর ফিরে বাজে। তখন মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে টালমাটাল কলকাতা, তার সমস্ত ডামাডোল নিভে আসে। পুত্রবধূ সুরমার গলাও মিষ্টি। কিন্তু তাতে যেন আইসক্রিম সোডার ঝাঁঝ।

আজকাল প্রায়ই মাঝরাত অবধি ঘুম আসে না প্রভাসবাবুর। কি যে উসখুস

ভাব। অগত্যা বইপত্তর নাড়াচাড়া ছাড়া কি-ই বা গতি। দালান থেকে ছেলে-বৌয়ের বাড়ি ফেরার শব্দ আসে। রাত্তিরে কোথাও পার্টি বা আড্ডা জমেছিল। দরজার বাইরে ওদের পায়ের শব্দ, কথার কিছু ফিস ফিস ঝরাপাতা ওড়ে।

'চুপ আস্তে। বাবা শুনতে পাবেন।'

'ধ্যাৎ, এই মাঝরাতে জেগে বসে আছেন তোমার বাবা।'

'তুমি আর আমার বাবাকে চিনিও না। ঐ ছাখো দরজার তলায় বেড-ল্যাম্পের আলো।'

'বাবাঃ সত্যি, কবে যে আলোটা নিভবে।'

সুখেন্দুর গলাটা এবার বেশ টেরিয়া শোনায়।

'তার মানে?'

'মানে? মানে তুমি বোঝ না নাকি। জোজো বড়ো হচ্ছে। এখন আর আমাদের তিনজনের একসঙ্গে শোয়া উচিত নয়।'

'দয়া করে একটু আস্তে কথা বলবে? মনে হচ্ছে জিন্‌টা তোমার মাথায় চড়ে গেছে।'

'ইডিয়েট।'

এ-শব্দটায় আর আইসক্রিম নেই, শুধু সোডার ঝাঁঝ। শোভার গলা ছিল ঘন ডিমের কুসুম। হাজার ঢালাঢালিতেও গেলাসের গায়ে যেন লেপটে থাকে। পাড়ার আশু ডাক্তারের ছেলের বৌভাতে শুধু একটা ফিসরোল খেয়েই বুকের কাছটা অম্বলে খিমচে ধরছে। প্রভাসবাবু কোনো কথাকেই আজকাল আর তেমন বিশ্বাস করেন না। কথা মাত্রই বিশ্বাসঘাতক। নিরীহ অম্বলটা কখন যেন ননীচোরা গোপাল বেশে কাঁড়িয়াক-রূপে দেখা দেয়, ভালোবাসার একসরে প্লেটে ছায়া ছায়া আলসার ফুটে ওঠে। মুখে হজমের বড়ি, ঢোঁক গিলতে গিয়ে বিষম খেলেন। দরজার ও-পিঠেই হাল্কা ধস্তাধস্তি। চাপা কথা কাটাকাটি।

'কতদিন বলেছি জোজোর আলাদা ব্যবস্থা না করলে ওখানে এ-সব চলবে না। কোনোদিন আমার কোনোকথা তুমি কানে তুলেছ? ছাড়ো।

'তোমার কথা কানে তুললেই বুঝি সব সমস্যা জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে? এই টাকায় নিজের বাড়ি ছেড়ে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলে সংসার চলতো?'

'নিজের বাড়ি? বাবার বাড়ির দেড়খানা ঘরে রোয়াবি। মুরোদ বুঝতাম যদি বাবাকে অন্তত পশ্চিমের প্যানট্রিটাতেও সরাতে পারতে। ঘরটা বারোমাস বেকার ফাঁকা পড়ে আছে, আর উনি তো একলা মানুষ।'

'ছিঃ, ছোটলোকের মতো কথা বলো না। একে রান্নাঘরের গরম তায় পশ্চিমের তাত। বুড়ো মানুষটা ওখানে তো দুদিনেই অক্কা···।'

'কি বললে, ছোটলোক? নিজে কি, শয়তান ইতর। এক পয়সার মুরোদ নেই, আবার আমাকে ছোটলোক বলছে। আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকবো না। হাত ছাড়ো, ন্যাকামি করো না।'

এখন আর শুকনো পাতার নরম ফিসফিস নয়, দাউ দাউ আগুন। শীতার্ত অন্ধকার খানখান করে বাইরে একটা বেহেড স্কুটার বিকট শব্দে কোথায় যেন ছুটে যেতে চায়। পেছনে অন্য এক ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক, শিশুকণ্ঠের অতিনাটকীয় আর্তনাদ—'মা যেও না, প্লিজ, মা, মা-মা-মা—।'

সেই থেকে প্রভাসবাবুর ভেতরে উড়ুউড়ু বাতাস। পাতাকুড়নী সময় শুকনো পাতায় শব্দ তোলে। মনে হয় যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই। শেষ পর্যন্ত হবে না কিছুই তাও ঠিক। কলকাতা ছেড়ে বানপ্রস্থের ছিটেফোঁটাও প্রভাসবাবুর ধাতে নেই। যাকে বলে একগলা কলকাতায় ডুবে—তিনি তাই।

আজন্ম এই পাড়া, বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে সেই স্কুল জীবন থেকে আড্ডা। চায়ের কাপে রাজনীতি। আর এখন তো বাড়িতে বসেই ট্যাকস্ এডভাইস দিয়ে দিব্যি ঠাউকো রোজগার। মাঝে-মধ্যে সন্ধের ঝোঁকে কারুর বাড়িতে বসে এক আধটা রাম হুইস্কি যে না চলে তাও না। শোভা থাকতে মৌরলার ঝোল আর উচ্ছে-আলু-ভাতে আজও থালায় নিয়মিত। যাকে বলে বেড়ে আছেন। যতই হোক কলকাতার গায়ের গন্ধ না পেলে উনি কোথাও বেশিদিন টিঁকতে পারেন না। সুতরাং কোন বয়েসে যে মানুষের বৈরাগ্য ধরে, মানুষ উদমী কচ্ছপ হয়ে যায়, তা প্রভাসবাবুর আজও জানা হলো না। কোনো বুড়োই কি সে-সব ঠিকঠাক জানে? ও-সব চল্লিশের দশকে বাংলা সিনেমার গল্প।

রাত্তিরে লোডশেডিংয়ের দুর্দান্ত গরমে বিছানায় অসহ্য বলেই সুখেন্দু সুরমা ছাদে দাঁড়িয়েছিল। ছাদটা যৌথ। ওরা জানত না নিজের দোরগোড়ায় পুরোনো খুড়াটিতে আরো একজোড়া ষাট-বাষট্টির ফুসফুস নিঃশব্দে অক্সিজেনের লাইন টেনে নিয়েছে। বর্তমানে সুরমারা যে সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে তা কিন্তু অন্ধকার বা গরমের ব্যাপার না। বরং উল্টো। আলো হাওয়া সমুদ্রের আহ্লাদ নিয়ে সে এক অন্য গল্প। মস্ত সুপারিশে মেগার কম্পানির হলিডে-হোমে ঘর পাওয়া গেছে। পুরী যাওয়া ঠিক। এখন সমস্যা শুধু প্রভাসবাবুকে নিয়ে। ঐ পুরোনো পাকস্থলীটাকে কার জিম্মায় রেখে যাওয়া। কে রাঁধবে, কে চা দেবে। খোলা আকাশ থেকে

চুপিসাড়ে বে-আইনি অক্সিজেন লাইন টানা সোজা, কিন্তু রান্না? তেল-নুন-মশলার এই আজব প্রক্রিয়াটি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী ঠিক পাত্তাই রাখে না। সুরমা তার পিসিমাকে দিনকয়েক এনে রাখতে পারে না যে তা নয়। কিন্তু পরের হাতে ভাঁড়ার ছাড়লে ডবল খরচা। নিজের গায়ে লাগে না তো। জোজোটা শুনে ইস্তক সমুদ্দুরের নামে পাগল। মাথায় সমুদ্র ঢুকে গেছে। দুচোখে থৈ থৈ প্রশ্নের ঢেউ। কলকাতার এই গুমোট গরমে হঠাৎ পুরীর সমুদ্রগর্জন। প্রভাসবাবুর মনটাও গাং-চিলের ডানায় ভাসে। স্বর্গদ্বারে শোভার সঙ্গে সেই সমুদ্রদর্শন।

সমুদ্রের গায়ে কবেকার একটা বন্ধবাড়ি। গোটা বাড়িটাই বালিতে পুঁতে গেছে। দুতলার বারান্দায় কাঠের রেলিং পর্যন্ত বালির পাহাড়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই বালির পাহাড় ভেঙে দুতলার বারান্দায় উঠে যেতে পারে। বারান্দায় ঠ্যাং ঝুলিয়ে যতক্ষণ খুশি পুচ্ছ দোলাও। বাড়িটার সদর দরজায় কিন্তু কাৎলার মুড়োর মতো তালা ঝুলছে। শোভা বললো, বালির পাহাড় সমেত বাড়িটা কিনে নাও। দুজনে একলাটি বসে দিনরাত সমুদ্দুর দেখব। সূর্যাস্তের খুশিতে আকাশ তখন ময়ূরকণ্ঠী। বয়েসটা টলমলে। দিনগুলো ছটফটে লাল কাঁকড়া। এখন প্রভাসবাবুর যাদুঘরে এছাড়া পুরীর অন্য কোনো ভাস্কর্য নেই।

নাতি-নাতনিরা দই অমৃত্তি ভালোবাসে। বিকেলের চায়ে ত্রিলোচনের সিঙ্গাড়া থাকলে মেয়েদের একগাল হাসি। সিঙ্গাড়ার পুরে নাকি আচারের তেল থাকে, নইলে অমন সোয়াদ! বাপের বাড়ির এখন আদিখ্যেতায় জামাইরা ফুট কাটে ঠিক। কিন্তু পুজোবাজার এলে সব বাবাজিই কাৎ। নমু এখন গলফগ্রীনের পাখি। ছোটু নিউ আলিপুর। ওসব কাপ্তেনপাড়ায় কালীঘাট মানিকতলার কাটরা পাবে কোথায়। পুজোয় হেদোই বাঙালির হংকং, ভবানীপুরই সিঙ্গাপুর। ঝলমলে সায়াশাড়িতে দিব্যি চাপা পড়ে যায় কলকাতার বয়স্ক ফুটপাথের শিথিল গা-গতর। দই অমৃত্তি আর শালপাতার চ্যাঙারিতে সিঙ্গাড়া সামলে ত্রিলোচনের দোকান থেকে বেরুবার মুখেই দিবানাথের সঙ্গে দেখা। দিবুর হাত খালি। কিছু বলার আগেই প্রভাস-বাবুর হাত থেকে দইয়ের হাঁড়িটা কেড়ে নেয়। দিবানাথের সামনেটায় টাক। তাঁর মাথায় এখনো শাদা কালোর গুচ্ছ। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে প্রভাসবাবু বয়েস গুলিয়ে ফেললেন। 'কি রে, গরম সিঙ্গাড়া একটা টেস্ট করবি নাকি।' কলেজ জীবনের হাতখরচায় সেই চা-সিঙ্গাড়া আর ক্যাপসটেনের নীল প্যাকেটে মোড়া দিন। দইয়ের হাঁড়িটা দিবুর হাতে তুলে দিতে গিয়েই প্রভাসবাবুর পাঁজরের বাঁ পাশটায় কেমন খ্যাঁচ ধরলো।

হবি তো হ—ঠিক সেই সময়েই ইলেকট্রিকের দত্ত মিস্তিরির সাইকেলের হ্যাণ্ডেল আর একজনের পাঞ্জাবির পকেটে। লোকটা মেরেছে এক টান। ব্যাস, পকেট ফর্দাফাঁই আর রেজকি শুয়ার উল্লুকের ছড়াছড়ি। দোষটা কার তা আর জানা হলো না। পাঁজরায় খ্যাঁচ লাগার মুহূর্তেই প্রভাসবাবু বহুকাল পরে ফের সেই নিথর পাড়াগেঁয়ে দুপুরে ঘুঘুর করুণ কান্না শুনতে পেলেন। চারিদিক হঠাৎ যেমন ছায়া করে এলো। আড়ালে নিশ্চুপ রোদ। পাখির ডাক গাঢ় হলো অথচ ফুসফুসের ভেতরে কত যে দমবন্ধ ডানার ঝাপটা। মস্ত সবুজ আকাশের কলাপাতায় এক চিমটে মেঘ। দিবানাথ কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে প্রভাসবাবুকে ফুটপাথে হীরুর চায়ের দোকানে বসিয়ে দিলেন। দোকান না হাতি। চারটে বাঁশের ডগায় বেগনি প্লাসটিকের চাঁদোয়া, দুটো বেঞ্চি আর ইটের ওপর একটা কাঁঠাল কাঠের পাটায় টেবিল। টেবিলের ট্রানজিসটারে লতা। ফুসফুসে আটকানো একটুকরো জমাট মেঘ ছাড়া প্রভাসবাবুর কিন্তু আর কোনো অস্বস্তি নেই। বাড়ি ফিরে ঢিমে পায়ে খাবার টেবিলে দই-মিষ্টি রেখে টুক করে নিজের ঘরে। গলায় দুঢোঁক জল ঢেলে খাটে শোবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার অন্তত নির্ভুলভাবে ঘুঘুর কান্না টের পেলেন। তখনই ঠিক করে ফেললেন আজ আর নাতি-নাতনি নিয়ে জুতো কিনতে বেরুচ্ছি না। এমনকি সুখেন্দু সুরমার হাজার অনুরোধেও ওদের সঙ্গে পুরী যাচ্ছি না। বরং অনেকদূর, অন্য কোথাও। একদম একা একা। ছেলেবেলায় একবার দলবেঁধে মধুপুরে দিবানাথদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সুদ্ধু দিবুর সঙ্গে ওখানে গেলে কেমন হয়? ঠিক ছেলেবেলার মতো। ঘরের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে নাতি-নাতনিরা ঢুকলো। মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে গেল। দাদুর সঙ্গে জুতো কিনতে যাবার টাগ-ডুম ওদের চোখেমুখে। প্রভাসবাবু কার কার যেন মাথায় হাত বোলালেন। নিজেরই নাতি-নাতনি, তবু বাচ্চাগুলোকে প্রায়ই আধচেনা লাগে।

প্রভাসবাবু কোনোকালেই কি গেরস্তের গোয়ালে গাইগরু ছিলেন? মানাতে পারতেন? বরং চিরদিনই যেন বাইরের লোক। মেয়েদের সঙ্গে শোভা অনেক সময়ই রসিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। বেড়ালের বাচ্চা থেকে বিধবার বাচ্চা নষ্ট কিছুই বাকি নেই। প্রভাসবাবু এসে পড়লে শোভা হেসে বলছে, 'কুটুম এলেন'। খানিক পরে নমু আর ছোটু ঘরে ঢুকলো, পেছনে দু জামাই এবং সুরমা। ঘরে পা দিয়েই ছোটু ভুরু কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি, বাবা শুয়ে কেন? শরীর খারাপ নিশ্চয়ই।' ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপের লিপস্টিক টেনে সুরমাই কৈফিয়ত দেয়, 'বাবা কি কারুর কথা শোনেন, তখন বললাম ঐ চড়া রোদে—'

প্রভাসবাবুর মুখে ক্লান্ত মোচকানো হাসি, 'আরে না না, তেমন কিছু নয়। বুকটা একটু খামচাল, অম্বলটম্বল হবে আর কি।'

'ঠিক ধরেছি শরীর খারাপ, গা-টা দেখি।'

কপালে বুকে হাত রাখে ছোটু। নমু খানিকটা শোভার মতো। ও অতশত পারে না। মাথার পাশে বসে হালকা আঙুলে মাথায় হাত বোলায়। আগে এতেই আবেশে চোখ বুজে আসত। শোভা মুখ টিপে হাসে। বড়ো মেয়ে কপালে হাত ছোঁয়ালেই বাপের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। নমুটা ছোট থেকেই বাপ-সোহাগী। ছোটুটা একদম উল্টো। তড়বড়ে, ছটফটে। কোথাও একদণ্ড স্থির থাকতে পারে না। রাগ কান্না নিমেষে জল হয়ে যায়। সে বলে, 'জ্বরটর নেই, তবে চোখটা কেমন ছলছলে। আজ আর বাচ্চাদের নিয়ে বেরিয়ে কাজ নেই। আমরাই ওদের নিয়ে যাব। জুতোটুতো পরে দেখা যাবে।' নমু ওর স্বভাবমতো ক্ষীণ গলায় বাধা দেয়, 'নাই-বা কিছু হলো এবার। বাবা ভালো থাকলে রবিবারেও দেখা যায়। এখন দোকানপাট তো রোজই রাত পর্যন্ত খোলা।'

বাচ্চাগুলো খাটের চারদিকে পোঁ পোঁ ঘুরছে। ওদের বায়না আজই নতুন জুতো চাই। কার কোনটা পছন্দ তাই নিয়ে প্রথম ফিসফাস তারপরেই ঠাঁইঠুঁই, কান্না—শেষ পর্যন্ত বড়ো জামাই অভিজিৎ সামাল দিলো। প্রভাসবাবু শুনতে পারছেন ঠিক, কিন্তু সবই যেন কাঁচের কাউন্টারের ওপারে। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো রুগ্ন টানটান। শীতে যেমন পা চড়চড় করে। অথচ শীত কোথা। বরং কপালে পায়ের চেটোয় মিশমিশে ঘাম। অভিজিৎ একটা প্রস্তাব দিল মন্দ না, 'সব কটাকে গাড়ি পাহারার কাজে লাগাব। গাড়ি চুরির যা হিড়িক। পুজোর বাজার সমেত গাড়িটা উবে গেলে তো একদম জলে পড়া।' গাড়ি নিয়ে দু' ভায়রা ষষ্ঠীর দিনই কলকাতাকে কলা দেখিয়ে পিটটান। চাঁদনি রাতে মার্বেল পাহাড় আরো কতো কি। বেলা পড়ে গেলে জোজো বুবাই টাবু মিনি পুরো দলটা ফের দাদুর বিছানার পাশেই ঘুরঘুর। দাদুর কানে একতাড়া কচিপাতার ফিসফিস। দাদু ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে ওরা যেতে রাজি নয়। 'মা খালি খালি বকে।' 'বাবা গাড়ির কাঁচ তুলে বন্ধ করে রাখে।' সোজা কথা দাদু না গেলে 'বিচ্ছিরি।' প্রভাসবাবুর ছেলেবেলায় জুতোদের এত নামের বাহার ছিল না। পামসু, নিউকাট, বুট জাতীয় মাত্র কয়েকটা ভালো নাম। এখন ভোরের 'শুকতারা' দেখার জন্যে অন্য কোথাও নয়, স্রেফ বাটায় ঢুকলেই যথেষ্ট। হায়রে—এই এক ঝাঁক বুলবুলিরা জানেই না যে আজ তাদের দাদুর কোথাও নড়াচড়ার প্রশ্নই ওঠে না। দাদুর আগের থেকেই

একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাঁধা। এবার যেন একেবারে কানের পাশটিতেই ঘুঘুর কান্না শুনতে পাচ্ছেন। আশ্চর্য ঘরছাড়া ডাক। বড্ড বেশীদিন ঘর আঁকড়ে থাকা হলো। সংসারে থাকতে গেলে কিছু কিছু দাবি আঁকড়ে থাকা ছাড়া উপায় কি! এর থেকে রেহাই পেতে চাইলে পালাও। একদম পগার পার। প্রভাসবাবু সোজা চোখেই দেখতে পান নমু আর ছটু ঘরে ঢুকলো। বাবা ঘুমোচ্ছেন ভেবে পা-টিপে ফের বেরিয়ে গেল। একে একে সমস্ত ঝরাপাতা ও পদধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষে বাইরে সদর দরজা বন্ধের শব্দটুকুও জলের তলায় তামার পয়সা ডোবার মতো টুপুস। আচম্বিতে কুয়াশার ভেতর থেকে ফুটে উঠছে মধুপুর। দিবানাথদের সেই গোলাপী মল্লিকবাড়ি। এ-যেন অন্য কার ব্যথার মধুপুর। শেষ চৈত্র, তবু এমন ভারী কুয়াশা বড়ো একটা চোখে পড়ে না। অ্যাকুয়্যারিয়ামের পেটের ভেতর মাছ-ঘাস-পাহাড়ের মতো ভাসন্ত কঠিন এক পৃথিবী। প্রকাণ্ড বাগান। খয়রি থানইটের কানাউঁচু কেয়ারি। নানা ফুলগাছ। রং-বেরঙা ফুলেদের ঝাপসা চোখ-মুখ গোঁফ-দাড়ি। শৈশবের বাগানে বন বাদাড়ে আজ যে শিশুটি ঘুরছে তার বয়েস আট পেরিয়েছে, মাথায় শাদা কাল শেপ, নাম প্রভাসবাবু। প্রভাসজীবন রায়। প্রভাসবাবু আপন মনে ঘুরছেন তো ঘুরছেন। গাঢ় কুয়াশায় সূর্যের পাত্তা নেই। পুব আকাশে শুধু খানিকটা খেলো গোলাপী ছোপ। ঘন শিশিরে মিনিট পাঁচেকে মাথার চুল শপশপে। মস্ত উঁচু একটা আমগাছের গা বেয়ে শাদা বোগনভেলিয়ার জলপ্রপাত। গাছটায় কচি কচি আমের গুটি। সালফার রঙা শিরীষফুল। ডালে ডালে কত জামরুল শিশু দুলছে। চাঁপা কামিনী বেল ফুলের সঙ্গে ধান সেদ্ধর ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ। চন্দনা টিয়া মাছরাঙা নীলকণ্ঠ এমন-কি একটা ঘুঘুও যেন বা। প্রভাসবাবু যখন সেই কুয়াশা তুষারে তলিয়ে যেতে চাইছেন ঠিক তফুনি ফ্যাকাশে মুখে শুকনো কিশোরটি উঠে এলো মাটি ফুঁড়ে। চেনা মুখের আদল, কিন্তু স্মৃতির লেজারে নাম নেই। ওর সবুজ চেক শার্ট কাঁধের কাছে ছেঁড়া। তেল ঝোল পাজামা। গালে খোঁচা খোঁচা অসুখী ঝগড়ুটে দাড়ি। ছেলেটা একটিও কথা না বলে লুডোর ঘুটির চালে প্রভাস-বাবুর পায়চারির ছকটিতেই এলোমেলো ঘুরতে থাকল। যেন ওকে বাধা দেবার কেউ নেই। এখানে টহলদারিতে যেন ওর জন্মগত অধিকার। অথচ ঐরকম একটা ডাঁটো বয়েসে যে দম্ভ আস্ফালন আস্তিন-গোটানো রোক্ থাকার কথা সে-সব কিছুই ওর নেই। আর মাত্র মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সে হয়তো একটা চাঞ্চল্যকর খুন করবে যা টেকসাস-টকির যে কোনো খুনের থেকে কোনো অংশে কম লাল

নয়। বাপ-মার অশান্তির মধ্যে এই কিশোরের রক্তাক্ত লাল ছোরাটি ঝুলে থাকবে দীর্ঘকাল। বাপ-মা বহুকাল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে ভয় পাবে। আপাত-ভাবে ছেলেটির কিন্তু কোনো প্রস্তুতি নেই। শুধু চোখ দুটোতেই যা একটা বেহেড খুনীর ঠাণ্ডা চাউনি। চোখের জায়গায় নির্বিকার ভাবলেশহীন দুটি শাদা বোতাম। মৃত বাঘের কাঁচের চোখে যেভাবে ঠাণ্ডা হিংসা।

প্রভাসবাবু বার বার লক্ষ্য করছেন ছেলেটা নিজের গতিবেগ বাড়িয়ে কমিয়ে তাঁর মুখোমুখি হতে চাইছে, চোখে চোখ রাখার চেষ্টায় আছে। অনেক সময় প্রভাসবাবুকে পেরুবার পরেই হঠাৎ যেন পাড় থেকে জলে পড়ার মতো কুয়াশায় বেমালুম তলিয়ে যাচ্ছে। হাজার চোখ ফেঁড়েও তখন আর তার হদিস পাচ্ছেন না প্রভাসবাবু। হঠাৎ একসময় ঠিক ঘাড়ের উপরেই তার গরম নিশ্বাস। গোড়ালির কাছেই তার নীরব পদশব্দ, যেন গদি আঁটা বেড়ালের পা। চারিদিকের কুয়াশায় ভুখা মিছিল বিচ্ছিন্নতা হাহাকার। তার মধ্যেই প্রভাসবাবু নিখুঁত টের পাচ্ছেন ছেলেটা তাঁকে ঘায়েল করলো। পান সুপুরি আমতলায় পিঠে ছোরা সুদ্ধু তার রক্তাক্ত নিথর দেহটা কতকাল পড়ে থাকবে। যাবতীয় খোঁজ খবর নিয়েই ছেলেটা কাজ হাসিল করতে এয়েচে।

হয়তো জেনে শুনেই প্রভাসবাবু এক তরুণের মারাত্মক ক্ষতি করেছেন। স্রেফ বুড়োটার জন্যেই ছেলেটা তার মাপ-মার ঝটাপটির তলায় শৈশবের সবুজ পিপার-মেণ্ট হারিয়ে ফেলেছে। এখন শুকনো গলায় ছিপ গিলতেও কষ্ট। বুড়ো মানেই জিলিপির প্যাঁচ। কোনদিন পর্দায় নতুন মুখ নামতে দেবে না। ক্যান্সার টুঁটি টিপলেও বুড়োদের হুঙ্কার মরে না। কিন্তু প্রভাসজীবন রায়? উনি তো সাইলেণ্ট-যুগের নীরব ক্ল্যারিওনেট। কোনো সভাসমিতি কিংবা রাজনৈতিক মিছিল নেই। পৃথিবী বিখ্যাত 'লাউচিংড়ি' ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট নন। উরুদোলা ফিল্ম-সোসাইটির সেক্রেটারি নন। প্রখ্যাত 'বটপাতা' পুরস্কারের কমিটিতে নেই। এমন-কি নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বাবার মুখে কোনোদিন একটা দাবড়ানিও শোনেনি। দামি কলম ঘড়ি হারালেও বাবা কোনোদিন একটা টুঁ করেননি। জন্মসূত্রে পাওয়া দেহ নামক এই চামড়ার প্যাকেটে কত কুণ্ঠায়, কত কিন্তু কিন্তু মুখে প্রভাসবাবুর ষাটটা বছর কেটে গেল। যদিও প্রশ্ন, স্রেফ বেঁচে থাকাটা কি এতই অপরাধ? প্রভাসবাবু ভুরুর খোঁচায় ছেলেটার ছেঁড়া শার্ট তুলে কাস্টমস্ তল্লাসি চালালেন। ব্যাকুল চোখে দেখতে চাইলেন যে যত মরণ তা সত্যিই মহানুভব অথবা নচ্ছার। মৃত্যুর রূপ আকাশজোড়া মস্ত ফুলকপি, নাকি পুঁচকে প্লাসটিক সিরিঞ্জ। জামার তলায়

দেখলেন ছেলেটার খাল পড়া দুঃখী পেট। কিশোর রোমে ঢাকা উপদী চামড়ার ভাঁজে অন্য এক অন্ধকার মানচিত্র। সেখানে একমাত্র নদীরেখা পাজামার পাড় ছেঁড়া দড়িটি ছাড়া কোথাও কোনো গোপন অস্ত্র নেই। তবু ছেলেটি যতবার পেছনে পড়ছে প্রভাসবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠছে, শিরদাড়ায় ঠাণ্ডা স্রোত। এতক্ষণে যন্ত্রটার মোটামুটি আকৃতিও আঁচ করে ফেলেছেন প্রভাসবাবু। কাশ্মীরি কাঠের সেই ছোট্ট কুকরি। অসংখ্য শাল-আলোয়ান নামদা ফার, আপেল-আখরোট বাদামের গরম জঙ্গলে ছোট্ট একটা কুকরি। কিন্তু সাঁওতাল পরগনার এই কুয়াশামাখা শাদা তিলফুল আর বিউলি মকাই ক্ষেতে সুদূর কাশ্মীরের কুকরি আনে কোত্থেকে? কে বলবে। 'আমায় চিনতে পারছ না দাদু? আমি গো। এবার ক্লাস সেভেনের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিনি। বাবা-মার ভয়ে পালিয়ে এলাম। আর ফিরব না।' কিন্তু প্রভাসবাবুও আর ফিরছেন না। মনে মনে ঘর খালি করা হয়ে গেছে। এখন আদিগন্ত শান্তি। প্রভাসবাবু স্বস্তির একটা প্রকাণ্ড শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাচ্চা বয়েসের দুষ্টুমি, বিছানায় হেগেমুতে একসা। ধমকাবার কেউ নেই। সন্ধে পেরিয়ে ও-বাড়িতে সেদিন পুজোর কেনা-কাটার বহু রঙিন প্যাকেট ফিরে এলো। অথচ বাচ্চাগুলোর জন্যেও কিন্তু উনুনে আঁচ পড়ল না।

বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন

আবদুর রউফ

বাঙালি মুসলমানের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনার আগে কিছুটা পিছনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই অঞ্চলে ইসলামের সূচনাপর্ব থেকে বাঙালি মুসলমানের বিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে এখানকার ধর্মান্তরিত এবং বহিরাগত মুসলমানদের সংস্কৃতির সমন্বয়ে বাঙালি মুসলমানদের পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তা গড়ে উঠতে লেগে গেছে কয়েক শতাব্দী। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উল্লেখিত দুই ধরনের মুসলমানদের জীবনে মূলতঃ তাদের পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল।

ড. শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত

যদিও ড. শহীদুল্লাহ্‌র মতে এই বাঙলামুলুকে ইসলাম ধর্মের প্রসারের সাথে সাথেই উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণ এবং রূপান্তর শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে বাঙলা-ভাষার শব্দভাণ্ডারের দিকে তাকালে এই মিশ্রণের স্বরূপ অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র "বাঙালী জীবনে মুসলমান প্রভাব" নিবন্ধ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "অব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ ধর্মাশ্রিত সকলের 'হিন্দু' এই আখ্যা প্রদান করিয়া মুসলমান হিন্দুর জাতীয়তা গঠনে সাহায্য করিয়াছেন।" এরপর ড. শহীদুল্লাহ্‌ "বাঙ্গালী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন মূলতঃ হিন্দু বাঙালিদের বোঝানোর জন্য। যদিও নিবন্ধের শেষে "বাঙ্গালী" বলতে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই বুঝিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় আমরা পাই "মুসলমানদের নিকট বাঙ্গালী 'তখত পোষ', 'তোষক', 'তাকিয়া', 'বালিশ', এবং 'গালিচার' ব্যবহার শিখিলেন।...

"বাঙ্গালীর পোষাকেরও প্রায় পনর আনা মুসলমানের প্রদত্ত। মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে পুরুষদিগের ধুতি উড়ানি ও জুতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শাড়ী ব্যতীত আর কোন কাপড় ছিল না। 'দরজী'র ব্যবসায় কেহ জানিত না এবং বাঙ্গালীর তাহাতে কোন প্রয়োজনও ছিল না। এখনও পূজাপার্ব্বণে বাঙ্গালী অ-সেলাই বস্ত্র পবিত্র মনে করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মুসলমানের নিকট বাঙ্গালী 'জামা'

'মোজা', 'কামিজ', 'পিরান' এবং 'রুমালে'র ব্যবহার শিখিয়াছেন।... 'আতর', 'গোলাপ জল', 'সাবান' এবং চশমার ব্যবহার মুসলমানেরই অনুকরণে। 'ঢোল', (দহল), 'সেতার', 'তবল', 'রবাব', মুসলমানরাই এদেশে আনিয়াছেন। মুসলমানের কাছে বাঙ্গালী 'পোলাও', 'কোর্ম্মা', 'কোফ্‌তা', 'কালিয়া', 'কাবাব', 'শিরকা', 'আচার', 'মোরব্বা', 'শরবৎ', 'শিন্নি', 'পনীর', 'চিনি', 'বরফ', 'নবাত', এবং 'হালুয়া' খাইতে শিখিয়াছেন।

"মুসলমানই এদেশে 'শালগম', 'তরমুজ', 'খরবুজ', 'নাশপাতি', 'তুত', 'পেস্তা', 'বাদাম', 'আঙ্গুর', 'মুনক্কা', এবং 'পুদীনা' আনিয়াছে।...

"...আগে হাট বসিত সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন, এখনও পাড়াগাঁয়ে তাহাই হয়। সকল সময় সেখানে জিনিসপত্র 'খরিদ' করিতে পারা যায় এমন কোন 'বন্দোবস্ত' ছিল না। মুসলমান আসিয়া 'বাজার' 'দোকান' এবং 'মুদিখানা' (আ-মুদা, সংসারের আবশ্যক দ্রব্য) বসাইলেন। এই সময় হইতেই 'পাল্লা', 'মুনাফা', 'লোকসান', 'নমুনা', 'বদল', 'রসীদ', 'বেবাক', 'বাকি', 'ফাজিল', 'জমা', 'খরচ', 'হিসাব', 'নিকাশ', 'একুনে', 'তহবিল', 'ফর্দ্দ', 'বায়না', 'সরবরাহ', 'মৌজুদ', 'দাদন', 'তাগাদা', 'রোক', 'নগদ', প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালায় অধিকার লাভ করিয়াছে। 'মন', 'সের', ও 'গজের'—প্রচলন মুসলমানেরা করিয়াছেন।...

"মুসলমানেরাই অব্রাহ্মণ চণ্ডালের জন্য এক 'আইন-কানুন' করেন এবং বিচারের সাহায্যের জন্য 'উকিল', 'মোক্তার', প্রভৃতি বৃত্তির প্রচলন করেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এদেশে এখন যেমন বিচার প্রণালী প্রচলিত আছে, মুসলমান আমলে তাহার চৌদ্দ আনা ছিল। আদালতের সংস্পর্শে 'হিজরী' সন বাঙ্গালা সন রূপে প্রচলিত হইয়াছে। এই রূপেই 'সাল' (বৎসর) 'তারিখ', 'রোজ', 'ওজর', 'কর্জ্জ', 'ক্রোক', 'স্তিহার', 'খাজনা', 'খুন', 'জখম', 'জবাব', 'জমা', 'জমি', 'জায়গা', 'জল্লাদ', 'জাল', 'জোর', 'দখল', 'দফা', 'দাগী', 'দাঙ্গা', 'নকল', 'নাবালক', (ফা-আ-না, 'বালেগ'), নালিশ, 'পেশা', 'ফেসাদ', 'ফসল', 'ফেরেব', 'ফেরার', 'বাকি', 'বাতিল', 'বাবৎ', 'রায়ত', 'মাফ', 'মুনিব', 'রদ', 'রাজী', 'রফা', 'মরত', 'সাজা', 'সুদ', 'হক', 'হুকুম', প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে।

"বাঙ্গালী হিন্দু, এখনও 'কানুনগো', 'মীরবহর', 'সরখেল', 'মহলানবিশ', 'খাশনবিশ', 'মল্লিক', 'রায়', 'সরকার', 'খাঁ', 'মজুমদার', 'মুস্তফী', 'মুনশী', প্রভৃতি মুসলমান বাদশাহ্‌ নবাবদিগের প্রদত্ত উপাধিগুলি সাদরে বহন করিতেছেন।"

পরিশেষে ডঃ শহীদুল্লাহ্ আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ধন-দৌলত', 'গরীব'-'কাঙ্গাল', 'হাট'-'বাজার', 'জিনিস'-পত্র, লজ্জা-'সরম', 'চালাক'-চতুর, কাণ্ড-'কারখানা', লোক-'লস্কর', খানা-'খন্দক', শাক-'সবজী', ঝড়-'তুফান', মুটে-'মজুর', হাসি-'খুশী', প্রভৃতি শব্দগুলি যেমন গলাগলি করিয়া রহিয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান কি এইরূপ গলাগলি করিয়া থাকিবে না ?" বাস্তবিক, শহীদুল্লাহ্ যখন এই নিবন্ধ লিখেছেন সেই সময় বাঙালি সমাজে এইভাবে আক্ষেপ করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

মিশ্র ভাষারীতির কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম আলাদা হলেও পৃথক কোনো জাত্যাভিমানের শিকার তারা তখনও হয়নি। তাই ভাষা এবং সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছিল অবাধে। দোভাষী পুঁথি কিংবা মিশ্রভাষা রীতির কাব্যেই প্রথম টের পাওয়া যায় বাঙালি মুসলমানেরা তাদের আলাদা জাত্যাভিমান ঘোষণায় তৎপর হয়েছে। মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে বঙ্গভাষায় বিকাশলাভ করেছিল এই মিশ্রভাষা-রীতির কাব্য। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ আনিসুজ্জামানের আলোচনা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।—

"বাংলার মানুষ যাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মুসলমান যাঁরা বিদেশী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে এদেশে এসেছিলেন, বাংলার লৌকিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেন নি। রক্তের সমন্বয় এই কাজ অনেক দূর এগিয়ে দেয়।"

"তবে হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির প্রভাবে মুসলিম-মানসে একটা ভিন্ন প্রতিক্রিয়া-ও জেগেছিল। ফলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপন্ন করার জন্য অনেকেই ভেতরে ভেতরে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা আর দেশীয় সংস্কার মিলে লৌকিক দেবদেবীর জায়গায় তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। মুঘল আমলে উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এবং ইরানী বাস্তুত্যাগীদের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় বহু ধর্মনেতা ও পীর ফকির দেখা দেন। তাঁদের শিক্ষা ও প্রেরণা এবং পূর্ববর্তী পীর-মুরশিদদের স্মৃতি ধর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে বাংলার মুসলমানকে প্ররোচনা দিল। তাই উগ্রতা কিংবা অলৌকিকতা অথবা বাস্তব লাভালাভ দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার

যে প্রচেষ্টা ইতঃপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করল। ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ-অনুসরণ, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফের-দলন-কাহিনী, পীরের কাছে দেবদেবীর পরাজয়-বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তবু তাঁরা হয়তো জানতেন যে, জেহাদী মনোভাবটাই মানবচিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়, তাই সুকুমার অনুভূতির চাহিদা মেটাতে ধর্মের মোড়ক দেয়া প্রণয় কাহিনীও রচিত হল। আর এসবের অধিকাংশের মূলই হচ্ছে ফারসী রচনা : অবশ্য তার অনেকগুলোই আবার বাংলায় এসেছিল উর্দু বা হিন্দীর মাধ্যমে।" (মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য, পৃ. ১১৪) এইভাবে বাঙালি মুসলমানের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা। এখানে উল্লেখ্য, বাঙালি হিন্দু যেমন উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই পুঁথি-পাঁচালি, মঙ্গলকাব্যের পর্ব শেষ করে দিয়ে আধুনিক রস-সাহিত্যের আস্বাদ নিতে শুরু করেছিল, বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে সাহিত্যরসবোধের সেই উত্তরণ তেমন ভাবে হয়নি। এর কারণ মুসলিম জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

ওয়াহাবী এবং ফারায়েজী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বাঙলায় ব্যাপকভাবে বিকাশলাভ করেছিল ওয়াহাবী এবং ফারায়েজী আন্দোলন। এই উভয় আন্দোলনের মূল কথা ছিল, হজরত মোহাম্মদের আমলের প্রাথমিক বিশুদ্ধ ইসলামের প্রবর্তন। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামের অনুসরণকারীদের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় এবং সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে কোরআন-নির্দেশিত এবং স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের দ্বারা অনুসৃত যেসব বিধি-বিধান প্রচলিত হয়েছিল তার বাইরে যা-কিছু সবই অনৈসলামিক সুতরাং বর্জনীয়, এই ধরনের মানসিকতা উল্লেখিত দুই আন্দোলনের প্রভাবে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে বিশেষ করে গ্রামীণ মুসলমান জীবনে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত আমোদপ্রমোদ এবং চিত্তবিনোদনের জন্য যেসব ললিতকলা চর্চার প্রচলন ছিল সেগুলির বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ জারি হতে থাকে। উল্লেখিত দুই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ইসলামের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন বিস্ময়কর প্রাবল্য লাভ করেছিল। এর কারণ সম্ভবত সমাজ-মানসে এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া। ওয়াহাবী এবং ফারায়েজী আন্দোলনকে দমন করা হয়েছিল পশুশক্তির নির্মমতায়। তৎকালে হিন্দু

জমিদারদের অনেকেই মুসলমানের দাড়ি রাখার বিরুদ্ধে কর ধার্য করেছিলেন। গোমাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে আয়োজিত হয়েছিল কঠোর বিধি-নিষেধ। ইংরেজ শাসনের বিধিব্যবস্থার কল্যাণে অধিকাংশ নয়া জমিদারই হিন্দু হওয়ায় এবং মুসলমানদের বেশিরভাগই গরীব প্রজাশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় জমিদারি শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এরাই। উল্লেখিত দুই আন্দোলন এসবের প্রতিকার দাবি করেছিল। তাই আন্দোলন যখন পশুবলে দমিত হলো গোটা সমাজমানসে তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী জাত্যাভিমান তীব্র হয়ে উঠেছিল এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এর ফলে বিভিন্ন পূজাপার্বণ উপলক্ষে জমিদারদের আয়োজিত আনন্দানুষ্ঠানে মুসলমানরাও যে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করত সেই উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করে। মূলতঃ হিন্দুপুরাণ-কাহিনীভিত্তিক যাত্রাপালাগান অনুষ্ঠানে যোগ দেয়াটা মুসলমানরা অপছন্দ করতে শুরু করে।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হলো, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া যেসব ললিত-কলার চর্চা বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল সেগুলি সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি এবং পল্লীগীতির চর্চায় মুসলমানদের অংশ-গ্রহণ তো ছিলই এর মধ্যে আবার 'সারি' গান ছিল বাঙালি মুসলমানের একেবারে নিজস্ব সঙ্গীতচর্চা। মহরম উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি ইত্যাদি নানারকম শারীরিক কসরতের যেসব প্রদর্শনী হতো তার একটা প্রস্তুতিপর্বও ছিল। আর এর সঙ্গে গাওয়া হতো শোকসঙ্গীত বা মরশিয়া গান। সত্যপীরের পালাগান শোনার জন্য মুসলমান নরনারী ভিড় করে রাতের পর রাত জেগে থাকত। সুফিসাধনার অঙ্গ মারফতি বা ফকিরি গানের জনপ্রিয়তা সবার জানা। পাড়াগাঁয়ের মুসলিম মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এক ধরনের বিয়ের গীত। কোথাও কোথাও কিছু পরিমাণ নৃত্যভঙ্গিমা সহকারে দফ বা ঢোল বাজিয়ে এই গীত গাওয়া হতো। বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাড়াপ্রতিবেশী মুসলিম মহিলাগণ সম্মিলিতভাবে অন্দরমহলে এই নৃত্যগীতের আসর বসাতেন। শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবে এই ধরনের সমস্তরকম ললিতকলার চর্চাকেই মুসলমানদের মনে হতে থাকে শরীয়ত-বিরোধী কাজ। ধর্মপুরোহিতেরা এসবের বিরুদ্ধে প্রচারও চালাচ্ছিলেন প্রবলভাবে। ফলে ললিতকলা চর্চা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বাঙালি মুসলমানের আগ্রহ কমে যেতে থাকে। এই কারণে মিশ্র ভাষারীতির পুঁথিসাহিত্যের পরবর্তী ধাপে আধুনিক রসসাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করার মতো সূক্ষ্ম নান্দনিক বোধ গড়ে উঠতে তাদের বেশ বিলম্ব হয়ে যায়।

ইংরেজ-প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষার প্রভাব

সংস্কৃতিগত দিক থেকে তথাকথিত শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যখন ললিতকলাবিমুখ মানসিকতা ব্যাপকতা লাভ করছে সেই সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজ-প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষার প্রচলন মুসলমানদের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই শিক্ষার জোরে চাকুরি-বাকুরি, শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি আধুনিক পেশায় নিযুক্ত হতে শুরু করায় মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

বাঙালি মুসলমানদের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাতৃভাষাপ্রীতি-বিকশিত হতে থাকে জীবনচর্যার স্বাভাবিক তাগিদে। এর ফলেই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যরস আস্বাদন, কাব্য-সঙ্গীত-নাটক এবং চিত্রকলার চর্চা নিয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে নানারকম বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়।

ললিতকলাচর্চার সপক্ষে জোরালো মত

…ধর্মপুরোহিত এবং গোঁড়া শুদ্ধিবাদীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ললিতকলাচর্চার সপক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত হতে থাকে। এই ব্যাপারে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"-এর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রণী। এই "সমাজ"-এর কাজী মোতাহার হোসেন এই সময় 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজকে "গৃহহারা" হিসাবে বর্ণনা করে লেখেন, "গৃহহারা হলে লোকে তাকে লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া বলে। মুসলমান সমাজটা বাস্তবিক তাই। গৃহশূন্য লোক একটু আনন্দের জন্য কত ব্যাকুল হয় কিন্তু পায় না। এ সমাজের লোকও একটু আনন্দের জন্য কত লালায়িত, লুব্ধ, তৃষ্ণার্ত, কিন্তু কোথায় পাবে?…

"মুসলমানদের যে গৃহ নেই, তার একটা কারণ, আনন্দের উপকরণের অভাব। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এককথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোনও সংশ্রবেই থাকবে না। মুসলমান পুরুষেরা কেবল কাজ করবে, আর ঘর শাসন করবে; মেয়েরা কেবল রাঁধবে বাড়বে, আর বসে বসে স্বামীর পা টিপে দিবে; তাছাড়া খেলা-ধূলা, হাসি-তামাশা, বা কোনও প্রকার আনন্দ তারা করবে না—সব সময় আদব-কায়দা নিয়ে দুরস্ত হয়ে থাকবে।" ("আনন্দ ও মুসলমান গৃহ," 'সওগাত', ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

সেই সময়ের আর একজন বলিষ্ঠ চিন্তাবিদ, "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"-এর অন্যতম প্রাণপুরুষ আবুল হোসেন "চরিত্র" নামের একটি প্রবন্ধে লেখেন,—"জীবন-চর্চা করে চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই জীবন-চর্চা বলতে বুঝতে হবে জীবনের সর্বপ্রকার প্রবৃত্তি; গুণ ও শক্তিকে সুস্থ ও পুষ্ট করে তোলা। মুসলমান সমাজে কতকগুলি নিষেধ জারি আছে, যার ফলে মানুষের কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানসিক বৃত্তি একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়,—অর্থাৎ মুসলমান সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ ও অভিনয় প্রভৃতি একেবারে একঘরে করে রেখে জীবনকে puritan করে তুলতে ব্যস্ত। এই সমস্ত আর্ট চর্চায় যে মানসিক বৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষের শক্তি সঞ্চিত ও বর্ধিত (conserved) হয় তা মুসলমান বুঝতে রাজী নয়।" ('নওরোজ', ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা)

মোহাম্মদ আকরম খাঁর অভিমত

ইসলামের ইতিহাস এবং কোরআন, হাদিস বিষয়ে সুপণ্ডিত মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে শাস্ত্রীয় যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রমাণ করেন শুদ্ধিবাদীরা এতদিন সঙ্গীতকলা, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি বিষয়ে সমাজমানসে ভ্রান্ত ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি লেখেন, "সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, এছলাম ধর্মে সকল প্রকারের সমস্ত সঙ্গীতকেই নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দেয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের আলেম সমাজ সাধারণভাবে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে যেসব কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেও জনসাধারণের উপরোক্ত বিশ্বাসের যথেষ্ট পোষকতা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করার পর আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জনসাধারণের এই বিশ্বাস, বা আলেম সমাজের এই অভিমত মূলতঃ এছলামের অর্থাৎ কোরআন হাদিছের দলিল প্রমাণের সহিত সমঞ্জস নহে।... এছলামে সকল প্রকারের সঙ্গীত সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ—এই দাবী যাঁহারা করিবেন তাঁহাদিগকেও ঐ প্রকারের কোরআনের আয়াত বা হজরতের হাদিছ, উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টভাবে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমরা দাবী করিয়া বলিতেছি—ত্রিশপারা কোরআনের মধ্যে এরূপ একটি আয়াতও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হজরত রছুলে করিম সঙ্গীত মাত্রকেই নিষিদ্ধ বা না-জাএজ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন—এরূপ একটিও ছহী হাদিছ, আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।" ("সমস্যা ও সমাধান: সঙ্গীত সমস্যা", 'মাসিক মোহাম্মদী', ১ম বর্ষ—১২শ সংখ্যা)

চিত্রকলা সম্পর্কে আকরম খাঁ লেখেন, "সকল শ্রেণীর চিত্র ব্যবহার করাকে এছালাম কোনদিনই হারাম বলিয়া নির্ধারণ করে নাই। বরং হজরত রছুলে করিম স্বয়ং ও তাঁহার সাহাবাগণ, জীব-জন্তুর চিত্রাঙ্কিত পর্দা প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি চিত্র বলিয়াই চিত্রকে হারাম করা হয় নাই, উহা হারাম হওয়ার অন্য কিছু গভীর ও সঙ্গত কারণ আছে। সেই কারণ যেখানে পাওয়া যাইবে, সেখানে জানদার ও বেজান সকল শ্রেণীর চিত্রই হারাম হইবে। আর যেখানে সে কারণ পাওয়া না যাইবে, সেখানে জীবজন্তুর চিত্র ব্যবহার করাও সিদ্ধ বা জাএজ হইবে।" ("চিত্রকলা ও এছলাম," 'মাসিক মোহাম্মদী', ৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা)

"ছবির ব্যবহার আমাদের দেশের আলেমগণও গত দেড়শত বৎসর হইতে নিয়মিতভাবে করিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশে ডাক টিকিটে ছবি, স্ট্যাম্পে ছবি, কোর্ট ফিতে ছবি, নোটে ছবি, লেফাফা ও পোস্টকার্ডে ছবি। আমাদের ভক্তিভাজন আলেমগণ দ্বিধাহীনভাবে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছেন। টাকা, পয়সা প্রভৃতি তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতেছেন। সেগুলিতে ছবি ও মূর্তি উভয় থাকে। এই সমস্ত ছবি ও মূর্তি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা মছজিদে প্রবেশ করিতেছেন, কোরআন, হাদিছের সঙ্গে একত্রে বাক্স পেটরায় তাহা বন্ধ করিয়া রাখিতেছেন।" ("চিত্রকলা ও এছলাম"—'মাসিক মোহাম্মদী', ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা)

বাস্তবিক মওলানা আকরম খাঁর মতো সুপণ্ডিত আলেম ব্যক্তির এই ধরনের অভিমত সেই সময়ে সমাজে যে অন্যান্য মতামতের চেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে ডঃ আনিসুজ্জামান যথার্থই বলেছেন, "একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আমাদের সমাজের গোঁড়া আলেমদের সঙ্গে মওলানা আকরম খাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত বিরোধ কত গভীর। আর সে বিরোধে মওলানা আকরম খাঁর ভূমিকা লোকহিত ও প্রগতির পক্ষে।" ("মওলানা আকরম খাঁ: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক", 'মাসিক মোহাম্মদী', ৩৯ বর্ষ—৯ম সংখ্যা)

আকরম খাঁর অভিমত জনচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করলেও ডঃ আনিসুজ্জামানের মতে, যে সময়ে মওলানা রক্ষণশীলদের শিবিরে থেকেও প্রগতির সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সেই সময়েই বাঙালি মুসলমান সমাজে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ যুক্তিনিষ্ঠায় ও সামাজিক প্রগতি কামনায় আরো অগ্রসর হয়ে পড়েছেন।

তরুণ বুদ্ধিজীবীদের পার্থিব মানবতাবাদী ভাবনা

সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্যাভিনয়, ইত্যাদি চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অগ্রণী তরুণ বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার করতে চাননি। এ সম্পর্কে সেকালের অন্যতম বিশিষ্ট তরুণ বুদ্ধিজীবী আবদুল কাদির সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি চর্চার সপক্ষে কোরআন, হাদিস অবলম্বনে মওলানা আকরম খাঁর যুক্তিজাল বিস্তারের প্রয়াসকে প্রশংসনীয় বলে অভিহিত করেও লিখেছিলেন, "কিন্তু কথা হইতেছে কোনো শিল্পের পরিশীলন বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য কি শাস্ত্রানুমোদনের প্রয়োজনীয়তা আজ বাস্তবিকই আছে? আর্টে মানবচিত্তের ঘটে আনন্দময় মুক্তি, আর্টের চরম ও শ্রেষ্ঠতম হইতেছে ধর্ম, অতএব কোনো আর্ট চর্চায় যে ধর্মের নিষেধাজ্ঞা থাকিতে পারে ইহা বিশ্বাস করা চলে না।" ("সঙ্গীত-চর্চা", 'ছায়াবীথি', ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা) এই প্রবন্ধেই সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "কাব্য ও চিত্র অপেক্ষা সঙ্গীতের সুবিধা অধিক এইখানে যে ইহার প্রভাব আশু—শিক্ষা বা মানসিক প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না রাখিয়াই মুহূর্ত মাত্রে ঘটে ইহার রসের বহুল বিকাশ, রসচৈতন্যে ইহার আবেদন বিস্তার করে ইন্দ্রজাল, কল্পনা ও স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া আত্মাকে নিমজ্জিত করে অনুভূতির রসে—ক্ষণকালের জন্য রচনা করে এক নিজস্ব নতুন পৃথিবী। অবশ্য একথা সত্য যে, সুরের তাল লয় ও খোঁচের বিভিন্ন ভঙ্গির সমাবেশে, চরিত্র বৈশিষ্ট্যও ফুটিয়া ওঠে, সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বিস্তারের মধ্য দিয়াই প্রকট হইয়া ওঠে উদাস গাম্ভীর্য, শ্রান্তবিষাদ, গভীর শান্তি, একান্ত নির্ভরতা, আকুল অনুরাগ, সংক্ষুব্ধ সংরাগ প্রভৃতি মানবমনের বিভিন্ন অবস্থার বিকাশ।...

"সাহিত্যের মতো ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের সমস্যা, নীতি ও দুর্নীতির নয়। রচয়িতার যুগসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সঙ্গীত যুগান্তরে স্বীকৃত হইল তাহাই ক্লাসিক। বস্তুতঃ সঙ্গীতের আলোচনা হইবে তার রসবস্তু ও গঠনরীতির আলোচনা; ধর্মনীতির তুলাদণ্ডে কোনো শিল্পানুশীলনের বিচার অবাঞ্ছনীয় বই কি।"

চিত্রকলা সম্পর্কে মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ তাঁর "মুক্তির আগ্রহ বনাম আদেশের নিগ্রহ" প্রবন্ধে লেখেন, "এই বিংশ শতাব্দীতে এমন আজগোবী বা ঐন্দ্রজালিক সাহসী মিলিবে না, যে একটি মানুষের চিত্র অঙ্কন করিয়া বা মূর্তি প্রস্তুত করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের সমান ক্ষমতাশীল বলিয়া কল্পনা করিতে সাহস করিবে। জীবের চিত্র অঙ্কিত করা যদি সৃষ্টিকর্তার সহিত প্রতিযোগিতা করার সমান হয়, তবে বৃক্ষলতা পত্র-পুষ্পের চিত্র অঙ্কিত করাও সেইরূপ একটা কিছু করার সমান না হইবে

কেন? বিজ্ঞানের এমন কোনো উন্নতির যুগ আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যখন মানুষের বুদ্ধি সামান্য পত্রের মধ্যে যে স্নায়ুজাল, যে মেরুদণ্ড, যে শাখা মেরুদণ্ড দিবারাত্র কার্য করিয়া যাইতেছে, সে শক্তি প্রদান করিতে পারে। জীবের চিত্র অঙ্কন করা ইসলামের নবোত্থান যুগে যে কারণেই পাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকুক না কেন, এ যুগে পাপ বলিয়া মানিয়া লওয়া অনাবশ্যক।" ('সওগাত', ৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা)

"মুসলিম সাহিত্য সমাজ"-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণ বুদ্ধিজীবীগণ নাটক রচনা এবং নাট্যাভিনয়ের পক্ষেও তাঁদের জোরাল মত ব্যক্ত করেছিলেন। "নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ" নামে একটি প্রবন্ধে আবদুল সালাম খাঁ লেখেন, "প্রথমেই চোখে পড়ে অভিনয়ের বিরাট appealing শক্তি। সমাজের সাধারণ লোক খুব বিখ্যাত বাগ্মীর বক্তৃতায়ও যত না উপস্থিত হয় তাহার তিনগুণ হয় যে কোনো বাজে অভিনয়ে। এক দিনের ওথেলোর অভিনয় দুনিয়ার হাজার হাজার ছোটখাটো ইয়াগোর যে অভিজ্ঞতা দিতে পারিবে, তাহা দেওয়া বক্তৃতা ও অসংখ্য কেতাবের পক্ষেও তত সহজ হইবে না। একথা জোর করিয়া বলা চলে। এই appeal করার শক্তি একটা বিরাট জিনিস। সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের পক্ষে এরকম একটা mechanism বড়ই উপযোগী। ইহার সাহায্যে সাধারণের মন বেশ গোপনে ও সুনিশ্চিতভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয়।...অভিনয়ে যে কেবল ধর্মের জয় ও অধর্মের পতনই দেখিবে তাহা নহে, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফল, একতা, শিক্ষা ও ব্যবসার উন্নতির মনোহরচিত্র, মানব জীবনের গূঢ় রহস্য, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ইত্যাদি দেখিয়া সাধারণের ধারণার যে গতি, তাহাতে উহা সমাজের পক্ষে কোনো অবস্থায় না-জায়েজ তো নয়ই বরং অত্যন্ত জায়েজ বলিলেও বোধ হয় অপরাধ হয় না।" ('শিখা', ১ম বর্ষ ১৩৩৩, পৃ. ১০১-০২)

সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি চর্চার পক্ষে অবাধ সামাজিক বাতাবরণ তৈরির জন্য সেকুলার বা পার্থিব মানবতাবাদী বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিতর্কের ধারা অনুধাবন করলেই বোঝা যায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতিপন্থী বাঙালি হিন্দুদের তুলনায় বাঙালি মুসলমানের সমস্যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এমন এক ধরনের সামাজিক বিরুদ্ধতার মোকাবেলা তাদের করতে হয়েছিল যা কেবল মুসলমান সমাজেরই বৈশিষ্ট্য এবং এই দ্বন্দ্বসংঘাতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিচেতনার স্বরূপকে অনেকখানি চিহ্নিত করা যায়। রক্ষণশীলদের সঙ্গে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের একটা

বিশেষ সময়সীমা জুড়ে দীর্ঘ বাদানুবাদ চলতে থাকায় অনুসন্ধিৎসু বাঙালি মুসলিম-চিত্ত যখন ধীরে ধীরে তার সময়োপযোগী সংস্কৃতির চেহারাটাকে চিনে নিতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়েই দেশ ভাগ হয়ে যায়। ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতিমনস্ক অগ্রণী অংশের প্রায় পুরোটাই চলে যায় পূর্ব বাঙলায়।

বিভাগোত্তর পর্যায়ে পশ্চিম বাঙলার মুসলিম-মানস

দেশ ভাগের আর সব বিষময় ফলের সাথে সাথে প্রায় বুদ্ধিজীবী শূন্য হয়ে পড়ায় আঘাতটা পশ্চিম বাঙলার বাঙালি মুসলিম মানসের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় সংকটজনক। এই সংকটাবস্থার হাত থেকে তারা আজও মুক্তি পেয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। মুক্তি আন্দোলনের প্রভাবে কোরআন হাদিসের নির্দেশ সম্পর্কে মওলানা আকরম খাঁর ভাষায় যেসব "ভ্রান্তব্যাখ্যা" সমাজমানসের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীরা তার মূল উৎপাটিত করবার আগেই দেশ ভাগ হয়ে যায় এবং তাঁরা প্রায় সমবেত ভাবে বাঙলার পূর্ব অংশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়ে সেখানেই তাঁদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মকে কেন্দ্রীভূত করেন। ফলে বাঙলার পশ্চিম অংশের মুসলমানদের মধ্যে ললিতকলার চর্চাবিমুখ তথাকথিত ভ্রান্ত ধারণাগুলিই প্রবল প্রতাপে বিরাজ করতে থাকে। ধর্মপুরোহিতগণও তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই সযত্নে ঐসব ভ্রান্ত ধারণাগুলিই সমাজমানসে জিইয়ে রাখতে প্রয়াসী হন। এই ভাবেই কেটে যায় দুই-তিন দশক। আধুনিক ধ্যান-ধারণার অর্থে রিক্ত এবং নিঃস্ব পশ্চিম বাঙলার বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনা অতিবাহিত হতে থাকে ঘোরতর বিভ্রান্তির ভিতর দিয়ে।

আধুনিক জীবনধারার নিজস্ব গতি

দেশ ভাগের তিন দশকের মধ্যেই পশ্চিম বাঙলার বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আবার নতুন করে শিক্ষিত সমাজের উদ্ভব হয়। নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকারি চাকরি, ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা, ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এই নব্য শিক্ষিতদের ভেতর থেকে আবার উদ্ভব ঘটে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কিন্তু এই মধ্যবিত্তদের মধ্যে আধুনিক মননধর্মী সংস্কৃতির চর্চা কোনো সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে না কোনোমতেই। জিনিসটা সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তির মধ্যে। ফলে সামাজিকভাবে বিচার করলে একথা নিঃসংশয়ে

বলা যায় এখানকার বাঙালি মুসলমানেরা সাংস্কৃতিক জীবন অদ্ভুত এক স্ববিরোধিতার নজির এবং জোড়াতালি দেয়া ব্যাপার।

পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বর্তমানে শিক্ষিত আধুনিক বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। হাটে-বাজারে, ট্রেনে-বাসে, অফিসে-আদালতে গোঁফ ছাঁটা-দাড়িওয়ালা-লুঙ্গিপরা মুসলমান যে পরিমাণ দেখা যায় প্রায় সম পরিমাণেই শিক্ষিত আধুনিক মুসলমান এইসব স্থানে থাকতে পারেন, কেবলমাত্র পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে কিংবা কিছুটা কথাবার্তা শুনে তাদের চিনে নেয়া সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটা কেবলমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে নয় মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লেখাপড়া শেখা কিংবা চাকুরি-বাকুরির সূত্রে মধ্যবিত্ত মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরুচ্ছে ক্রমেই অধিক সংখ্যায়। তাদেরও পোশাক-পরিচ্ছদ, শাড়ী পরার ধরন ইত্যাদি দেখে "এরা মুসলমান" এইভাবে চিহ্নিত করা আর সম্ভব নয়। জীবনযাত্রার স্বাভাবিক তাগিদেই পোশাক-পরিচ্ছদের বর্তমান ধরনটা আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মেনে নিয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে সচেতন মনোভাব কিছুমাত্র নেই। থাকলে, তাদের শুদ্ধি আন্দোলন-প্রভাবিত চেতনার স্তরে অন্ততঃ মেয়েদের বর্তমান পোশাক কিছুতেই অনুমোদন পেত না। এ নিয়ে বিতর্ক হতই!

এইসব আধুনিক মুসলমান, যাঁরা ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে সসম্ভ্রম নীরবতা পালনের পক্ষপাতী তাঁদের অবসর জীবনযাপন প্রণালীও বেশ কৌতুকপ্রদ। এঁদের বেশির-ভাগই জনসাধারণের অন্যান্য অংশের মতো হিন্দি ফিল্মের আমোদ-প্রমোদের উপকরণ উপভোগ করেন বেশ তারিয়ে তারিয়ে। অথচ ইসলামী অনুশাসনের খুব উদার অনুসরণকারীর পক্ষেও এইসব প্রমোদ উপকরণ অনুমোদন করা সম্ভব নয়।

আকাশবাণী কিংবা দূরদর্শনের গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা ইত্যাদির অনুষ্ঠান সূচী কোনো আধুনিক মানুষের পক্ষে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। মুসলমানরাও ঘরে ঘরে এইসব অনুষ্ঠান বেশ উৎসাহের সঙ্গেই উপভোগ করে চলেছেন। মফঃস্বল অঞ্চলে আধুনিক কালের থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা দেখার জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ দেখা যায় এই উৎসাহী জনগণের একটা বেশ বড় অংশ মুসলমান। ইসলামী অনুশাসনের দৃষ্টিতে এই ধরনের সব বিনোদন আদৌ অনুমোদনযোগ্য কিনা, যদি তা না হয় তাহলে বিনোদনের বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে? এইসব প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মাথা ঘামাতে যে চাইছেন না সেটা মোটেই সেকুলার কিংবা agnostic দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নয়, আসলে তাঁরা এই ধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান।

ভাবের ঘরে ফাঁকি

ভাবের ঘরে এইভাবে ফাঁকি দেয়ার ফলে পশ্চিম বাঙলার বাঙালি মুসলমানের সামাজিক জীবনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরির কাজ ব্যাহত হচ্ছে নিদারুণ ভাবে। মুসলমানের সবচেয়ে বড়ো উৎসব ঈদ উপলক্ষে তাই নতুন জামা-কাপড় আর খাওয়াদাওয়া ছাড়া অন্য কোনোরকম আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না আদপেই। বাঙালি মুসলিম জীবনে উৎসবের দিনরাত্রি তাই গতানুগতিকতার অনুবর্তনে বিবর্ণ। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সমাজের বুদ্ধিজীবীদের তরফে কোনোরকম সচেতন প্রয়াস না থাকায় জীবনের নিজস্ব তাগিদে অত্যুৎসাহী তরুণেরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে উৎসবের রঙ চড়ানোর চেষ্টায় তৎপর। ঈদ উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা তুলে আলোকসজ্জার বাহার ক্রমেই বাড়ছে আর বাজছে তার স্বরে গানের রেকর্ড। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব গানের বেশির ভাগই হিন্দি ফিল্‌মের হিট্ গান। ধর্মপুরোহিতেরা শত তিরস্কার করেও এসব দমাতে পারছেন না। ইদানীং শবেবরাতকে রূপান্তরিত করে ফেলা হচ্ছে একদম হিন্দুদের দেওয়ালীর রাতে। ঠিক দেওয়ালীর মতোই আলোকসজ্জা এবং বোম পটকা ফাটানোর সমারোহ। ইসলামী অনুশাসন কিছুতেই এসব অনুমোদন করতে পারে না। কিন্তু ঠেকানো যাচ্ছে না কোনোমতেই।

কিছু সৎ প্রয়াস এবং তার পরিণতি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কিছুকাল থেকেই কিছু ছোটো-বড়ো পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক মজলিশ গড়ে তোলার প্রয়াস চোখে পড়ে। এইসব মজলিশে গল্প কবিতা ইত্যাদি পড়া হয় এবং তাই নিয়ে আলাপ আলোচনাও হয়। কিন্তু এই ধরনের কোনো মজলিশেই প্রাক-বিভাগ পর্বের মতো আদর্শগত দিক থেকে বলিষ্ঠ কোনো প্রশ্ন তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এঁরা কেউই বিষয়টাকে এমন-ভাবে বিচার করতে চাইছেন না যে, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে? সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি চর্চার প্রশ্নে ধর্মীয় আদর্শের অনুমোদন না থাকলে তাঁরা কি করবেন? বিষয়টিকে এইভাবে বিচার না করলে সাংস্কৃতিক জীবনে অনুসরণীয় আদর্শ-(Ideal)-এর ধারণা স্বচ্ছ হবে না কোনোদিনই! ফলে এই সমাজ থেকে বড়ো মাপের শিল্পী-সাহিত্যিক বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া ব্যাহত হতেই থাকবে।

তাই দেখা যায় আধুনিক জীবনযাত্রার স্বাভাবিক তাগিদে কিছু কিছু মুসলিম তরুণ তরুণী সামাজিক নিরুৎসাহ সত্ত্বেও বিভিন্ন ললিতকলার চর্চায় মনোনিবেশ করে কেউ কেউ কিছুটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও তাঁরা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন না। কারণ সমাজজীবনে প্রোথিত শিকড় থেকে তাঁরা কোনো রস পান না। সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাট্যাভিনয়, নৃত্যকলা, যাত্রা, সিনেমা ইত্যাদি যাঁরা চর্চা করেন প্রায় ক্ষেত্রেই সেইসব বাঙালি মুসলমানকে যাপন করতে হয় হিন্দু-ঘেঁষা বিচ্ছিন্ন এক বেদনাময় জীবন। এইভাবে শুধু তাঁরা নয়, বাঙালি মুসলিম সমাজও বঞ্চিত হচ্ছে আনন্দের রসধারা থেকে। তাই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় এপারের বাঙালি মুসলমান আজও প্রাক্-বিভাগ পর্বের মতোই "গৃহহারা"। আধুনিক জীবনযাত্রার নিজস্ব বেগের গড্ডলিকা প্রবাহে ভালোমন্দ কোনো কিছু বিচার না করেই মাথা হেঁট করে এগিয়ে চলা ছাড়া এইসব 'গৃহহারাদের' কোনো গত্যন্তর থাকছে না।

"অমানুষ"

নবকুমার বসু

রাস্তাঘাটে বেরুলে কিংবা বেড়াতে গেলে সাধারণত যেসব অসুবিধা থাকে, মলয়ের কাছে সেগুলো কোনো ব্যাপার না। যে-কোনো অসুবিধা অস্বস্তি, বিব্রত বোধ করার মতো ঘটনা মলয় খুব দ্রুত কাটিয়ে ফেলতে পারে। শুধু যে নিজের জন্য তাই নয়, সঙ্গে যে ক'জন থাকে তাদের জন্যও ও একেবারে প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব মুশকিল আসান।

আমাদের গাড়ি নিয়ে বেরুবার কথা ছিল ভোর সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। যথারীতি ঘুম থেকে ওঠা, তৈরি হওয়া, টুকিটাকি জিনিসপত্র গোছানো এসব সারতেই পাঁচটা বেজে গেল। তাহলেও কলকাতার রাস্তায় অন্তত সকাল পাঁচটায় এখনও ট্রাফিক জ্যাম হয় না। আর ছটার মধ্যে যদি হাওড়া পার হয়ে বালটিকুরির কাছে ন্যাশানাল হাইওয়ে ধরে ফেলতে পারি, তাহলে বেঁচে গেলাম। বম্বে রোড ধরে টানা ছুটবো।

কোথায় যাব ঠিক নেই। শুধু কয়েকটা পয়েন্ট্ ঠিক করা আছে ভাসাভাসা। আমরা সেই নিশানাগুলো লক্ষ্য করে গাড়ি চালিয়ে যাব। ইচ্ছে করলে সেগুলোও মাঝপথে পালটিয়ে ফেলতে পারি। সবশুদ্ধ আমরা চারজন।

ঠিক পাঁচটা পাঁচ মিনিটে আমরা মলয়দের সবুজ শহরতলী উপনিবেশের দোর-গোড়ায় পৌঁছে পিপ্ করে হর্ন বাজালাম। মলয় চারতলায় থাকে। গাড়ি থেকে না নেমেই মুখ বাড়িয়ে ওপরে তাকিয়েছি, তখনই রাস্তার পাশে গাছতলা থেকে মলয়ের গলা পেলাম—ওপরে কী দেখছো! ঠিক পৌনে পাঁচটায় নেমে এসে গাছতলায় বসে আছি।

সত্যিই তাই। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি দুটি ছোট সাইজের বোঁচকা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় রাখা। হাতে কাগজের কাপে চা অথবা কফি নিয়ে মলয় গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। সামান্য অস্বস্তি বোধ করলাম। তারমধ্যেই মলয় গাড়ির মধ্যে হাত গলিয়ে এক কাপ আমাকে আর-এক কাপ টিটোকে ধরিয়ে দিল।

—নাও শালা, কফি খেয়ে ধন্য করো।

গাছতলার দিকে এগিয়ে আরও দু কাপ নিয়ে এলো। টুলু আর ওর নিজের জন্য। আমি বললাম—সরি মলয়, অল্প একটু দেরি হলো।

—এইটুকু দেরি তোমাদের হবে, তা আমার হিসেবের মধ্যেই ছিল। তা নয় তো রেডিমেট গরম কফি নিশ্চয়ই পেতে না।

—থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্।—কফিতে চুমুক দিয়ে আমরা সশব্দে বাজলাম। পিছন থেকে টুলু বললো—সত্যি মলয়দার জবাব নেই।

টিটো বললো—মলয়দা স্টার্ট করবো কখন?

—ঠিক দু মিনিটের মধ্যে। আর এই দু মিনিটের মধ্যে কফি শেষ করে, তোদের যে-কোনো একজন আমার মালটা গাড়িতে তুলে নে। আর একজন কফির জাগ্‌টা ওপরে দিয়ে চলে আয়। আমি সামনে বসছি।

গাড়িতে আমার পাশে বসতে বসতে মলয় হাতের ঘড়িতে চোখ রাখলো। সিগারেট ধরালো দুটো। একটা আমার জন্য। টিটো, টুলু পিছনে এসে বসামাত্র গাড়ি স্টার্ট করলাম। মলয় বললো—রাইট, লেটস্ মুভ।

মলয় আমার বন্ধু। বিজ্ঞাপনের কোম্পানি আছে আর টেলিভিশন সিরিয়াল করছে। টিটো-টুলু আমাদের দুই অসম বয়সের বন্ধু। বছর দশকের ছোট হবে আমাদের থেকে। কিন্তু ওরা আমাদের এবং আমরা ওদের সঙ্গ পছন্দ করি। প্রায় অনুদ্দেশ্যে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবে ওরা এক অভিযানের গন্ধ পেয়ে মলয় আর আমার সঙ্গে ভিড়ে গেছে।

আমার লাল রঙের চকচকে নতুন ভ্যান, ভোরের কলকাতার রাস্তাকে হু হু করে পিছনে ফেলে এগুচ্ছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। শীত যাই যাই করেও যায়নি। গরম আসবো আসবো করেও উত্তরের হাওয়ার চাপে সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কনকনানির চেয়ে স্নিগ্ধতা মিশে রয়েছে বেশি। নরম রোদের লালচে আভা স্পষ্ট হতে হতেই আমরা হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে গেছি। গরম জামা গায়ে রাখার দরকার হয়নি। রাস্তার ভিড়, বাজার দোকান জমে ওঠার আগেই আমরা মৌড়িগ্রাম ফেলে ন্যাশানাল হাইওয়ে-তে উঠেছি। গণ্ডায় গণ্ডায় হুস্ হাস্ ট্রাক আর পেট্রল ট্যাঙ্কার-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই আমরা উলুবেড়িয়ার দিকে ছুটছি।

মলয় বললো—অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। চা আর ফুলুরি খাব।

—ফুলুরি!—আমি গাড়ি চালাতে চালাতেই প্রায় আঁত্‌কে ওঠা গলায় বললাম।—বেহালার বিষ তেলের ঘটনা এখনও দু মাস হয়নি, তোমরা রাস্তায় ফুলুরি খাবে!

—এই শালা ডাক্তার নিয়ে এই জন্য রাস্তায় বেরুন চলে না।—মলয় স্বগতোক্তি

করলো।—ফুলুরি-ই যদি না খেলাম, কচুরি ঘুঘ্‌নি ডালপুরি যদি না খেলাম—তাহলে আর বেড়াতে যাওয়া কেন!

টিটো পিছন থেকে বাজলো।—মলয়দা, আমি আছি।

টুলু বললো—আমি নেই। এমনিতেই আমার পেট ভালো নয়। তার ওপর এখনও তিনমাস হয়নি জণ্ডিস থেকে উঠেছি।

মলয় আওয়াজ দিল টুলুকে।—ভাই টুলু, ঠিক করে বল তো—দু মাস পরে বিয়ে বলে তোর প্রেমিকা বাইরে উল্টো পাল্টা খেতে বারণ করে দিয়েছে কি না! তুই উলুবেড়িয়ায় নেমে একটা টিকিট কেটে হাওড়া চলে যা। আমি রাস্তার সামনে ছোটখাটো ট্রাকের জটলা দেখে গাড়ি স্লো করতে করতে বললাম—কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি, তার কিছু ঠিক করলে!

—তুমি এখানেই সাইড করে গাড়ি রাখো আগে—তারপর দেখা যাবে।

উলুবেড়িয়ার এই জায়গাটা সকাল বেলাতেই দিব্যি জম-জমাট। ট্রাকওয়ালাদের টাকাপয়সা দেওয়া-নেওয়ার বিরাট কারবার চলে এখানে।

হাইওয়ে দিয়ে যাতায়াতের দূর দূরান্তরের যাত্রীরা প্রাতঃকৃত্য সারে এখানে। প্রাতরাশের পর আবার ছুটে চলা। আমরা যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন একটি ধাবা গোছের দোকানে বসেছি। প্লেট ভর্তি গরম গরম কচুরি, ছোলার ডাল আর রস গড়িয়ে পড়া মচমচে গরম জিলিপি চলছে।

আমি খেতে খেতেই বললাম—আমরা এন এইচ সিকস্‌ দিয়ে যেতে যেতে যেখানে রাস্তাটা উড়িষ্যার দিকে বাঁক নিয়েছে ওইখানে নামবো।

মলয় জিলিপি ভর্তি রসালো গলায় বললো—বাহারাগোড়া!

—হ্যাঁ। আগে গিয়েছো কখনও? দারুণ জায়গা কিন্তু। দুটো ফাস্টক্লাস বাংলো আছে।

টিটো বললো—কেন, আমরা চাণ্ডিল যাবো না? জঙ্গলের পাশ দিয়ে উঠে গিয়ে নদীর ধারে ওখানেও তো বাংলো আছে। মেসো যে বলেছিলে রাঁচী যাওয়ার রাস্তায় চাণ্ডিল অসাধারণ জায়গা!

টিটো আর টুলুর 'মেসো' আমি। সম্পর্কের চেয়ে বেশি, নামে মেসো। ওদের কোনো কোনো বন্ধু আমাকে মেসোদা বলেও ডাকে। যেমন জেঠু বলে আমাদের কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ এক বন্ধুকে আমরা জেঠুদা বলি।

মলয় বললো—এখন কিছুই ঠিক করে লাভ নেই। আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে হাইওয়ে ধরে টানা যাব, যেখানে মনে হবে সেখানেই দাঁড়াব।

—দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হবে কোথায়?—টুলু জিগ্যেস করলো।

মলয় হো হো করে হাসলো।—সত্যি তোকে নিয়ে আর পারা গেল না রে। আমাদের কারুর কি আর বিয়ে হয়নি!

এখনই দুপুরের খাওয়ার চিন্তা! আজ তো দুপুরে আমরা পিকনিক করবো।

টুলুকেই চারজনের মধ্যে চেপে ধরা হয়েছে। ওর বিয়ের খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সুযোগ পেলেই সেই উপলক্ষে ওকে আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে।

আমি বললাম—পিকনিক! কোনো ব্যবস্থাপত্র—সরঞ্জাম নেই। পিকনিক হবে কী করে!

—তুমি বস্‌, সেসব আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের বিরিয়ানী খাওয়াব আজ।

—আজ হলো।—টিটো বললো।—কপালে দুঃখ আছে বুঝতে পারছি। মেসো একটা সিগ্রেট দাও।

মলয় প্রায় জ্যাঠামশায়ের গলায় বললো—টিটো, গুরুজনদের ওপর ভরসা রাখার শিক্ষাটা তোর পুরো হয়নি। আর সেই কারণেই পানিশমেণ্ট হিসাবে তুই এখন সকলের জন্য ফাসক্লাস করে মিষ্টি পান নিয়ে আয়।

গাড়ি চলছে। সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার স্পিড। রোদ উঠেছে, কিন্তু গরম নেই। ফাঁকা হাইওয়ের দু'পাশে সবুজ ক্ষেত আর গাছগাছালি নিয়ে গ্রাম-বাংলা ছুটে চলেছে আমাদের সঙ্গে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের দিকে তাকিয়ে চোখ এক অন্যরকম বিশ্রাম পায়। হু-হু বাতাসের ঝাপটা লাগছে চোখে মুখে। আমি স্টিয়ারিঙে শক্ত হাত রেখেই সকলকে একটা মজার সারপ্রাইজ দেব বলে বললাম—আমি এখন তোমাদের একটা গান শোনাব।

—ভেরি গুড, ভেরি গুড।—ওরা একসঙ্গে বললো।

গানটা আমি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি এবং জানি, আসলে গানটার চেয়ে, গানটার বিশেষ এক ধরনের নকল করা গায়নভঙ্গির জন্যই ওরা দারুণ মজা পাবে। আমি আমাদের এক গায়ক বন্ধুর গলা কৃত্রিমভাবে নকল করে, চেপে যখনই এই গানটা গেয়েছি, সকলেই তখন হাসিতে ফেটে পড়ে। সেটাই এখন হবে সারপ্রাইজ।

আমি গলা ছেড়ে নিয়ে বেশ সিরিয়াস ভাব করেই ধরলাম—"নওল কিশোরী গো, কিবা রূপ দেখনু আজ"···।

চাপা গলার গমকে ওই এক লাইনের বেশি আর গাইতে পারলাম না। সকলের

হৈ হৈ হাসির হুল্লোড়ে গাড়ি একেবারে দুলে উঠলো। আমি জানতাম ব্যাপারটা এমনই হবে। হাসির ধকল সামলাতে সামলাতে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি। সকলের চোখের সামনে বুঝতে পারছি, আমাদের সেই গায়ক বন্ধুর গান করার ছবি ভাসছে।

কয়েকটা দিন শুধুমাত্র ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ার মজা হচ্ছে কোনো টেনশন থাকে না। যেখানে ইচ্ছে দাঁড়াতে পারি, যেমন ইচ্ছে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে পারি। বাঁধাধরা সময়ের অদৃশ্য দড়ি যাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে, তাদের কাছে এমন মুক্তির আনন্দ দুর্লভ। আমরা এর পুরোটাই ভোগ করে নেওয়ার মানসিকতা নিয়ে বেরিয়েছি।

বেলা বেড়েছে। বেড়েছে কিঞ্চিত রোদের তেজ। সেই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছারও কিছু বাড়াকমা শুরু হয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও নামা প্রয়োজন। ডেবরার বাজারের কাছে মলয় খুব গভীর অভিনিবেশে চারদিক দেখে-শুনে গম্ভীরভাবে বললো—ঠিক আছে। এই, এইখানেই গাড়ি রোখো। এইটাই ঠিক জায়গা।

গাড়ি রাস্তার ধারে রেখে নামলাম। হাইওয়ের ওপর গঞ্জের বাজার। খুব সম্ভব হাটবার। প্রচুর লোকজন, থরে থরে সাজানো সবজি আর নানান দোকান, মাইকে হিন্দি ছবির গান বাজছে। আমি মলয়কে বললাম—ভাই, কিসের ঠিক জায়গা এটা? চলো এখান থেকে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। আমার এই গোলমাল ভালো লাগছে না।

—দু মিনিট দু মিনিট।—মলয় হাত তুলে আমাকে আশ্বস্ত করলো। তারপর টিটোকে ডাকলো—আয়, আমার সঙ্গে। টুলুকেও ডেকে একটা দোকান দেখালো। —তুই ওই দোকানটায় আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। আমাকে বললো—বস্, তুমি একটু হাত পা নেড়ে ফ্রি হয়ে নাও। এক্ষুণি আসছি।

মলয় কিসের কী প্ল্যান করছে, জানি না। তবে ও যখন নেমেছে, কিছু না কিছু ভাবনা মাথায় নিয়েই নেমেছে—তা বিলক্ষণ জানি। প্রায় মিনিট পনেরো পরে তিনজন ফিরলো। মলয়ের হাতে বিরাট মাটির হাঁড়ি। টুলুর দুই হাত মিলে ডজন খানেক ডাব। টিটো প্রায় মাথায় করে এনেছে বেশ কিছু চ্যালা কাঠ। একহাতে কাঁচা শালপাতার ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে গরম মাছভাজা। বিনবিন করে ঘামছে সকলেই।

ঝপাঝপ জিনিসপত্র উঠে গেল গাড়ির ডিকিতে। মলয় বললো—দাও গাড়ির

চাবি দাও এবার। তুমি রিল্যাকস্ করে বোসো। টুলু তোদের মেসোকে হাঁড়িটা ভালো করে দেখিয়ে, তারপর ডাবের জল আর ভড়্কা সার্ভ কর।

আমি বললাম—কী ব্যাপার বলো তো! হাঁড়ি কলসী কাঠ ডাব···

—আরও আরও অনেক কিছু আছে। চিন্তা কোরো না, তুমি আর একবার "নওল কিশোরী গো" ধরো তো···। কথা বলতে বলতেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে মলয়। ওর-ও খুব ভালো হাত। আমি ঢাকনা খোলা মাটির হাঁড়িতে চোখ রেখে ততক্ষণে তাজ্জব। কী নেই! মাংস, চাল, আলু টমেটো, যাবতীয় মশলা তেল নুন পেঁয়াজ আদা রসুন···সব একসঙ্গে।

—কেমন বুঝছো! গাড়ি চালাতে চালাতেই মলয় বললো—পিকনিকে তোমাদের রোড সাইড বিরিয়ানী খাইয়ে দেব আজ। সেইসব বাজার দোকান সেরে ফেললাম। আর কোনো চিন্তা নেই। টিটো, ফ্লাস্কের মধ্যে বরফ আছে। আর পিছনের ব্যাগে প্লাস্টিকের গ্লাস। ছুরিও আছে। খুব ভালো করে বানা।

কিছু কিছু ঘটনা জীবনে ঘটিয়ে না ফেললে ঘটে না। খড়্গপুর পার হ'য়ে গাড়ি ছুটছে। হাতে হাতে শীতল সুমিষ্ট পানীয়ের গ্লাস ঘুরছে। মাছভাজা শেষ হয়ে গেছে কিছু আগেই। খোলা জানালা দিয়ে ঝোড়ো বাতাস আর পানীয়ের গুণে অপূর্ব এক রিমঝিম ভালো লাগার স্বাদ, বেশ কিছু লুকোনো ক্লান্তিকে দ্রুত হরণ করে নিচ্ছিল। হাইওয়ের দু'পাশে প্রকৃতি রূপ পালটেছে। শাল য়্যুক্যালিপ্টাসের ঘন জঙ্গল ভেদ করে বাংলা ছেড়ে ঢুকে পড়েছি বিহারের সীমানায়। বাহারাগোড়া থেকে এন এইচ সিকস্ ছেড়ে আমরা ঢুকে পড়েছি তেত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক-এ। এই রাস্তাটা আরও ভালো, মসৃণ এবং বম্বে রোড-এর চেয়ে ফাঁকা। মলয়ের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণে আমার নতুন গাড়ির স্পিডোমিটার-এর কাঁটা কেবলই নব্বই পার হয়ে তিনসংখ্যা ধরার চেষ্টা করছে। এই রাস্তা টাটা ঘাটশিলা হয়ে রাঁচীর দিকে চলে গেছে।

মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে মলয় পিকনিক স্পট ঠিক করছে অনুমান করলাম। চড়া রোদ উঠেছে। এখন আর মিঠে ভাব নেই। তাপ আছে রীতিমত। অবশ্য আমাদের কোনোটাতেই অসুবিধা নেই। বেশ কিছুক্ষণের নিরলস পানীয় সেবনে মন মেজাজ ফুরফুরে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে, রাস্তার পাশেই কয়েকটা গাছের মাঝখানে একটি ছায়াঘেরা জায়গায় মলয় থামলো।—কামন্ বয়েজ, হাউ ডু য়্যু লাইক দ্য স্পট!

—এক্সেলেন্ট্, এক্সেলেন্ট্ ! বলতে বলতেই ঝপাঝপ গাড়ি থেকে নেমে আমরা এক-একটি গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছি। পানের প্রভাব চাপা ছিল এতোক্ষণ। সেরে এসে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম—অপূর্ব ! ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠ বহুদূর পর্যন্ত যেন এলিয়ে শুয়ে রয়েছে রোদের নিচে। মাঝে মধ্যে কিছু গাছপালা। বেশ খানিকটা তফাতে একটি জলাশয়ই যে এই জায়গাটি নির্বাচনের কারণ, মলয় তা জানালো। অবশ্যই এই গাছের তলাটিও দরকার ছিল।

গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে। পিকনিক হবে। হবে না বলে, 'হওয়ার কথা' বলা উচিত। কী করে হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। মলয় একটি গাছের গোড়ার কাছে ছোট গর্ত আবিষ্কার করলো। ওর নির্দেশে টিটো টুলু গোটা তিন-চার পাথর এবং মাটির চাঁই নিয়ে এলো। গর্তের চারপাশে সেই ঢ্যালা রেখে দ্রুত তৈরি হলো উনুন। আমি কাঠ নামালাম। মলয় একটি গাছের ডাল ভেঙে রুমাল দিয়ে মুছে হাতা বা খুন্তি জাতীয় কিছু তৈরি করে ফেললো। হাঁড়ি নামানো হলো। রান্নার ব্যাপারটা আমি খানিকটা বুঝি। জল লাগবে আগে। আমাদের জলের স্টক নেই বেশি। ফ্লাস্কে যা ছিল সেখান থেকেই মেপে খানিকটা হাঁড়ির মধ্যে ঢেলে দিলাম। রান্না চাপিয়ে সামনের জলাশয় থেকে···

ঠিক এই সময়ে আমাদের চারটি প্রাণীর অস্তিত্ব এবং উপস্থিতিকে বলা যায় প্রায় সম্বর্ধিত করার জন্যই যেন, গেরুয়া রঙের একটি চতুষ্পদের আবির্ভাব ঘটলো। তার চোখে মুখে চেহারায় ল্যাজের আস্ফালনে অসম্ভব খুশি আর আনন্দের ছটা। গলায় পুলকিত হওয়ার বিচিত্র ঘড়ঘড়ে গুঁইগাই শব্দ। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম ও বললো—এতো দেরি করে পৌঁছলেন, রাস্তায় কষ্ট হয়নি তো ! আমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। ঠিক আছে, আর কোনো চিন্তা নেই, আমি আছি।

আমি শিস দিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললাম।—কী খবর, ভালো তো ?

চতুষ্পদ গেরুয়া বললো—আপনাদের আশীর্বাদে স্যার···

টুলু ঠিক এই সময়েই একটি মাটির ঢ্যালা তুলে ওর দিকে টার্গেট করতেই আমি হাত তুলে ওকে নিরস্ত করলাম।—মারিস না, টুলু। গেরুয়া আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় 'ধন্যবাদ' বললো। এবং পরমুহূর্তেই কৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসাবে, আমাদের হাঁড়ি লক্ষ করে ধেয়ে আসা একটি কাকের দিকে সগর্জনে তেড়ে গেল। ইস্, খুব জোর বাঁচিয়েছে। কাকটা নোংরা ঠোঁটে আমাদের বিরিয়ানীর হাঁড়িতে মুখ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু গেরুয়ার তাড়া খেয়ে গাছের ডালে উঠলো।

আমি চমৎকৃত। গেরুয়া আবার আমার কাছে ফিরে এলো। বাতাসের গন্ধ

শুঁকলো, হয়তো হাঁড়ির মধ্যে মাংসেরও। তারপর একটু তফাৎ রেখে চারদিকে নজর রাখতে রাখতেই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে বললো—আমাদের এখানকার কাকগুলো বড়ো ডেঞ্জারাস। চকিতে ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। তবে, আমি থাকলে স্যার···আমায় ওরা খুব ভয় পায়।

টিটো আর মলয় ইতিমধ্যে উনুন জালিয়ে ফেলেছে। আগুন আর ধোঁয়া একইসঙ্গে উড়ছে। মাটি আর পাথরের ঢ্যালার ওপরে মুখ ঢাকা দেওয়া হাঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটু গরম হতেই মলয় হাতের লাঠি দিয়ে হাঁড়ির ভিতরের সব ব্যাপারগুলোকে নাড়িয়ে ঘুঁটে দিল। পুরো রান্নাটাই হবে স্টিম আর প্রেসারে।

গেরুয়া আমাদের থেকে খানিকটা তফাতে বসে চুপ করে সব ব্যাপারটা দেখছে। একইসঙ্গে অন্য কোনোপ্রকার ঝামেলা আমাদের যেন বিব্রত করতে না পারে, ওর চোখমুখ ঘোরানো দেখে সেটাও বোঝা যাচ্ছিল। ধারেকাছে কাকপক্ষী এলেই, ও যেন আপন কর্তব্যবোধেই তেড়ে যাচ্ছিল তাদের দিকে। আর অযাচিত-ভাবে এমন একটি ভব্য কাকতাড়ুয়া পেয়ে সত্যি বলতে কি আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। নয়তো লাঠি হাতে নজরদারি করার জন্য একজনকে বসে থাকতে হতো। গেরুয়ার আর একটি ব্যাপার লক্ষ করে ভালো লাগলো, আমাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে ও কিন্তু পায়ে পায়ে আমাদের বেশি কাছে এসে ঘনিষ্ঠতা জানানোর চেষ্টা করেনি। দূরত্বটা প্রথম যেমন ছিল, তেমনই বজায় রেখেছে।

আমি গেরুয়াকে দেখিয়ে মলয়কে বললাম—এ যেন একটু অন্যরকম, তাই না ?

মলয় ওর দিকেই তাকিয়ে বললো—থাকো বাবা, থাকো যতক্ষণ আমরা আছি। আজ তোমার কপালেও ডেবরার মাটন বিরিয়ানী আমাদের সঙ্গেই আছে। চারিদিকে খেয়াল রাখো। আমি একটু ঢেলে নিই।

মলয়ের রেকগনিশন-এ গেরুয়া বিলক্ষণ খুশি হলো। লম্বা কান দুটো টানটান করে, ল্যাজ নাড়িয়ে মাটির ধুলো ঝাড়লো। হাসিমাখা মুখেই বললো—এতো আমার কর্তব্য, স্যার। আপনারা থাকলেই আমিও আছি।

আমি খুব অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওর কথাগুলো কী করে আমি সব বুঝতে পারছি !

ডাব-ও আর বেশি নেই। জল শেষ হয়ে গিয়েছে। বিরিয়ানীর হাঁড়িতে ফুট কাটতে শুরু করেছে, ঢাকনার পাশ দিয়ে ফুসফাস করে একটু আধটু বাষ্প বেরুচ্ছে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই খিদে পাওয়া অপূর্ব গন্ধ। ভড্‌কা চলছেই।

আমি আর একবার "নওল কিশোরী গো" গেয়ে নিয়েই, টিটোকে বললাম—ফ্লাস্ক দুটো নিয়ে নে। জল না হলে আর চলবে? সামনের দীঘি থেকেই আনা যাবে।

মলয়কে বললাম—একটু খেয়াল রেখো, তোমার বিরিয়ানীর তলা যেন ধরে না যায়।

ভড়্কার প্রভাবে মলয়ের আমেজ এসেছে। সেই আমেজী গলাতেই বললো—ছাখো বস্, গলা আর তলা এই দুটো ব্যাপারে ধরাধরির মধ্যে আমি নেই। ওটা টুলু দেখবে। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

টিটো আমার সঙ্গী হলো। দুটো ফ্লাস্ক আর একটা ওয়াটার-বটল নিয়ে আমরা ধু-ধু মাঠের মধ্য দিয়ে জলাশয়ের দিকে রওনা হলাম। খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত থাকায় গেরুয়ার প্রতি নজর দিইনি। কিন্তু ও-যে ঠিক নিজের ভূমিকা পালন করছিল, এখন ওকে উঠতে দেখে সেটা বুঝতে পারলাম। একই সঙ্গে অবাক ও খুশি হলাম। কিন্তু আমাদের জল আনতে যাওয়া দেখে ও উঠলো কেন!

শিস দিয়ে জিগ্যেস করলাম—উঠলি কেন? আমরা আসছি।

ও কিন্তু দু'পা এগিয়েই গেল আমাদের থেকে। তারপর পিছন ফিরে তাকালো। অর্থাৎ—চলুন না, আমিও একটু ঘুরে আসি। এই কাছেই তো।

টিটো বললো—মেসো, ও-ও যাবে আমাদের সঙ্গে।

আমি মুখে কিছু বললাম না। ভালো লাগলো ভেবে যে, আমার মতন টিটোও গেরুয়ার কথা বুঝতে পারছে। ও আমাদের দু'পা আগে আগে চললো। খোলা মাঠের ওপর ঝকঝকে রোদ তেজী হলেও, হাওয়ার গুণে বেশ ভালোই লাগছে। আরও ভালো লাগছে এই ভেবে—ধরাবাঁধা জীবনের সঙ্গে একেবারে যোগ নেই, এমন একটা সময় ও দিন কাটাচ্ছি। নয়তো ভাবা যায়, ফেব্রুয়ারি মাসের এক দুপুরে আমরা দুটো শহুরে মানুষ বিহারের এক ধু-ধু মাঠ ভেঙে জল আনতে যাচ্ছি! জলাশয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি, কিন্তু গেরুয়ার গতিবিধি যেন ঠিক আমাদের সঙ্গে মিলছে না। ও বাঁদিক দিয়ে অন্য একটা রাস্তা এবং কিছু ঘরবাড়ি যেদিকে দেখা যাচ্ছে সেই দিকে চললো। একটু দাঁড়ালাম। টিটো আমার দিকে তাকালো। আমরা দুজনেই আন্দাজ করেছি, গেরুয়া এইবার কেটে পড়ছে। আসলে এতোক্ষণ আমরা নিজেদের ভাবনাচিন্তা দিয়ে ওর সম্বন্ধে একটু বেশি ভেবে ফেলে ছিলাম। যাই হোক জন্তু তো!

কিন্তু না, তাও তো নয়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ও-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে যে!

তাহলে ঠিক আছে। আমরা জলাশয়ের দিকে এগোলাম। কিন্তু গেরুয়া নড়ছে না। আমি এবার ডাকলাম—কি হলো! আয়।

গেরুয়া নড়লো না। আমরা ভাবলাম ও আর জলের কাছে যেতে চায় না। আমরা জল নেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যাওয়া হলো না। এই প্রথম গেরুয়ার কণ্ঠ থেকে নিষেধের প্রত্যয় নিয়ে কয়েকবার ঘেউ-ঘেউ শব্দ বার হলো। আমি টিটোকে বললাম—কী হলো? ও চেঁচালো কেন!

গেরুয়া আবার শব্দ করে কাঁদলো। আমি শুনলাম ও বলছে—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। আসুন না আমার সঙ্গে। ও পায়ে পায়ে এগুলো। আমি টিটোকে ডাকলাম—চল তো, দেখি। কী ব্যাপার!

আমাদের আগে আগে গেরুয়া ল্যাংপ্যাং শরীর নিয়ে চলেছে। একটুখানি যেতেই বুঝতে পারলাম—ও সেই বাঁদিকের ঘরবাড়িগুলোর দিকেই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। টিটো আর আমি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। গেরুয়া পিছন ফিরে আমাদের দেখলো একবার, আসছি কিনা। আবার চললো।

বেশিক্ষণ না। মিনিট দুই হেঁটেছি। ছোট্ট একটি গ্রাম গোছের জায়গাটা বলা উচিত। আট-দশটা চালা ঘর, কয়েকটা গাছপালা। তা-সত্ত্বেও রুক্ষ প্রকৃতি আর চূড়ান্ত দারিদ্র্য দুপুরের রোদে জড়াজড়ি করে নিঃঝুম পড়ে রয়েছে। আর গেরুয়া যেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে তার পাশেই হেঁচকে জল তোলার একটা টিউবওয়েল।

আমরাও দাঁড়িয়ে পড়েছি। বিনবিন করে ঘাম জমেছে কপালে। কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পরিশ্রমে গেরুয়ার লম্বা জিভটা এখন মুখ থেকে বেরিয়ে একটু ঝুলছে। তা-সত্ত্বেও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। অনুভব করলাম, আমাদের মধ্যেও এতোক্ষণে কোথাও যেন কৃতজ্ঞতা স্পর্শ করেছে। নির্বাক হয়েছি সেই কারণেই। দ্রুত তিনটি পাত্র জল ভর্তি করে নিলাম। গেরুয়া আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উলটো মুখে ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছে। আমরা পিকনিক স্পট-এ ফিরে আসছি ওর পিছন পিছন।

বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক থাকার পরে টিটো বললো—মেসো, এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। সত্যি ভাবা যায় না। মনে মনে আমিও প্রায় অলৌকিক এই প্রাণীটির কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম আমাদের জায়গায়। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছি, কিছুক্ষণ আমাদের অনুপস্থিতিতে বেশ কিছু কাকের মোকাবিলা করছে মলয় আর টুলু। হাতে লাঠি নিয়ে এপাশ ওপাশ তাড়াচ্ছে। গেরুয়া অপেক্ষা না করেই সম্ভবত নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ছুটে আমাদের আগেই চলে

এলো এবং তীব্র আস্ফালনে কাক চিল তাড়িয়ে, ঠিক সেই আগের জায়গাটিতে বসলো সামনে দু'পা ছড়িয়ে।

রোড সাইড বিরিয়ানী প্রায় হয়ে এসেছে। চমৎকার গন্ধে ভরে উঠেছে আমাদের রাস্তার ধারের ছায়াঘেরা জায়গাটুকু। মলয়দের আনুপূর্বিক সব ঘটনা বললাম। বিস্মিত আনন্দে ওরা শুনলো। শুনলো গেরুয়াও। তারপর লজ্জিত কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে বললো—এই সামান্য ব্যাপারটুকুর জন্য স্যার···

আমরা আর এক রাউণ্ড ভড্‌কার সদ্ব্যবহার করে এবং একবার 'নওল কিশোরী' গেয়ে শালপাতায় পিকনিক-এর বিরিয়ানী নিয়ে বসলাম। সকলেই ইতিমধ্যে অনুভব করেছি—চারজন ছিলাম, পাঁচজন হয়েছি। সুতরাং বিরিয়ানীর ভাগটাও পাঁচজনেরই হওয়া উচিত। টিটো টুলু শুরু করে দিয়েছে। দুজনেই বললো—ওহ্‌ দারুণ। অসাধারণ হয়েছে।

মলয় বললো—গুরুজনদের প্রতি আস্থা রাখলে এরকম দারুণ এবং অসাধারণ ঘটনা তোদের জীবনে আরও ঘটবে। আমি একটু তফাতে শালপাতায় বিরিয়ানী দিয়ে গেরুয়াকে ডাকলাম—এসো লালুবাবু, একসঙ্গে শুরু করা যাক। গেরুয়া একটু নড়েচড়ে বসলো মাত্র। উঠে এলো না খাবারের কাছে। শুধু একটু কুণ্ঠার হাসি নিয়ে বললো—তা কি হয়, স্যার! আপনারা শুরু করুন, আমি তো আছি-ই।

চুপচাপ চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গেরুয়া আমাদের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। নিজে খেলো না। আমাদের হাত ধোওয়া হয়ে গেল। সিগ্রেট ধরিয়ে গাছতলায় বসেছি। টিটো ডাকলো—লালু খেয়ে যা। ও শালপাতা তুলে নিয়ে গিয়ে গেরুয়ার কাছে দিয়ে এলো। বুঝতে পারছিলাম কোথাও এক ধরনের বিপন্নতা আমাদের চারজনের মনুষ্যত্বকে অসম্ভব সঙ্কুচিত করে তুলছে। আমরা পরিতৃপ্ত এখন। কিন্তু মনুষ্যেতর ওই প্রাণীটি কি আমাদের খাদ্যের অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে! সোজা হয়ে বসে সকলে তাকিয়ে আছি গেরুয়ার দিকে। এ বড়ো বিচিত্র এক মানসিক টানাপোড়েন।

না, চতুষ্পদটি ধীর পদক্ষেপে উঠেছে। আমাদের সকলের দিকেই ওর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, খাবারে মুখ দিল। যেন ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে, আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আহার শুরু করলো। বিস্ময়ের আনন্দে আমরা চারজন চুপচাপ বসে অনাহুত অতিথিটির আহার-পর্ব দেখতে লাগলাম।

আবার চলতে হবে আমাদের। মলয়ের ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ একটি পিকনিক সারা হলো। জিনিসপত্র গোছগাছ করার প্রায় কিছুই নেই। জলের বোতল গ্লাস

ইত্যাদি নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। গেরুয়াও খানিক বিশ্রাম সেরে নিয়েছে আমাদের সঙ্গেই। যাওয়ার তোড়জোড় দেখে উঠে দাঁড়াল। আকাশে কিছু মেঘ আসায় রোদ ঢাকা পড়েছে। ফাঁকা হাইওয়ে, দু পাশের মাঠ আর আধা জঙ্গলের ওপর নরম ছায়া ঘিরে ধরেছে। যদিও দুপুর, তবু কেমন এক গোধূলির প্রশান্তি নেমে এসেছে নিঝুম প্রকৃতিতে। গেরুয়াকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি স্টার্ট করলাম। ও উঁচুদিকে মুখ তুলে—আবার আসবেন স্যার, এখানেই কাছেপিঠে থাকি, আপনারা এলেই আমাদের একটু···এইসব বললো। ঝরঝরে মন এবং অপূর্ব এক অভিজ্ঞতার স্পর্শ নিয়ে হাইওয়েতে উঠে পড়লাম। আর এবার আমার বদলে মলয় গাইলো—"নওল কিশোরী গো···"

কিন্তু বেশিদূর যাইনি। হঠাৎই নিঝুম প্রকৃতি আর ফাঁকা দু পাশের মাঠের ওপর মেঘলা আকাশকে দীর্ণ করে দু'বার গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হলো। চমকে উঠেছি একসঙ্গে চারজনেই। আর তখনই বাতাসকে সচকিত করে দূর থেকে এক তীক্ষ্ণ মর্মন্তুদ আর্তনাদ ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের কানের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছি। এ যে আমাদের চেনা গলা!

বুকের মধ্যে কি এক আশঙ্কার দামামা বাজছে যেন। তারমধ্যেই মলয় বলেছে—গাড়ি ঘোরাও তো।

দ্রুত ফিরে এলাম, আমাদের একটু আগেই ত্যাগ করা পিকনিক স্পট-এ।

ইতিমধ্যে সেখানে আর একটি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তিনজন আঁটোসাটো জিনস্‌ পরা পুরুষ এবং দু'জন লাস্যময়ী আধুনিকা ওই গাড়ির সওয়ারী। ঝিন্‌চাক্‌ মিউজিক বাজছে গাড়ির ভিতরের স্টিরিও ক্যাসেট থেকে। মহিলা দু'জন গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার পাশে। পুরুষদের দু'জনের হাতে গ্লাস, একজন রাস্তার ধারে আমাদের ছায়া ঘেরা পিকনিক-এর জায়গাটায় নেমে এসেছেন। তাঁর হাতে তখনও ধরা উদ্যত টমিগান। যেখানে বসে মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমরা রোড সাইড বিরিয়ানীর সদ্ব্যবহার করেছিলাম, সেখানেই রক্তাপ্লুত পড়ে রয়েছে আমাদের পাঁচজনের একজন গেরুয়া চতুষ্পদটি। সামনের দু'পা ছড়ানো, গলার কাছে গভীর ক্ষত থেকে তখনও ঝরছে তাজা লাল রক্ত। নিষ্প্রাণ দেহ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে কৃতজ্ঞতা মাখানো নরম দুটি চোখ, যেখানে এখনও যন্ত্রণার স্পষ্ট দাগ রয়েছে।

টিটো এগিয়ে গেল। একজন যুবক সাবধান করলো—দাদা যাবেন না, ডেঞ্জারাস কুত্যা!

অপর যুবক বললো—আরে দাদা, আমরা একটু গাছের ছায়া দেখে এখানে নেমেছি। খানিকক্ষণ রেস্ট নেব। উরে শালা, নামামাত্রই ক্যাঁ কোঁ শব্দ করে একেবারে গায়ের কাছে···

ওপর থেকে এক যুবতী বললেন—পার্থ,—দ্য ডগ ওয়াজ এ্যাকচুয়ালি চেজিং মী··· !

বন্দুক হাতে নিচে দাঁড়ানো যুবক বললো—ডোন্ ওয়ারি ডার্লিং, ইট হ্যাজ টেক্‌ন ইট্‌স লাষ্ট ব্রীদ। য়্যু অল স্যুড কংগ্রেচুলেট মী।

ছায়া ঘেরা জায়গাটায় গাছের ডালপালা থেকে কাকগুলো ওড়া-উড়ি করছে কা-কা করতে করতে।

দীর্ঘ ফাঁকা হাইওয়ে দিয়ে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। কানে বাজছে কিছু কর্কশ কাকের চ্যাঁচানি, একটি যন্ত্রণাকাতর প্রাণীর আর্তনাদ আর তার সঙ্গেই মনুষ্যাকৃতি কয়েকটি যুবক যুবতীর কণ্ঠস্বর আর পপ্ গানের সুর।

আমাদের কারও মুখে কথা নেই।

জুপিটার ও থেটিস

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

গত ২৮ শ্রাবণ ১৯১১ শনিবার, ২ ভাদ্র ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ ১৯ আগস্ট ১৯৮৯ শহর সংস্করণ দাম ১'৭০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক সংবাদপত্রের ৪র্থ পৃষ্ঠার একেবারে নিচের দিকে সিঙ্গল কলম ৯ পয়েন্টে একটি খবর বেরিয়েছিল। শীর্ষক ছিল : কেবিনে উঠে ড্রাইভারকে পুলিশের প্রহার : ধর্মতলায় ট্রাম অচল। খবরটি হয়তো, আজ ৭ সেপ্টেম্বর, মাত্র তিন সপ্তাহ যেতে না-যেতে, পাঠক মাত্রেই ভুলে গেছেন। খুবই স্বাভাবিক এবং এমনটাই হবার কথা। কেননা, তারপর 'রাষ্ট্রপতিকে ভিপি : আর নয় ইস্তফা দিতে বলুন রাজীবকে' থেকে 'অশোকনগরে সংঘর্ষ, মৃত ৫, রক্তাক্ত প্রিয়রঞ্জন'-সহ কত না স্মরণীয় খবর বেরুল। তারপর এল ৩০ আগস্টের 'ভারত বন্ধ (আংশিক), পশ্চিমবঙ্গে জন জীবন স্তব্ধ'-র মতো স্মরণীয়রা—এ যে বাকি সব খবরের গুষ্টির তুষ্টি করে গেল। ভুলে যাবারই কথা। কিন্তু, খুবই ব্যক্তিগত কারণে আমি খবরটি এখনও ভুলতে পারিনি। অন্যদের তুলনায় আমার বেশ, রীতিমতো দেরি হয়ে যাচ্ছে ভুলে যেতে।

একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয় : কলকাতা। ১৯ আগস্ট ধর্মতলার মোড়ে এক ট্রাফিক পুলিশ আজ বিকেল ৪টে-১৫ মিনিটে ১নং রুটের এক ট্রামের ড্রাইভারকে কেবিনে ঢুকে গালে চড় মারায় গতকাল অপরাহ্ণে ঐ এলাকায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তীর্থতরুণ নন্দী নামে ৫৮৪ নম্বরধারী ড্রাইভারকে পরে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কানের পাশ দিয়ে রক্তক্ষরণ সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। যান-জট ছাড়াতে পুলিসকে হিমসিম খেতে হয়।

তবু ভাল যে, অন্তত একটি কাগজে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, খবরটির অনেকখানিই ছিল ভুল। যে খবর, আমার বিবেচনায়, প্রতিটি সংবাদপত্রে ৩ কলম ছবি সহ অন্তত ২ ডেকে ও ৩ কলম জুড়ে ১৭-এম কলম-মেজারে ছাপা হওয়ার কথা।—তা কিনা ছাপা হলো মাত্র একটি মাত্র সংবাদ-পত্রের ৫-এর পাতার ফুটনোট হিসেবে ! দুঃখের বিষয় বৈকি।

আর, দুর্ভাগ্যজনক এ-কারণে যে, ঐটুকু খবর, তারও কিনা বিসমিল্লায় গলদ! আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী।

কলকাতার ট্রামে-বাসে চাপছি আমি সেই ছোটবেলা থেকে। এমন কাণ্ড আমি আগে কখনও দেখিনি। ছোটবেলা থেকে ট্রামে চাপছি, এটা এমনিতে বলার মতো কোনো ঘটনা নয়। ভাববার মতো ভাবনা নয়। আমার বিবৃতি তবু কিছুটা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হবার দাবি রাখে।

কেননা, 'ছোটবেলা থেকে' বলতে আমি মীন করছি, আমার যখন ৭দিন বয়স, সেই তখন থেকে। আমি কলকাতার ট্রামে প্রথম চাপি আমার জন্মের সপ্তম দিনে। দেশ-বিভাগের পর যাঁরা জলা-বাংলা থেকে এ-শহরে এসে মাড়োয়ারি-প্রায় ঝাণ্ডা গেড়েছেন, এমন-কি, পশ্চিমবঙ্গীয় কোচবিহারাদি বিভিন্ন জেলার নটবরহাট, চ্যাংড়াবান্ধা, ডাউকমারি, পাজিপাড়া, লম্বোদরপুর, বালটিকুরি, ছেন্দাপাথর, ভাতারমারি, হুমহুমগড় প্রভৃতি স্থান থেকে কলকাতায় তরী ভিড়িয়েছেন যাঁরা, জানি, এ-কথা শুনে তাঁরা সমস্বরে সবাই 'য্যাঃ!' বলে উঠবেন জানা কথা। তবে, খুব বেশি কলকাত্তানও এ-ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে এগিয়ে আসবেন বলে আমি মনে করি না। যদিও, ট্রামে-জন্ম এমন নাগরিকের সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।

আমার সেই প্রথম ট্রামে চাপার দিনটি তাহলে ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪১। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন। হাতিবাগান বাজারে বোম পড়তে বাকি। সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্ধান করেছেন। বাবা কাজ করছেন এ-আর-পি'তে, যুদ্ধ দপ্তরের এয়ার রড প্রিকশান বিভাগে।

কারমাইকেল থেকে ট্রামে চেপে হেদুয়া। তারপর···ট্রাম-স্টপ থেকে বাড়ি পর্যন্ত মা হেঁটে এসেছিলেন। বাবার কোলে মুড়িঝুড়ি দিয়ে আমি, নব প্রজন্মের প্রথম পুত্র-সন্তান। শুধু ঐটুকু পথের জন্য সেই শীতের সকালে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। দোতলার কাঠের বারান্দা থেকে, যা দেখে, পিসীমার নাকি মনে পড়ে বসুদেবের কোলে কারাজাতক কৃষ্ণের কথা। যে-জন্যে আমার নাম রাখা হয় বাসুদেব।

২

এঁড়ু না?

যদিও রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর ডান গাল, এঁড়ুও আমাকে ৩০ বছর পরে প্রথম দেখে চিনতে পারল। বলল, "তুই আমাকে বলবে বাসু, ও কেন আমাকে 'শুওরের বাচ্চা' বলল?" তখন ঠোঁট ও কান থেকে রক্ত ছাড়াও তার নাক দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে শিকনি। এবং চোখ দিয়ে জল।

আগেই বলেছি আমি সমস্ত ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। এবং সংবাদটি অনেকটাই ভুল। যথা, প্রথমত, ওর নাম তীর্থতরুণ বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ও এঁড়ু নন্দী।

আমরা দুজনেই সিমলে পাড়ার ছেলে। ওর ঠাকুমা সেদিন রিক্সা চেপে ওকে নিয়ে জেলে-পাড়ায় গার্ডদির সারদা বিদ্যাবীথিতে নিয়ে এলেন, (গার্ডদির মৃত স্বামী ছিলেন মার্টিন রেলের গার্ড)—পাঠশালার সেই প্রথম দিন থেকেই ওর দুর্ভাগ্যের শুরু। কেননা, ঠাকুমা ওকে ভর্তি করালেন 'এঁড়ু নন্দী' নামে।

পাঠশালার সেই প্রথম দিন থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত এঁড়ু ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। ফুটপাত ধরে আমরা একসঙ্গে এঁড়ুর ঠান্মার পিছু পিছু বাড়ি ফিরতে ফিরতে নিজেদের অজান্তে বড়ো হয়েছি। স্কুল-জীবন পর্যন্ত এর অন্যথা হয়নি। আমাদের সঙ্গে দিনে দিনে বড়ো হয়েছে কলকাতা।

ক্লাস-সেভেনে পড়তে, একদিন ওরা পাড়া ছেড়ে উঠে গেল। তারপর পাড়ার পর পাড়া ছেড়ে ক্রমাগত হারিয়ে যেতে লাগল। ২।৪ বছরের মধ্যে একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল ওরা। শুনেছি, দেনার দায়ই ওদের এ-ভাবে ঠাঁই-নাড়া করেছে বারবার।

এ সেই কলকাতার কথা, যখন কর্পোরেশনের মেথর হাতগাড়ি ঠেলে গলিতে ঢুকত। তার পিছু পিছু ঢুকত ভোরের আলো। বেলা হলে, মাথাঘষা গলি থেকে মা'র মাথা ঘষে দিতে আসত মান্ত পিসী। দুপুরে, খাগড়াই কাঁসার বাসনে ঘণ্টার শব্দ তুলে ঢুকত মাড়োয়ারি বাসনঅলা; পিছনে বাসনবোঝাই ঝাঁকা মুটে। সারা-দুপুর বড় রাস্তার হাইড্রাণ্ট ঘিরে গঙ্গোদকের ঘুঘু-ডাক—বুকবুকবুকবুক। বিকেল-বেলা হোস পাইপের জল বিস্তীর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে বিবেকানন্দ রোড আর কর্ণ-ওয়ালিশ স্ট্রিটের গা ধুইয়ে দিত। জল গড়িয়ে আসত গলিতে। যেদিন সন্ধ্যাবেলা ওয়াইল্ড উডবাইন সিগারেটের জীবন্ত বিজ্ঞাপন লংম্যান এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে—আমাদেরই বাড়ির লাগোয়া গ্যাসের আলোর ঢাকনা খুলে সটান

দাঁড়িয়ে ও ঈষৎ লেংচে সরাসরি গ্যাস থেকে সিগারেট ধরাল, ততদিনে আমরা এ-ভি স্কুলে ঢুকে গেছি। শীলেদের বাড়ির ছাদ সেদিন লোকে লোকারণ্য। আমাদের বাড়ির কাঠের বারান্দা ভেঙে পড়ার যোগাড়। আমরা ঐ দুটি গ্যালারির ঠিক কোনটাতে তখন গুঁজে ছিলাম তা অদ্বৈতভাবে জানার জন্য আমার আজও এঁড়ুর শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই।

৩

ঘটনাটি আমি দেখেছি একেবারে কাছাকাছি এবং শুরু থেকেই। প্রকাশিত সংবাদটির মূলে হাভাত। কারণ; পুলিশ মারে অনেক পরে।

তখন বেলা ৪টে হবে। আমি ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট সবে দড়ি থেকে মুখ তুলেছি। একজন ট্রাফিক পুলিশ তখন পয়সা নিয়ে লরি-ড্রাইভারের সঙ্গে দরাদরি করছে।

একেবারে সামনে ১নং ট্রামের কেবিনে ছিল এঁড়ু। ঘটনাটি আমার চোখে পড়ে ১নং ট্রামের ড্রাইভার যখন কেবিন থেকে লাফিয়ে পড়ল সেই তখন থেকে। তখন বেলা ৪টে-১৫ও হতে পারে যা কাগজে বলেছে। আমি দেখলাম, ভরাভর্তি ট্রামের কেবিনের দরজা খুলে, গলা পিচের ওপর লাফিয়ে পড়ল এক মধ্যবয়সী, তার খালি গায়ে অশৌচের থান, মুখে দাড়ি, পায়ের হাওয়াই-চপ্পলে লাগানো সেফটি-পিনটি পর্যন্ত আমি দেখতে পেয়েছিলাম কারণ ঘটনাটি ঘটে একরকম আমার নাকের ডগায়। তাই বলছিলাম, পুলিশ তো ওঠেনি কেবিনে। গালে চড় মারেনি।

শ্যামবাজার এ-ভি স্কুলে ক্লাস ফাইভে ওঠার আগে পর্যন্ত, আশ্চর্য যে, তার এঁড়ু নামের হাস্যকরতার দিকটি কেউ লক্ষ্য করেনি। নিয়মিত ক্লাসে সেই শিশুকাল থেকে নাম ডাকা হয়েছে এবং বালক-এঁড়ু তার উপস্থিতি সগৌরবে ঘোষণা করে গেছে। ব্যাপারটা প্রথম লক্ষণীয় হয়ে উঠল তখন, যখন নতুন হেড-স্যার কালিধন-বাবু মেসোমশাইকে ডেকে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে এঁড়ুর নতুন নামকরণ করলেন তীর্থতরুণ। গরমের ছুটিতে উনি কেদার-বদ্রি গিয়ে-তারই প্রসাদগুণে এঁড়ুর নতুন নাম ক্লাস ফাইভ থেকে খাতায় উঠল। ভাগ্যিস, তার ঠাকুমা মারা গেছেন ক'মাস আগেই। বেঁচে থাকলে তুমুল আপত্তি করতেন।

নতুন নামে এঁড়ুকে ডাকা হলো ক্লাস ফাইভের প্রথম ক্লাসে। বাঙলার স্যার শিববাবু রোল-কল করতেন না। ডাকলেন, 'তীর্থতরুণ নন্দী।'

সবাই ভেবেছিল শিলিগুড়ির নতুন ছেলেটা, যার বাবা ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসেছেন। ক্লাস-সুদ্ধু সকলকে অবাক করে 'এঁড়ু' তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং 'তীর্থতরুণ' ও 'নন্দী'র মাঝখানে তার কাটাকাটা, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ উচ্চারণে ধ্বনিত হল 'ইয়েস স্যার'।

স্যার পরের নাম না পড়ে খাতা হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন অবিশ্বাস্যকে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করছেন এ-ভাবে রোগা থুতনি নেমে এল তাঁর বুকে, চশমা হড়কে নেমে এল তাঁর নাকের ডগায়।

'ইউ···এঁড়ু···'

আমি ব্যাপারটা জানতাম।

'হেডস্যার এঁড়ুর নাম বদলে দিয়েছেন স্যার।' আমি উঠে দাঁড়াই।

'তীর্থতরুণ? আই সী···' উনি আর-একবার ডাকলেন, 'তীর্থতরুণ নন্দী!'

এঁড়ু আবার বলল, 'ইয়েস স্যার।'

কিন্তু, এঁড়ুর নতুন নাম তবু খাতা-কলমেই থেকে গেল। স্কুলের ৭০০ ছেলে তাকে 'এঁড়ু' নামেই চিনে রাখল। তদুপুরি, সে-বছরেই স্কুল ম্যাগাজিন 'কিশলয়ে'-ও ভূতপূর্ব এঁড়ু নন্দী নামেই তার 'পাহাড়ী ঝর্ণা' নামে একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়ে গেছে যার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'পাহাড়ী ঝর্ণা', ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি' ক্লাসের ছেলেদের মুখে-মুখে। দেখা হলেই আমরা সবাই সবাইকে 'ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি, ঝিরিঝিরি' বলে অভিবাদন করি। সত্যি-কথা বলতে কী, এক রোল-কলের সময় ছাড়া, স্যারেরা পিওন-কাম-দারোয়ান নটবর থেকে, যাকে নামকরণের দিক থেকে তার দ্বিতীয় পিতা বলা যায়, সেই হেড-স্যারও ওকে এঁড়ু বলেই ডাকতেন। তাই বলছিলাম, কাগজে 'তীর্থতরুণ' ছাপা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে আমার কাছে এঁড়ু নন্দীই থেকে গেছে। তীর্থতরুণ নন্দী নামে সে বহুলপ্রচারিত সংবাদ-মাধ্যমে উল্লেখিত হলেও, আমি নিঃসন্দেহ যে, দিদি-পিসি-কাকা-কাকিমা প্রমুখ আত্মীয়-স্বজন আজও তাকে আমার মতো এঁড়ু নামেই চেনেন এবং পরবর্তী প্রজন্ম, এঁড়ুকে, তার নামের সঙ্গে, যার যা সম্পর্ক, জ্যাঠা-পিসে-কাকা প্রত্যয়-যোগে ডাকে। এইতো সেদিন আমার ভাগ্নী মাধুরীর মেয়ে ঝিঁঝিঁ, বয়স দেড়, যে সবে 'বাব্‌বা' আর 'মাম্' বলতে শিখেছে, তাকে দিয়ে ওরা আমাকে 'দাদ্‌দু' বলিয়ে ছাড়ল। আর-একটু বড়ো হলে ও সবটা বলবে। এঁড়ুর ক্ষেত্রেও অন্যথা হবে না। অর্থাৎ, এঁড়ুদাদু।

৪

"তুমি আমাকে 'শুওরের বাচ্চা' বললে কেন জবাব দাও ?"

আমি দেখলাম ড্রাইভারের কেবিন থেকে লাফিয়ে পড়ছে একজন তিংখাড়ু রোগা ড্রাইভার, শাদা তকতকে ইউনিফর্ম-পরা ট্রাফিক পুলিশের কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বারবার বলছে, 'বলো ! জবাব দাও !'

সিধু-কানহো ডহরে সমবেত হয়েছে অধ্যাপকদের মৌন মিছিল। দাবি-দাওয়া যা কিছু সব কঞ্চিতে গোঁজা। সমাবেশ সেই পিয়ারলেস থেকে কে সি দাশ ছুঁয়েছে। যে দেশ ২১ শতাব্দীতে হবে পৃথিবীতে নিরক্ষরতম, বাকি পৃথিবীতে যত নিরক্ষর, ততজন শুধু চরে বেড়াবে যে এই একটা দেশে—সে দেশে এত অধ্যাপক ! কলেজ গ্র্যাজুয়েটের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি যে বাকি পৃথিবীর ডবল হবে সে-কথা ঐ সমীক্ষায় বলা হয়নি। আমার অনেকক্ষণ আগে মনে হয়েছিল। এদিকে গ্রাণ্ড হোটেল পর্যন্ত ট্রাফিক জাম। পূর্বদিকে ওয়েলিংটন। পুলিশ ও ড্রাইভারকে ঘিরে লোকে লোকারণ্য। এই সময় লাল হিরো-হণ্ডা চালিয়ে সার্জেন্ট এসে পড়েন। (সংবাদে প্রকাশ—ওঁর নাম বন্ধুবিকাশ মুখার্জি।)

তাঁর ঐ এঁড়ু নামের ব্যুৎপত্তির দিকটি অনেকে ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারিনি। হয়েছিল কী, সাতদিন ধরে তাঁর নাতি হয়েছে এ-কথা জ্ঞাপিত হয়েও, এমন-কি তার অবর্তমানে হিজড়েরা 'অ ঠাকুমা, হামাদের লাতি কই গ' বলে ঢোলক-সহযোগে নেচে যাওয়া সত্ত্বেও, ওর ঠাকুমা ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, যেজন্যে হাসপাতাল থেকে এসে পৌঁছনোমাত্র নিজের হাতে বোনা নক্সি কাঁথার ওপর ওকে শুইয়ে, মোড়ক খুলে উনি প্রথমেই তার জননেন্দ্রিয়টি পরখ ও প্রত্যক্ষ করে দেখেন এবং দেখামাত্র 'অ, ভূপীন, তোর ছেলে যে এ্যাঁড়কাটা র‍্যা' বলে সহর্ষ ও উচ্ছ্বসিত বিস্ময় প্রকাশ করেন। পৌষের শীত সেবার একটু বেশিই পড়েছিল তার ওপর তিনদিন ধরে বৃষ্টি। মাতৃজঠরের ওম থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর প্রথম শীতে আসলে তার শিশুসুলভ অণ্ডকোষ দুটি গুটিয়ে একদম পুরোটাই ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।

ঠাকুমাই ওকে সংক্ষেপে প্রথম 'এঁড়ু' বলে ডাকেন। রিক্সায় করে জেলেপাড়ায় গার্ডদির পাঠশালায় নিয়ে গিয়ে এঁড়ু নন্দী নামে ওকে ভর্তি করান। শোনা কথা, ছোটবেলায়, ৩।৪ বছর পর্যন্ত, মেসোমশায় একমাত্র বংশবর্তিকাকে কোলে নিয়ে 'এ্যাঁড়কাটিদম', 'এ্যাঁড়কাটিদম' বলে সহর্ষে নাচাতেন।

৫

সেফটি-আঁটা হাওয়াই চপ্পল খুলে, ট্রাফিক নয়, এঁড়ুই প্রথম পুলিশের গালে মারে। এবং আগে মেরে তারপর 'তুমি আমাকে' থেকে 'বললে কেন' পর্যন্ত বলে।

এঁড়ু না ? আমি তাকে দেখামাত্র চিনতে পারিনি। চিনতে পারার কথাও নয়। বিগত ৩০ বছর ধরে অ্যালোপেশিয়া চকচকে করে দিয়েছে তার মাথা, তুবড়ে দিয়েছে গাল, নাকের ওপর অন্তত বছর-২০ আগে করানো ঝুলন্ত চশমা। তার গায়ে ময়লা অশৌচ-বস্ত্র। যা দেখে প্রথমেই মনে হয়, ভূপেন-মেসোমশাই এতদিন তাহলে বেঁচে ছিলেন ?

তুমি। আমাকে। শুওরের। বাচ্চা। বললে। কেন।—নির্ভুল উচ্চারণে কেটে কেটে কথা বলার এই মৌলিক ঘরানাই আমাকে নিঃসন্দেহে জানায় যে, হ্যাঁ, সে এঁড়ু। আর কারও গলা এত তীক্ষ্ণতায় ঝলসে উঠতে পারে না।

তার ১নং ট্রাম থেমে আছে চৌরাস্তার মোড়ে। সেণ্ট্রাল এভেনিউ ধরে যতদূর দু চোখ যায় ট্রাফিক দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রাম গুমটি ও ধর্মতলা স্ট্রিটে সারিবদ্ধ ট্রাম। ১নং ট্রামের জানালায় জানালায় ৪-৫টি করে মুণ্ডু। পুলিশ, সার্জেন্ট আর এঁড়ুকে ঘিরে জমে উঠেছে অফিস-ভাঙা ভিড়, যখন, যে-সময়, প্রথমে সার্জেন্ট তারপর পুলিশরা সমবেত ভাবে তাকে পেটানো শুরু করল।

ঘাড় ধরে মারতে মারতে তাকে কেবিনে তুলে দেওয়া হয়। তখন ওর মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাটা ঠোঁট ঝুলে রয়েছে। আমি তখন তার সবচেয়ে কাছে। কেবিনের নিচে দাঁড়িয়ে। আমি জানি।

"তুই আমাকে বল্‌রে বাস্থ লোকটা আমাকে শুওরের বাচ্চা বলল কেন ?"

এই বলে সে তদবস্থায় ঘণ্টায় লাথি মারল।

তার গায়ে অশৌচ বস্ত্র। মুখে এক গাল শাদা দাড়ি। খুব কাছে মুখটা এসে সে ঐ ক্রোধে-রোরুদ্যমান জিজ্ঞাসা চিহ্নটি আমার সামনে রেখেছিল। তার না-রক্তাক্ত গালে শাদার মধ্যে—ব্যক্তি-স্বাধীনতায় প্রখর বেশ কিছু কুচকুচে কাঁচা চুলের অস্তিত্বও আমি দেখতে পাই।

আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, আমি এখনও ঘটনাটি ভুলতে পারিনি। তাই, মনোভার লাঘব করার জন্য জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণমাত্র এখানে রাখলাম।

পেশাদার লেখকরা যত্রতত্র থেকে গল্প শুরু করতে পারেন এবং একটা ঘটনা

কি একজন মানুষকে একবার দেখলেই তাঁরা তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পান! একজন লেখক এ-ঘটনা নিজের চোখে দেখলে নিঃসন্দেহে এখান থেকে একটি উপন্যাস শুরু করতে পারতেন। কিন্তু, আমি লেখক নই আমি একজন চিত্র-শিল্পী। কলকাতার ৩০০ বছর উপলক্ষে এই ঘটনাটি নিয়ে আমি একটি পেইন্টিং করব ঠিক করেছি।

কলকাতাকে নিয়ে চিত্রশিল্পীরা অজস্র ছবি এঁকেছেন। কিন্তু, আশ্চর্য যে, এ-শহরের ৮২ হাজার হিজড়ের একটিকে নিয়েও ছবি করার কথা কেউ ভাবেননি, যাদের মধ্যে অন্তত হাজার-পাঁচেক পুলিশ ও এঁড়ুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমরা সেদিনের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলাম। কেউ টুঁ শব্দটি করলাম না। এঁড়ুকে দেখতে আমি হাসপাতালে পর্যন্ত যাইনি।

আমার ছবির বিষয় হবে কারুকাজে ভরা পাথরের সিংহাসনে সমাসীন এক মহামৌন হিজড়ে—আউট সাইজ অতি প্রশস্ত তার বক্ষপট—তার বাম হাত। শাদা মেঘপুঞ্জের ওপর পরম আলস্যে চড়ানো। অন্য হাতে শাসন দণ্ড।

তার লোমবহুল উলঙ্গ জানু ধরে এলোচুলে লতিয়ে উঠতে চাইছে তারই যৌন-অনুকামনাপ্রার্থী এক কৃশকটি দিগম্বরী : কলকাতা-৩০০।

আমি ছবিটির নাম দেব : জুপিটার ও থেটিস। হ্যাঁ, জাঁ অগস্ত দমিনিক অ্যাগ্রঁর (১৭৮০-১৮৬৭) ঐ নামের বিখ্যাত ছবিটিই আমার মাথায় আছে।

আদিকাণ্ড

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

জালাগোড়ার নাম কেন যে জালাগোড়া হলো সে কথা আজ আর কারো মনে নেই। ইতিহাসের তলায় তলিয়ে গেছে। তবে এখনো এলাকার মানুষজন গভীর রাতে চোখ তুলে তাকালে দেখতে পায় মহারাত্রির আলোআঁধারি ভেদ করে নাবাল জমিতে ধান গাছের গোড়া জলে। সে আর ধান গাছ নেই—পচে ধসে কুটি হয়ে গিয়ে পচা জলের ভেতর আগুন সৃষ্টি করল। কই, মাগুর, ট্যাংরা মাছ সে পচা কুটকুটালি ঠুকে ঠুকে আগুন খায়। ফসফরাস জলে। অনন্ত মহিমার চাঁদ ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে পৃথিবীতে। নাকি সেই জলার থেকে সৃষ্টি হলো জলাগোড়ার তা কে বলতে পারে! পাশে মধুমতী খাল শীর্ণ মেয়েমানুষের মতো বয়ে গেছে। ওপারে ডাঙাপাড়া—শ্মশান। ফড়িং, পোকামাকড় গাছের আশ্রিত। আর এপারে মানুষ। কত রঙের মানুষ, কত ঢঙের মানুষ—কি যে তাদের গতিপ্রকৃতি। কখনো মাটি ডাকে, কখনো আকাশ ডাকে—মানুষগুলি সাড়া দেয়। কাকের তীব্র কর্কশ গলা এদের। কচ্ছপের খোলার মতো মাথা। মাছির ডেঁয়ো মাথার মতো কালো চোখ, কোতবেলের ভেতর কালো হয়ে জেগে ওঠা স্বাদু রঙের গায়ের ধাঁচ। এদের দেখলে মানুষ বলে সহজেই চেনা যায়, কিন্তু চরিত্রগুলি বোঝা দায়। এত ভালোবাসা আর হিংসা জগতে আর কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খায়দায় ঝগড়া করে—আর রাতের বেলায় বসে ফুলুটে মুখ দিয়ে হরেক গানের গৎ বাজায়। এইবার চেনা যাবে—যারা ফুলুটে মুখ রেখে বাজায় তারা হলো পুরুষ। যারা শোনে তারা মেয়েমানুষ। যারা ঘুমায় তারা শিশু—বাহ্যজ্ঞান নেই বলে রাতের মহিমা টের পায় না তারা।

গুইরাম বসেছিল আম গাছে ঠেস দিয়ে। ফুলুক ফুলুক শব্দে হুঁকো খেল একটু আগে। নারকেল মালার ভেতর সে যেন বুড়বুড় জলের খেলা। মুখের ধোঁয়া পেটে এল আর অমনি চোখ হয়ে উঠল অন্যরকম। সে তাকাল জালাগোড়ার দিকে।

বাঁশি বাজায় কারা—যারা পাহাড় গুহা জংলা কেটে গাঁ বানাল। হাতের মুঠোয় যারা ধরল ধানের গোছ, হিংস্র জানোয়ারের কেশর। বনের মধ্যে যারা ঢুকে গিয়ে আবিষ্কার করল মূল-পাতা-গাছের ফল। পাথরের ভল্‌ল দিয়ে মারল বনবরাহ—তারপর খেল-দেল বিপুল ভাবে বাঁচল। এই মানুষজাতি একদিন ফুলুট মুখে গভীর রাতে বাজাতে বসল গানের গৎ। কিন্তু কি বাজাবে। হরেক গান ছড়িয়ে আছে ভুবনে, একশো একটি সুর—তারই লহরা চলতে থাকে মুচি পাড়ায়। প্রখর গলার বহতা ঢেউ এখন মায়ের ছোঁয়ার মতো ঠাণ্ডা। কালো রঙের কয়েকজন

যুবতী মেয়ের বুকের ভেতর না জানি হিমের সেই কলকলানি শুরু হয়ে গেল। এটিকে বলে ভাব, ভালোবাসা—একে গায়ে না মাখলে সংসার করা যায় না।

ঝুলন হাঁটুর কাপড় তুলে পাছা চুলকোচ্ছিল আঁধার রজনীতে বাহির দেখা যায় না। তার লাজ নাই, লজ্জা নাই। হায়া পিত্তির বালাই নাই। অনাবাদি জমির মতো পতিত গতর। তবু সুর শুনে মগজ যেন জাগে না তার। রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল, পয়সার ভাঁড়ে পড়ে রয়েছে মন। সে প্রাণেরও বাহির দেখা যায়—ভেতরের খবর কে রাখে—

অনেকক্ষণ উদখুস করে গুইরাম বলে—ভাত খাবনি—? ভাত দিবিনি নাকি—?

মুখ ঝামটা মারে ঝুলন—ক্যানে তর সয়নি নাকি। তিন সন্ধ্যায় ভাত গেলা—

আমার সনে অমন মুখ করবেনি বৌমা—

ক্যানে—তুমি কি গুষ্টিঠাকুর নাকি—

আঁধারে ছেয়ে আছে পৃথিবী। এমন রাতে একটা আধটা কথাই ভালো। বচসা শুনতে কে চায়। তারাভরা আকাশের নিচে গোল হয়ে বসে বনসিরা বাঁশি বাজাচ্ছিল। পুরানো গানের গৎ, রিহার্সাল চলছিল—ও চিকন কালা—বাঁশি না বাজাও দুপুরবেলা—

এমন সময় বাঁশবনের ভেতর থেকে রামশালিক, তুলো ফুকদি, বেঁশো চড়াই এইসব পাখিরা ডেকে উঠল। এই বাঁশবন ওদের ঠাঁই—ঝুলন দেখল ছাগলের বাঁটের দুধের মতো গাঢ় জ্যোৎস্না নামছে কুলকুল করে। নীল আকাশে আরো নীল ধরেছে। হিম পড়ে কখন নাকের ডগাটি তার ভিজে উঠেছে। চতুর্দিক হা হা করচে দেখে হাঁটুর কাপড় নামিয়ে দেয় সে। ভারি পাছা তাই শ্বশুরের তরে ভাত বাড়তে গেলে খর হাওয়ায় সোনামন পুকুরের জলে ভরন্ত পদ্মকুঁড়ির মতো দোলে। হিমে নাকি ঘামে, মেয়েমানুষের বুক ভিজে যায়। বুড়ো মানুষটার জন্য মায়া লাগে শরীরে—সে ভাত বাড়তে যায়—

শানাই ক্লারিওনেট বাজাতে থাকে। মুচি লোকেদের পুরু ঠোঁট মুখিয়ে হাওয়া ছাড়ছে। পরান হাওয়া। মাঠে মাঠে আগা-কোঁকড়া, কোঁকড়া কাঠি জলতরঙ্গ। জগনন্দাহাটির ইংরাজি বাজনার তালে তালে সহবৎ চলছে। ডিস্কো মিউজিক, নাজিয়া হাসানের কাজ।

ভাত খাচ্ছিল গুইরাম—বাঁকোই চালের কড়ো কড়ো ভাত—ভ্যারেণ্ডা ফলের মতো মোটা। সাদা পিঠে মাথায় লালের নকসি। কাঁচা পেঁয়াজ, লংকা, সরষের তেল। আর মরা গরুর কয়েক ছিয়া ভাজা।

বুড়োকে আগে খেতে দিয়ে ঝুলনের নিস্তার কই। এই বয়সেও লোকটা হাঁড়ি মারার যম। একবার ফলারে বসলে এক প্রহর বেলা গড়িয়ে যায়। ফুলতে ফুলতে পেট ঢাকের মতন হয়ে যায়—বোল লাগালে বোল লাগে। লোকটার তবু শান্তি নাই। এ এক আশ্চর্য লোক। বয়সের তুলনায় শরীর বেশ মজবুত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে এখনো হন হন করে চলে যায় পুবে। পশ্চিমে। এখনো জলের ভেতর এক নিঃশ্বাসে ডুবে থাকতে পারে খানিকক্ষণ। হাত-পা না ছুঁড়ে হালকা কলার ভেলার মতো ভেসে থাকতে পারে মাঝ পুকুরের জলে। ভরা বর্ষায় ভিজে এলে অসুখ নাই। ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। দুর্গা-পূজার ঢাক পিঠে তুলে দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তরজা চালায়, লোকটার কোনো ক্লান্তি নাই। গল্পগাথার মতো তার জীবন কাহিনী ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। যেন ভাঙামন্দির বা অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ লোকটার শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে। এককালে নাকি বারোটা বউ ছিল। কাচারি বাড়ির গোমস্তা ছিল সে—তাই ছিল ছোটার সাদা ঘোড়া। পুরানো কাল হেজে মজে নষ্ট হয়ে গেল। মরে গেল তার বারোটি বউ—একে একে। মহাকালের রেসের ঘোড়াটিও।

বাজনের গান ফুরিয়ে গেল। বহুকালের পুরানো পেট-ট্যাবরা একটা তোরঙ্গে ফুলুট বাঁশি তুলে রাখল বনসি। তার মনে পড়ল জোড়া ঢাকের নতুনটিতে বর্ষার জল পড়ে পড়ে ফেসে গেছে। বাজাতে গেলে ঢব ঢব শব্দে বাজে। ছাইতে হবে ঢাকটা। এই বাজনের জগঝম্প যতক্ষণ মাথার ভেতরে থাকে ততক্ষণ ঘর সংসার, বাঁচার জগৎটি হারিয়ে যায় খুপরি থেকে। খালের পাশে চার কাঠা জমি এ বছর তার নামে খাস বিলি বন্দোবস্ত হয়েছে। ঝুলন বলছিল সরকারি ধানের চাষ দিতে। ইউরিয়া-হাড়গুঁড়া-ফসফেট ঢাললে বিঘায় ২২ মণ হিসাবে ধান উঠবে। মাগীর আশার কোনো শেষ নাই। পাথুরে ঘাটার ডোবা—তার হিম ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে এসে খেতে বসে বনসি। তেমন কোনো ব্যান্নন নাই। চাখনা নাই। আকাল লংকা, রেঙুন পেঁয়াজ আর ভাগাড় থেকে তুলে আনা মাংস ভাজা। এতকাল কেটে গেল জীবনের ওপর দিয়ে, আধুনিক হলো কুলিধারের মুচিদের জীবন। কিন্তু মরা গরুর মতো নোংরা জিনিস, খাবড়ে ফেলা মাল টেনে এনে ঘরে তুলতে তারা ভুলল না। কথায় বলে স্বভাব না যায় মলে। এদের এই ইল্লতাপানার জন্যই অচ্ছুতপল্লী হয়ে রয়ে গেল এই পাড়া। এই পাড়া দিয়েই গ্রামের শেষ। খালের শুরু—এই খালের জলেই ভেসে যায় মানুষের নোংরা, ক্লেদ, ঘৃণা। এই নিশুথ রাতে ভাত খেয়ে বউয়ের সাথে শুতে গেলে খালের ধার

থেকে ডাহুক পাখির ডাক ভেসে আসে এখনো। একথা বনসি বা ঝুলনের বোঝার কথা নয়। জানার কথা নয়। বহুকালের পাকা মাথা গুইরাম দাস জানে—জালাগোড়ার দিক থেকে ভেসে আসছে ওই পাখির ডাক। কুব কুব—কুবো কুব—কুব কুব। কালে কালে প্রায় সবকিছুই তো বদলে গেল কিন্তু পাখির ডাক তার তো কোনো খামতি নাই। শনশন হাওয়ার ভেতর থেকেও ওই ডাক ভেসে আসে। আবার বাতাসহীন পৃথিবী গুম হয়ে থাকলেও ওই ডাক। বনসি বউকে কাছে টানতে যায়। বউ ঝুলন বলে—না আ—। হাড় জ্বালানো এই আনন্দ তো বহুকাল সে চেখেছে। এর চেয়ে যদি একদণ্ড শান্তি নামত জীবনে। তার হাতে বেগুনফুলি কাচের চুড়ি—বেগুনফুলের মতো তাজা রঙ। কেশপুরের হাট থেকে খরিদ করা। গতরের নড়ন চড়নে তাই ঠঙ বঙ করে বাজে। অন্যমুখে ব্যাজার চোখে ফিরে শোয় ঝুলন। পুরুষমানুষ মানে তার রাতের বেলা একটা মেয়েমানুষ চাই—তখন চোদ্দ চুড়ের বুদ্ধি এক চোঙে ঢুকবে। সামলাতে পারো তো সংসার হলো—হাল ছাড়লে তো ডুবল তোমার সুখের লোকাখানি।

রাত সরতে থাকে আকাশে, মেয়েমানুষের চুলের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। এ মেঘ ডাকে না, নীরবে গরবে বয়ে যায়। যৌবন শরীরে থাকলে মানুষের চটপট ঘুম এসে যায় চোখে। সংসারে স্বাদ থাকে। গাছের ফল যেমন টুপটাপ ঝরে যায়—তেমনি ঘুম আসে ওদের চোখে। বাঁশপাতালি চোখ, ধানতুল্য চোখ—সব ঘুমে লটোপটো করে। কিন্তু গুইরামের চোখের তলায় যেন গরম বিছার লীলাখেলা। এই চোখ দুটি যেন কিছুতেই জোড়া লাগবে না। যতবার সে চোখ তুলে তাকায় ততবারই চোখ ঝিকঝিকায়—চোখে পড়ে হোগলপাত সেই দামড়া ছুরিটা। এই ছুরিটা দিয়েই মরা গরুর খোল ছাড়ায়—ছাল চামড়া মাংস আর পয়সা। কেন বারবার ওই ছুরিটাই যে চোখে পড়ছে—কি কুলক্ষণ ঘনিয়ে আসছে জীবনে কে জানে। এক এক সময় নিজেকেই গুইরামের মরা দামড়া মনে হয়। মনে হয় তাকে দেখে এই মৃতপ্রায় পৃথিবীতে সাঁ সাঁ করে নেমে আসছে শকুন। মরে ফুলে ঢোল হয়ে পড়ে আছে সে—আর পাখপাখালিরা ঠোকরা-ঠুকরি শুরু করে দিয়েছে। মুখে যাদের জল দেওয়ার কথা তারা সবাই ঘুমে কাদা। জানতে পারার আগেই শকুনে খেয়ে সাবাড় করে দিল বুড়োর লাশটা। হায় রে জীবন! এই রাতের বেলা শরীর উমসুম করে। অথচ ঘুম হয় না। তখন মনে হয় পরকালের সব রক্ত গলে জল হয়ে গেছে। নরকের বাজনা শুনতে পায় সে—ঝাঁকে ঝাঁকে মরা মানুষজন সেখানে ফুলুট বাজায়। আবার কেউ কেউ চওড়া ইস্পাতঢালা পাতওয়ালা বর্শীদা পাথরে

ফেলে শান দেয়। এমন জীবন কোথাও আছে কিনা কে জানে তবে এই জীবনের লোকজনদের যেন স্বচক্ষে দেখতে পায় গুইরাম।

আসলে এই পাড়াটার চরিত্রটাই এই। ঘরে ঘরে যেসব লোকজনেরা থাকে তারা প্রায় সবাই এই একই রকমের ধাঁচে গড়া। কবে কোন যুগে কে সেই আদি মানবটিকে নিয়ে এই পল্লীটির গোড়াপত্তন হয়েছিল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর তেমন কোনো প্রয়োজন পড়ে না কারো। শুধু বেঁচে থাকা আর বংশধারার গতিচক্রকে সচল রাখার জন্য এই মানুষগুলি পৃথিবীতে এসেছে। এছাড়া অন্য কোনো মহান কাজের দায় এদের নেই। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো রয়ে বসে দিন চলে যায়। গভীর গহীন বাঁশ ঝাড়ের ভেতর যেমন কোনো একটি বাঁশ মরে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে থাকে তেমনি এদের প্রাণ—সবুজ কোনো বাঁশের মতোই ঝাড়ের ভীড়ে মরে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় এক একটি মানুষ। আবার জন্মায়। জন্ম-মৃত্যুকে ঘিরে এ পাড়ায় কখনোই কোনো উৎসব হয় না। হয়নি কখনো।

সকাল বেলায় নিত্য নিয়মে ধুনোজল পড়েছিল, লক্ষ্মীর পায়ে চন্দনের ফোঁটা—। এখন দোকান খুলে বসেছে সুধা সর্দার। বাম চোখের উপর তার একটি আব গোল কড়কড়ি ছাতুর মতো শক্ত। এই বুঝি তার মহাজীবনের তেজ। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে শক্ত হয়ে আছে।

রেনু এসে বলল,—নুন দাও পাঁচ নয়ার

আলু ২০০
সোডামাটি ৫০
মতিহার ১০ নয়া
ভালো তেল ২৫
গমের আটা ১ কিলো
খার সাবুন ২ ছিয়া
হলুদ ৪ সঁটা
এক তালোই শাল পাতা
মাখার তেল ৫০
লাটু পেঁয়াজ ১০০
বাদবাকি যা থাকে চাল দিয়ে দাও—

মন থেকে স্মরণ করে সওদা খরিদের ফর্দটি ঠরঠর করে গেল রেনুবালা। গোল

মালসার গড়নে তার মুখটি। ভীমরুলের মতো কালো তেলচকা একটি নাকফুল পরেছে। সুধা সর্দার নেই নবভরন্ত মেয়েছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে, তোদের পাড়ার নেতাই মুচির খবর কি রে—

খরখর করে ওঠে রেনুবালা—মুচি আবার কি? সে কি কারো গায়ে লিখা থাকে নাকি। সবাই তো ভগমানের জন্মিত। আপনি কেমন করে এই কথাটি বললে—

আরো কয়েক বছর আগে হলে হয়ত সুধা সর্দার বলত—উহুঃ! মাগীর কথার ছিরি ছ্যাকো। মুচিকে কি বামুন বলতে হবে নাকি—মহাশয় বলে খাতির করতে হবে? কিন্তু সে জমানা বদলেছে—। এখন জাতের বিচারের থেকে ক্ষমতার বিচারটি আগে হয়। একটা সময় ছিল—ওই ছোটোলোকগুলিকে ছুঁলে জাত যেত। উঠোন তরফে ওরা এসে ঘুরে গেলে গোবরজল ছড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। কাপড় চোপড় ছেড়ে জলে দিয়ে তবে ঘরে ঢোক। মুখের কাছে মুখ নিয়ে রুইদাস পাড়ার কেউ কথা বললে পাছেই মুখ থেকে থুতু উড়ে এসে মুখে পড়ে সেই ভয়ে ভদ্রলোকেরা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কথা কইত। আর আজ এই পঞ্চায়েতের পর ওদের এত আস্পর্দা হয়েছে যে এক একটি কথা যেন গায়ে ঝাল কেটে দেয়। বারমেসে চাষের কাজে যখন ওরা খাটতে আসত—জল খাবারের ঘটিটি তখন গোয়ালের ভেতর থেকে বের হয়ে আসত। এ ঘটি গোয়ালেই থাকত। মাঝে মধ্যে হাত-পা ধোয়ার কাজে ব্যবহার করত কেউ। কালেভদ্রে মাজাঘসা হতো। মাঠে খড় পেকেছে—হয়ত কাটতে এসেছে ওরা, তার জন্য মাটির হাঁড়িতে ভাত বসত। শালপাতা বা কলাপাতার থালায় সেই ভাত খাওয়া—আলগোছে হাতাটি থেকে গরম ভাত দিতে দিতে ঘর গেরস্তের মেয়ে বউরা বলত—ছ্যাখো বাছা, ছুঁয়ে দিও না যেন। এই তে-পহর বেলায় তাহলে আবার মুচান ঠ্যালন। গা ধোও রে। পাশ্চিত্তি করো রে। আর হাঁড়িকুড়ি দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেললে পুকুর পাড়ে বিসর্জন দিয়ে তবে সে খালাস। ওদের সঙ্গে কাজ কারবারের সময় পুরানো কালের বুড়ি মানুষরা গামছা পরে চোখের সামনে আসত। পুরানো দিনের সব শুদ্ধাচারি মানুষ তারা—তেনাদের শুচিতার আদলটাই ছিল আলাদা। তো সেইসব দিন ছিল এক। আর আজকের দিন হলো আরেক। যে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারে একসময় চক্রবর্তী, ঘোষাল, পণ্ডাবাবুদের শোভা পেত এখন সেখানে ছোট জাতের অঙ্গ দোলানো যত দেখতে পার। এই গত দশ বারো বছর আগের কথাই ধরো না, ওদের কি এই এতবড় ছাতি ছিল নাকি তখন! পূজার আসরে ঢাক পিটত, খেজুর

পাতার পাটি বুনে বিচত ঘরে ঘরে, এর ওর চালের বাতা টেনে নিয়ে গিয়ে উনানে জালিয়ে দিত। হাঁস মুরগি চুরি, গাছের পেঁপেটা সরানো, ছেলে ভুলিয়ে কান থেকে মাকড়ি খুলে নেওয়া এই ছিল চরিত্র। ধরা পড়লে মারও খেত তেমন। লাঠির বাড়ি, জুতার ঘা, গাদগিদ করে কেউ হয়ত গোদা পায়ের লাথই বসিয়ে দিত কয়েকটা। ওপরে বাঁশ নিচে বাঁশ—মাঝখানে লাশটা ফেলে জাঁত দেওয়া হতো। বেঁধে বিচার হতো—ভদ্রলোকের মানহানি ঘটল। শীতলা, দুগ্‌গা, কালী পূজার পালে-পার্বণে কোনো অংশ ছিল না—শুধু ঢাক বাজাবার ঢুলি, ঢাকটি বাজাও।

তারপর যেন আঁধারে ঢলিয়ে থাকা কোনো এক মেঠো পথ ধরে ওরা উঠে এল চোখের সামনে। এত দিনমান ধরে তাদের বুকের তলায় যে ভয়-বিভয়ের ছমছমানি ছিল, যে আলোছায়ার লুকোচুরি চলত তা যেন ফেটে বেরিয়ে এল দিনান্ত রোদের আলোয়। যে পাড়ায় কাঁকড়া-শামুকের খোল, মরা গোরুর পাঁজরা, মাছের কাঁটা কিংবা সাপের শিরদাঁড়া ছড়িয়ে থাকত সেই পাড়াই সংস্কার শুরু হয়ে গেল। গান্ধীবাবুর হরিজন সেবার সেই খেয়াল-বেখেয়ালের কথা ভেবে সবাই বলল—উঠলো বাই তো কটক যাই। থাম না, কটা দিন যাক দেখা যাবে মুচিরা কেমন করে বামুন কায়েত হয়। কিন্তু না বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই শুরু করে দিল নিউ অপারেশন। কিছুকাল আগে যে মুচি ছ্যানারা খেলার বোলে ছড়া লাগাতো—ইন্দিরা গান্ধীর মাইলো / সবাই মিলে খাইলো। মাইলো—গম-চাল-ভুষি—র‍্যাশন কণ্ট্রোল থেকে ডাইডোল পেত ছোটজাতরা। ইউনিয়ন বোর্ডের বিধিবিধান। সেই মুচিরাই কালে কালে বলতে শুরু করল—গরীব গরীব ভাই ভাই সব / গরীবের এক লড়াই। কোর্ট কাচারি মামলা মোকদ্দমা কিভাবেই যেন শিখে গেল ওরা। বর্গা আইনে ভূমিহীন নাম ঘুচল—খাস বিলি-বন্দোবস্তো, বেনাম চারানি নিয়মে জমি পেল। বীজ, সার, বলদ, লাঙল, জোগাল গভর্নমেন্টের অনুদান। বোলপুর আনন্দপুরের হাট থেকে ফেরার পথে দেখা গেল ওই পাড়ার মেয়েছেলেরা বাসমতী ধানের শীষের মতো ইমিটেশনের সোনালু হাঁসুলি হার কিনে গলায় পরেছে। চটি পরছে অল্পবয়সীরা। ডুরে শাড়ির বাহার চমক লাগাল আকাশে বাতাসে গহীনে। কৈবত, মাহিষ্য পাড়ায় লোকজনদের বাপের নাম কালে কালে খগেন হয়ে গেল। ওইসব পাড়ার কচিবুড়ো খোকাখুকুরা সব ইস্কুলে এল লেখাপড়া মারাতে। যে মুচিরা ছোলে গরু, কামায় চামড়া—আর দিনভর সেই চামে খাড়ি নুন ফেলে পস্কার করে পেট চালাত, তারা পার্টি-কমরেড হবে বলে তোড়জোড় শুরু করে দিল। জালাগোড়ার মাঠে বহুকালের বিষে জমে

থাকা কালো জল যেন আস্তে ধীরে, মানুষ্যসমাজের অজান্তে ফর্সা হতে শুরু করল। গণেশ, রিশি, বক্সা ঢুলি, কালী চামার, নিমাই রুহিদাস—মেয়ালোলের জোতবন্দে আচষা পতিত জমিতে ধান বুনল। ঘরের পাশে বেগুন গাছে ধরল নীল ফুল, সবুজ সবুজ চারা ধানের গাছে ভরে উঠল পৃথিবী। কাঁটা নটে শাক সেদ্ধ ভাত, কলা মোচার ছেঁচকি রাঁধতে রাঁধতে কোনো মুচি বউ মুখ তুলে দেখল গগন ভরেছে আলাদা রঙে, আলাদা আলোয়। অন্ধকার রাতে জোনাকিরা পথ ভুলে পুচ্ছ জালিয়ে এসে ঢুকল রুহিদাস দাড়ে। এই দাড়—ক কাঠা বাস্তু জমিতে মানুষ ফলিয়েছে—সেই ভিটেমাটি যেন হা হা করে হাসতে শিখল। জীবন—জীবন—মুচিদের হাতে পালিশ হয়ে ওঠা জুতোর মতোই ঝকঝক ক'রে উঠল জীবন।

রেনুবালা নোলক দুলিয়ে যেন ফিগার দেখাল, ক্যানে লোতন ঢুলি বললে কি মান খোয়াবে আপনি—

আটা মাপতে মাপতে তীক্ষ্ণ চোখে দাঁড়ি পাল্লার কাঁটায় দৃষ্টি ফেলল সুধা সর্দার। মাপতে মাপতেই বলল, রাগ করচিস কেনে রে। আমি কি আর অতশত মনে করে বলেচি। বহুকালের অভ্যেস এ হলো ভাই বাতের ধাতের মতো। একদিনে কি আর সারবে—

আড় চোখে-চাউনিতে রেনু দেখছিল সুধা সর্দারের হাত টানটা। সে বলে উঠল—আর একটুন ঢালো গো খুড়ো। এ যে একেবারে সনা ওজন করলে—

না ভাই ঝুঁক দিতে পারবনি। যা কাল পড়েছে ভাবচি ব্যবসাটাই না তুলে দিতে হয়। নেহাত পৈতৃক ব্যাবসা—এই লে তোর মুখের খাতিরে এক মুঠা দিয়ে দিলম। কিন্তু আজই শেষ, অন্যদিন আর বলতে পাবিনি—

লাল গামছার খুঁটে খুঁটে বেঁধে নিল রেনুবালা। এক একটি পুটুলে এক এক রকমের সওদা। ঝুঁকে বসতে গেলে বোঝা যায় ভরন্ত বুক দুটি তার জামিরা নেবুর মতো বুক থেকে খসে পড়ে মাটি মাখতে চায়। গাঙ দাড়ের নিচে নদীর জল খেলার মতো খেল ধরেচে তার কোমর—মাগুর মাছের তলপেটের মতো হলুদ রঙ ধরেছে, তেল পড়েছে। এক দণ্ড সেই দিকে তাকিয়ে বালু পাড়ার সুধা সর্দারের মন হলো—এই হাতের চাল-জল খেলে বিশ বছর পরমায়ু বাড়বে বই কমবে কি!

মনের কথা লোকটার মনের খেয়ালেই তলিয়ে গেল। কেউ শুনতে পেল না সেই ভেতর রহস্য। তেঁতুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে বুলে রেনুবালা ঘরের পথ ধরল। অদ্ভুত এই গাঁ—গুড়েবাগান। সকালে সন্ধ্যায় এখানে তেঁতুল গাছের পাতা ঝরে। তাল গাছ থেকে খসে খসে পড়ে যৌবন হারানো শুকনো তাল বেললো।

ঘাস, কুটো, ঝরা পাতার ওপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে যায় মানুষ, শেয়াল, ছাগল, পোকামাকড়। সূর্য ডুবলে আঁধার নামে। মহাজগতের ভোর শুরু হয় অলৌকিক নিয়মে। রেনুবালা দেখল গগনে চোখ চেয়ে—কটকটি পাখির মতো কটকট করে রোদ ডেকেছে ভুবনে। ছ' পোয়া, পৌনে দু'সের চাল চাপিয়ে দিল উনুনে। একটা খেজুর গাছের সুখা মুড়োকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল চুলায়। ল্যাঠা চুকে গেল—এবার মেয়েমানুষের গতরের মতো জলবে ধিকিধিকি। লিকলিকে একটা বাঁশ কঞ্চির গিঁট ফাটল ফটাস করে। নিজের ভেতরে তাহলে অন্য মনে ছিল এই রেনুবালা। নইলে এই শব্দে চমকে উঠল কেন সে—

ঝড়ের পাখির মতো যেন উড়ে এল বলাই। বলা মুচি। কামার সালের হাপরের মতো তার ছাতিটা উঠছে পড়ছে। রোদে হেঁটে আসার দরুন কপালের রগে নুন জমেচে—বালতি দে। বালতিটা দে না গো। ঘটা বালতি আছে বার কর—

কেনে বালতি কি হবে—

কি আবার হবে—গতর লেড়ে বাইরে এসে দেখবি তবে তো বুঝবি—।

অমা—আগুন, কার ঘরে লাগল গো—কার এমন সর্বনাশটা হলো। আহা গো দুলদুল করে জলে উঠছে।

ঘর থেকে আগুন ছুটেছে ধানের গাদায়, সওয়া চার কাহন খড় ছিল লোকটার—

ভাব তো—এমন মাঙার বাজার। নাই নাই করে একশ টাকা করে তো কাহন। কার টিকরায় আগুন লাগল গো—ছ্যানাপ্যানায় আঁচ ধরেনি তো—

যুগল হাজারির। ছ্যাখ ছ্যাখ—আম গাছটাও ধরে গেল।—পাশেই ঘোষেদের টিনের চাল—ধরে গেলে টিন ছুটবে দখিন পাড়া। এই বলে রেনুবালার ইহজীবন পরজীবনের লোক বলাই রুইদাস চলে গেল হন হন করে। পিছন থেকে রেনু চেঁচাতে লাগল—ওগো আমিও যাব, আম্মো যাব। কখনো ঘরে আগুন লাগা দেখিনি আমি। তরসতরি ছুটছিল লোকটা। বার বার সে পিছন ফিরে কাড় পাঠাতে লাগাল—না—নাআ—খবরদার। এক তল্লাট লোকের মাঝখানে ঢঙ মারাতে এস্‌তে হবেনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেনুবালা দেখল—চালের বাতা খড়ের ভেতর থেকে ক্ষরে আছে। এমন সময় হাতে মালসায় আগুন নিয়ে ঝুলন আসছিল—বোধহয় ভাত বসাবে সেও, আগুন চাইতে গেছল। ভয়ে ছাগল চোখের মতো নীল হয়ে উঠেছে রেনুবালার চোখ—কুচরিপানার ফুলের মতো থম হয়ে আছে নীল। সেই চোখের দিকে চাহন ঢেলে ঠাট্টা-ল্যাখরা করল ঝুলন। ক্ষরে

ওঠা বাতার দিকে, চালের দিকে তাকিয়ে সে বলল—ঠেসিয়ে দিই, কিলো বউ—ঠেসাই। আগুন উঠবে দুলদুল করে। ঠাট কত—বললি ঘরে আগুন লাগা কুখিনো দেখিনি। দেখবি নাকি—দুব তর ঘরে আগুন—

রেনুবালা হাসতে গিয়ে থমকে গেল। দেখল ঝুলনকে—বনসির পরিবার। হায়া নাই, নিলাজ ছিনাল রঙ্গ তার। ঠিক সময় পুয়াতি হলে এই মেয়েছেলের এক গণ্ডা সংসার হতো। ভরা ভাদরের পাকা তালের মতো ঢেউ—যেন শুকনো পদ্মপাতায় শীতকালের চবর গবরে ফুলে ওঠা একটা সাদা খড় হাঁস শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। এখন রেনুবালাকে দেখে সেই সাদা হাঁসটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে গতর দুলিয়ে উড়ে গেল কোথায়—

রেনুবালা নিজের ভেতরই চোটপাট করে। —বাপভাতারির খোসামদির মুখে আগুন।

ময়লা হয়ে যাওয়া একটি সাদা ধুতি ছেঁড়ার মতো যেন হাসিতে উড়তে উড়তে ঝুলন মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। সেই ঘাটের দিকে যেখানে ননীপুকুরের জলে ঢোল কলমি, হেলেঞ্চা, শানচিড়া শাক ফুটেছে। জলের ধারে বেথা শাক, শুষনি শাক। জলের ভেতর কোমর ডকুলে গেঁড়ি গুগলি, শালুক ফুলের ভেঁট—হাওয়ায় হাওয়ায় হাসির মতোই উড়ে বেড়াচ্ছে কতরকমের খাদ্যখাবার। শুধু হাত বাড়িয়ে দখল কর।

বামফ্রন্ট সরকার নতুন ঘোষণা করেছেন আরেক নিয়ম। সিডুল কাস্ট, সিডুল ট্রাইব এলাকায় কোনো চক্রবর্তী, ঘোষরা অঞ্চল প্রধান হতে পারবে না। অঞ্চলের মাথা হতে হবে ওদের থেকেই। এসবের কোনো মানে হয়! যাদের পেটে ক অক্ষর নাই—শুধুই গো-মাংস তারা চালাবে দেশ! গাঁদী পোকা, ধানি পোকার মতো জনমানুষ—একটা হাঁক দিলেই মুখের সামনে হাত জোড় করে এসে কুম্ভাজরের মতো থরথর করে কাঁপত তারা হবে শাসক। এক একটার চেহারা তো শামাং ফড়িংয়ের মতো। কেউ গঙ্গা ফড়িং—কি হে গুইরাম বলোই না, খারাপ কথা কি কিছু বলছি—

বৃন্দাবন ঘোষের দলিজে মাহিষ্য কৈবত বামুনদের বচসা বসেছে তিন সন্ধ্যায়। এইসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা হরেকরকম কাজ করে—চাষ করে, ব্যাবসা করে, মাস্টারি করে। কেউ কেউ শহরে থেকে লেখাপড়া শেখে। ইদানিং গাঁ গেরামের কেচ্ছায় তিতিক্ষায় জলে গিয়ে জমিজমা বিক্রি সিক্রি করে শহরে উঠে যাওয়ার কথা ভাবছে কেউ কেউ। এদের অধিকাংশই পূর্বকালের সেই কংগ্রেস রাজের লোক।

পরে পরে এদেরই একটা বয়সের লোকজনেরা সময় এবং সুযোগ বুঝে সি. পি. আই (এম)-এ ঢুকে গিয়ে লেফট পার্টি করতে শুরু করেছিল। এদের থেকেই লোকজনেরা অঞ্চলের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আগের দুই অঞ্চল কমিটি গঠন করেছিল। এরাই প্রধান, উপপ্রধান, মেম্বার অফ এল সি—লোকাল কমিটি। ব্লক বা জেলা পরিষদ নির্বাচনেও এরাই খবরদালালি করছিল এতকাল ধরে। মুচি পাড়ার উন্নয়নের জন্য যাবতীয় চেষ্টা চরিত্র, উদ্‌যোগ সবই এদের। কিন্তু বামফ্রন্টের এই নতুন নিয়ম শুনে সবাই চটে লাল। কিন্তু কিভাবে প্রকাশ হবে—সরকারি সিদ্ধান্ত তার বাইরে যাবে যে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে। তখন তো বিষহীন উই ঢোঁড়াসাপ কংগ্রেসীদের মতোই হবে তাদের অবস্থা—নাকে মুখে কাঁদো। আর অপেক্ষা করে থাক সেই সুদিনের আশায়—কবে রাজীব গান্ধী এই সরকারকে তাড়াবে, বরখাস্ত করবে। আর মিলিটারী নিয়মে হবে ভোট। হায়রে—থাকরে কাক ভাতের আশে / ভাত পাবি তুই ভাদ্র মাসে—

সব শুনে ঘাড় কাত করে রাজি নামা দেয় গুইরাম। অর্থাৎ না বাবু তোমরা মিছে কথা বলবেন! আমি ভাবব সেই কথা! ছি ছি! ছ্যা। আপনারা হলেন গিয়ে রাজার হাত। চিরটা কাল আপনাদের খেয়েই মানুষ। ভাত, মুড়ি যখন যা খুঁজেচি আপনারা দিয়েচ। আঁদাত নাদান সব মুচিপাড়ার ছ্যানাছোকরারা—তারা কি জানবে সে দিনের কথা। রথতলিতে রথ ছুটছে। আমার কাঁধে ঢাক—খিদিরপুর ভূ-কৈলাস রোড থেকে, সে পঁচিশ তিরিশ বৎসর আগেকার কথা, এসেছে জনাদশেক ঢাকি। কেউ কেউ নাকি ঢাকা—নাকি কোথা থেকে এয়েচে। তাদের নাম এক ডাকে সবাই জানে। দেখে তো আমার কম্প দে জর আসার দাখিল। হায় মা আমি এখন কি করি! তখন শনিবাবু বেঁচে—তিনি বললেন, কিরে গুইয়া পারবি তো নাম রাখতে—কমপিটিসানে দাঁড়াতে পারবি তো? শনিবাবুর সেকি ছাতি—ডাঙা পাড়ার সুরেন লায়েকের ৪ বিঘার জোতের মতো চওড়া। তেনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কি কথা বলি। চুপ রইনু—। সেই দশ জনার দল থেকে লাল-নীল গানের দলের রাজার মতো পোশাক পরে একজন লোক এগিয়ে এল। বুঝনু—এই হল গে মাতব্বর। সে এসে হাঁক ছাড়ল—কি লিখেচ হে গুইয়ারাম—আমি বনহু—ধামার, চৌতাল, একতাল, কয়ালি, সুর ফাঁক। সে সব ঢাকিরা তো সব কলকাতা থেকে আসিচেন—গাঁয়ের মুচির কথা শুনে তো হেসেই খুন। বলে—এত শিখেচ, বল দেখি কি মাত্রা বাজাই—এই বলে তো পিটে তুলে ঢাকে কাঠি লাগাল—ড্যাডডা না টাং—ড্যাডডা না টাং—ড্যাডডা না টাং টাঙ।

তাইতো মুশকিলে পড়নু—কি বোল বাজায় রে বাপ। আন্দাজে বুকে ভর করে বলনু—পঞ্চম শোয়ারি তাল ১৫ মাত্রার। লোকটা শুনে তো অবাক—গোমুখ্যু লোক আমি। হাত জোড় করে দাঁড়ানু তাদের সামনে। তারা তো তাদের দলে আমাকে নিলো—বললেন, বাজাও ঘিতাংঘি ১৩ মাত্রার। আমি হাত জোড় করে আবার বলনু—না বাবু ঘিতাংঘি তো ১০ মাত্রার তাল, আর ৩ মাত্রা আমি কুথায় পাব। আমার জ্ঞানগম্যি শুনে তাদের বুঝি ভালো লাগল। দয়া হল এই ভূতটার উপর—নামলম কমপিটিশনে। বাজাই তো বাজাই—ত্যাখন শরীরে ঘাম নাই। ঝাঁকড়া চুল বাবু চামরের মতো দুলে—উঠে নামে। আমি বাজাই—ড্যাডডা নাকুর নাকুর নাকুর / ড্যাডডা নাকুর না—/ ড্যাডডা নাকুর নাকুর নাকুর / ড্যাডডা নাকুর না—। আলাপের পরে দিনু আগমনী—ঢাগ ধে না তেন / ক্রান কুরকুর / তা টা ধেনে / ঢাগ ধে না তেন / ক্রান কুরকুর। সবার মুখে পদ্ম ফুলের তেজ। বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে পায়ের তলার মাটি পেনু আমি। রাগের বাজনার পর নামলম খেউড় খামটাই। মুখে বোল বলি আর বাজাই—চিংড়ি মাছের মাথা বাবু / ভেটকি মাছের কাঁটা / বউ করেচে গোঁসা বাবু / বউ মেরেচে খোঁটা—সেবার কমপিটিশনে সোনার পদকের বদলে মুখীবাবু আমাকে রুপোর টাকা দিয়ে ছিলেন। আপনাদের পায়ের ধুলা লিয়ে লিয়েই তো ইহকাল কাটল বাবু। পরেরটা কেমন কাটে—তার জন্যই তো এখানে আপনাদের বাখুলে বাখুলে ঘরে ঘরে আসা। দু দাবলা ভাত মেঙে খাই। মা লক্ষ্মীদের হাতের রান্না ভাত, ডাল, ব্যান্নন পেটে ঢুকলে যদি পাপ উদ্ধার হই। ছোট লোকই তো বাবু—আপনারাই বল—পেট ছাড়া আমাদের আর কি আছে। এই পেটটাই হলো বাবু আমাদের ভগমান। এক জন্ম ধরে এইটারই পূজা করে গেনু। যে পধান হতে চায় হতে দিন বাবু। দেখবেন সইবেনি। মাথায় বজ্জাঘাত হয়ে মরবে। আমরা যদি পধান হব তো গোরু ছুলবে কে? পাটি বুনবে কে? ঢাকে গুঁতা মারবে কে—

বেশ রসকচালি চলছিল এই সান্ধ্য মজলিশটিতে। লণ্ঠন ডিববি বাতি জলছে—কেরোসিন তেলের বাতি হাওয়ার দাপটে কাঁপে। হাসে। চমকায়। বৃন্দাবনবাবুর বৈঠকখানায় কাঁঠাল কাঠের শক্তপোক্ত তক্তপোশ। তাতেই বেশ মৌজ করে বসেছে একগুচ্ছের লোক। চা খাচ্ছে, বিড়ি খাচ্ছে। আর খোস গল্প করচে। দূরে—ভুঁইয়ে—চৌকাঠের খুঁটির কাছে গামছা পেতে অত্যন্ত সংকোচ নিয়ে বসে আছে ছোটজাতের জন্মিত গুইরাম ঢুলি। মুখে পুরাকালের গল্প—কথার বাঁকে বাঁকে গুড়, ক্ষীর, রসগোল্লার রস। সে কাহিনী সবাই শুনে আমোদ পায়। এই

যে হাতি একটি লাঠি ঠুকঠুক করে যে চলে আসে বাবুদের ঘরে—এতে পাড়ার এ কালের লোকজনেরা তেমন খুশি নয়। সাম্যবাদের শিক্ষা দেয় বুড়োকে। কেনে যেতে হবে কেনে—মাথা বিকিয়ে আচো নাকি! হাত জোড় করে থাকার সেদিন ফুরিয়েচে। এসব কথার গুইরাম এখন আর কোনো জবাব দেয় না, প্রথম প্রথম বোঝাতে গিয়েছিল—তাতে সবাই যা তড়পানি দিয়েছে তারপর থেকে চুপচাপই থাকে। যা ভালো লাগে তাই করে। চুপচাপ চলে আসে বামুন পাড়ায়, ঘোষ পাড়ায়, রায় পাড়ায়। কাউকে জানতে দেয় না—ফিরে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে—উত্তর ভাগাড়ে কোনো দামড়া পড়েচে কিনা দেখতে গেইনু। দু কাঁটা চার কাঁটা যা পাওয়া যায়। বিল বাগে চলে গেইনু—জালাগোড়ার খালের ধারে এই জোষ্টি মাসে গেদে জাম ধরেচে। ঝুঁকে পড়ে গাছ গড় করছে মা বসুধাকে। দেখতে গেইনু পেকেচে কিনা—মেঘবরন পেল নাকি। জাম খেলে অক্ত পঙ্কার হয়। আকাশ খানি জল না নামলে উ কি আর পাকবে নাকি—। কোনোদিন রায় বাখুল থেকে চালতা চেয়ে এনে হয়ত বলল—আমডুবির হাট থেকে কিননুন। আমাদের সময়ে এক পয়সায় দুটা পাওয়া যেত। এখন একটি চারানা। ঝুলনকে হয়ত বলল—গুড় দিয়ে ঝোল করতো বৌমা। মুখ ছাড়বে।

এমন সময় বৃন্দাবনবাবু বললেন—এবার সবাই চুপ। মন দিয়ে শুন হে রেডিও। পল্লী মঙ্গলের আসর—

বেশ কয়েক বছর আগেই এ তল্লাটে লাইট পোস্ট পড়েছে। কিন্তু এখনো বিদ্যুৎ আসেনি। প্রথমে ইলেকট্রিসিটি প্রজেক্টের যে প্ল্যান ছিল সেই ছক থেকে মুচি, কাহার, কামার এইসব পাড়ার কোনো পয়েন্ট আবিষ্কার করা যায়নি। তখনই একটা সোরগোল উঠে থেমে গিয়েছিল। তারপর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার এই ১০-১২ বছর পরও সেই প্রকল্পের কোনো সুরাহা হয়নি। বলা চলে প্রায় স্বাধীনতার কয়েক বছর পর থেকেই নিচু সমাজ, এই অচ্ছুত পল্লীর সংস্কার সাধনের নানাবিধ উপায় আবিষ্কৃত হতে থাকে। কিন্তু অকূলে তা খেই পায়নি। অনুদান প্রকল্প বা অন্যান্য গভর্নমেন্ট রিজারভেশন যা কিছু এদের জন্য তা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত একশ্রেণীর কাজে লেগেছে। দিন দিন আলোকিত হয়েছে তাদের জীবন। স্বচ্ছ নীল আকাশের তলায় মুচি পাড়ার যে অনাদি অনন্ত জগৎটা, তার অন্ধকার ফিকে হয়নি। তিমির হননের গান গেয়েছে সবাই—কিন্তু যে তিমির সেই তিমিরেই রয়েছে। তিমির হনন আর হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু প্রজন্ম কখনো চিরকালের নয়—নতুন ছেলেমেয়েরা আসে। তারা যুবক

হয়, মানুষ হয়, সংসার গড়ে। জগতের নব নব রূপায়ণ হয়। হাজার বছরের সেই ট্র্যাডিশনাল রীতিনীতিকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধারা নতুন সুরে গলা মেলাতে পারেনি ঠিকই কিন্তু এইসব পরিবারেরই পরের জেনারেশনটি এতকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষগুলিকে যেন মেনে নিল। তাদের কাঁধে হাত রাখল। কে জানে এটা সময়ের নির্দেশ, নাকি শিক্ষার সুফল। অনেক কিছুকে অগ্রাহ্য করল মানুষ। নতুন নতুন চেতনা ফিরে এল তাদের জীবনে। নূতনের নিয়মে পুরাতন আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যেতে লাগল।

পল্লীমঙ্গলের আসরে আজকের আলোচনার বিষয় ছিল—পাটচাষ ও চাষী। এতদ অঞ্চলে পাট চাষের কোনরকম রেওয়াজ নেই। তাই কোনো কাজে লাগল না এই বক্তৃতা। শেষ হয়ে গেল মজলিশ। লঙ্কা চাষ, আলু কোলস্টোরেজ, ধানের কারবার, বিয়ে বাড়ির কেচ্ছা, সম্পত্তি লিটিগেশন এইসব হরেক রকমের আলোচনা চলছিল। এখন সভাটি শেষ হয়ে গেলে—সবাই যে-যার ঘরের দিকে পা বাড়াল। কারো হাতে টর্চ। কেউ সাইকেল নিয়ে এসেছিল। কেউ আঁধার ভেদ করে একা একা চলে গেল কোথাও। ঠুক ঠুক করে হাঁটছিল গুইরাম। হাতে তার ঠেক লাঠিটি। খর জ্যৈষ্ঠের আকাশ—সেখান থেকে হাওয়া উড়ে আসে ফুর ফুর করে।

জ্যৈষ্ঠমাসের এক শনিবার সকালে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো রমজান আবির্ভূত হলো গ্রামে। মুচিপাড়ায়। শেতলা ঠাকুরের নামে মণ্ডপ চত্বরে আজ গাঁয়ের গিন্নি-বান্নিদের গিন্নিফলার। আতপ চাল, মুগ ডাল, আলু, বেগুন, সবজি—সেদ্ধ করে ওই মণ্ডপ চত্বরেই পাত পেড়ে বসে খাবে গিন্নিরা। এতকাল এই গিন্নিগোত্তরের লিস্টে মুচি পাড়ার কোনো মেয়েজনের নাম থাকত না। এবার মুখ্যা নবী ঘোষ গ্রামের পক্ষ থেকে মুচি পাড়াতেও পান সুপারি পাঠিয়েছে। মাঠত-চাঁদা আদায় করা হয়েছে ঘরে ঘরে। জাতে উঠতে পেরে এক অন্তরীণ গর্ব ফল্গু ধারার মতো যেন বইতে থাকে মুচি প্রাণের ভেতর। সারা রাতের উৎসব—শলার ঘরে মায়ের ছবি—পাল্‌কির মতো সেই ঘরটি বয়ে বেড়াবে চারজন বামুন। হ্যাজাক জলবে, লাঠিখেল হবে, সঙ সাজবে লোকজনেরা, বাঁশ বাজির ভেলকি খেল দেখানো হবে। গোটা গাঁ জাগবে। মা ঘরে এলেই এক ঘটি হলুদ জল চারজন বামুনের পায়ের একহাত দূরে ঢেলে দেবে প্রতিটি ঘর গেরস্থের মেয়েবৌরা—তারপর গোটা গাঁয়ের লোকজন লম্ফঝম্ফ করবে। আকাশে মেঘ না এলে বাঁচোয়া। মুচি পল্লীর ঘরে ঘরে ক্ষার সোডায় কাপড় কাচার পর্ব শেষ। ঠিক এমনি এক ভর দুপুরে

রোদ গলা সোনার মতো ফট ফট করছিল—হঠাৎ ষণ্ডামতো লোকটা এসে থপ করে বসে পড়ল মধ্যদুয়ারে। নরম তালশাঁসের মতো দুই চোখ তার—সে শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

ঢাক ছাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ফিতেটা টেনে টেনে খোলের চারদিকে বেড় দিচ্ছিল বনসি। চোখ তুলে সে চকিতে বলে উঠল—আরে বন্ধু!

পদ্মভ্রমরের চোখ রমজানের। সে বলল, চলে এলম। তোমরা কেমন আছো। অনেকদিন ধরে মন কাঁদছিল। প্রাণ বলল চ রমজান। আমিও বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই মনে পড়ল তোমাদের কথা—

তা বেশ, বেশ ভালো করেছ। আসবে বৈকি—মন চাইলে তো আসবেই। খুব ভালো লাগছে বন্ধু। কতকাল পরে দেখা—। তোমার কথা তো আমাদের পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই হয়। তা এতকাল ছিলে কুথায়। কন মুলুকে—

এই বঙ্গেই ভাই, আর যাব কোন ঠাঁই—

তা উত্তরের না দক্ষিণের ঠাঁই—

কলকাতায়। কসবা-পাকসরকাস—টেনারি পট্টিতে। কিছুকাল কাটালম শোভাবাজার। দিন কতেক চলে গেলম বীরভূমের ইলাম বাজারে—

তা গস্ত হলেনি কেউ, সেই বাউণ্ডুলেটি রইলে বুঝি। বিয়াসাদি—

এই বলে একটু চেয়েচিন্তে হাসল বনসি। তরসতরি হাতে বুনে ফেলল ঢাকের পিঠ। ঝুলন পুকুরে নাইতে গেছল। শরীরে ভিজে কাপড়টি জড়িয়ে সপ সপ শব্দে সে আসছিল। একটা তালপাতার পাটিতে রমজানকে বসে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে বলে উঠল—ওমা!

রমজান হা হা করে হাসতে লাগল—এ পাড়ার অনেক বদল ঘটল যে বন্ধুবৌ। এসে দেখি ঘর দুয়ার পর্যন্ত পাল্টে গেছে। ঘরে ঘরে সাইকেল। চালে টালি উঠেছে বেশ। আমি তো দেখেশুনে তাজ্জব বনে গেলম।

মুখে কৌতুক নিয়ে ঝুলন শুনল সব কথা। মেয়েমানুষ যেমন পুরুষমানুষ দেখলে রঙ ঢঙ করে তেমনি করল কিছুক্ষণ। বনসি বলল—বন্ধুকে মুড়ি জল দে। দই-মিঠাই দে। ঝাল মসলা দে—আর কি খাবে বন্ধু—

কোনো কথা না বলে শুধু একটুখানি হেসে যেন একথার জবাব দিতে চাইল রমজান। সে জবাব আর কিছুই নয়—মুখের খাতির। চোখের সামনে পুরনো দিনগুলো যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার। কেন এই পিছন ফিরে দেখা—কিসের খেয়ালে। নিজেকে জানে না যে মানুষ—সে বিশ্বকে দেখবে। পনেরো বছর

আগে রাতারাতি সে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তখন আরো বয়স কম ছিল—সবে যৌবন আসছে শরীরে। কিন্তু শৈশবের সেই গুলতি বাটুলের খেলার নেশা কাটাতে পারেনি রমজান। ছোট একটি ডোবার এপার থেকে ওপারে একটি বাবলা গাছে বসে থাকা ঘুঘু পাখিটিকে লক্ষ্য করে গুলতি ছুঁড়ল রমজান। সেই গুলতি গিয়ে পড়ল হরিবাবুর ছেলের মাথায়। শক্ত সিমেন্টের ঘুস্থম, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল। তখন সময় এত সুসময় ছিল না—সারাদিন তন্নতন্ন খুঁজেও রমজানকে আর পাওয়া গেল না। প্রাণপাখিটি হাতের মুঠোয় ধরে রাতারাতি পালিয়ে গেল সে।

পঁয়ত্রিশ বছরের তাগড়া শরীরটায় ঘসেমেজে সরষের তেল মাখতে মাখতে রমজান বলল—এবার থাকব বলে এলম। থাকব হে সাঙাৎ—আর যাব কোথায়—

তা থাকো। ভালোই তো। আর যদি কখনো যেতে মন জাগে তো রাতের আঁধারে লয়—দিনের আলোয় যাবে। গাঁয়ের চেহারা ছিরি বদলে গেছে—ঠিকই বলেছ। এখন থেকে সবাই মানুষের মতো বাঁচবে।

বনসি খুব গর্বের সঙ্গে কথা কটি বলছিল। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মতো এই পুরনো একটি পৃথিবীতে রমজান যেন রকমারি দর্শন করতে লাগল। মুচি ঘাটার দাড়ে এসে দেখল যেন জলের রঙও কিছুটা বদলেছে। পাল্টেছে জলশ্যাওলা, শালুক পাতা, কচুরিপানার রঙ। সব কিছু ভালো লাগছে, খালি পায়ে কাঁকর না ফুটলে—পুকুরের পচা জল গায়ে না উঠলে যেন জীবন সুখের হয় না। কতদিন পরে বুক-জলে নেমে গিয়ে এক ডুবে হিম পাঁক ছুঁয়ে ফেলল সে। কতদিন পরে পানিফলের মেরুর পাতার ফাঁক থেকে ফলটি ছিঁড়ে নিয়ে কুটকুট করে খেল সে। যেন দীর্ঘ উপবাসের পর এই তার জীবনের নবযোগ। কোথায় যেন কিসের ডাক শুনতে পেল সে। কে যেন ডাকল—নিবিড় স্বরে। কিন্তু চোখের সামনে কাউকে দেখা গেল না। আড়াল হয়ে আছে কে। এই মুচি পল্লীর আকাশ বাতাস কেমন আপন মনে হলো তার। কেমন আপনে হারিয়ে গেল সব কিছু। এ বুঝি তার জন্ম-জন্মান্তরের কাছে ফিরে আসা। লাল গামছায় টানটান করে গা মুছল রমজান—তার পেশল চেহারায় সূর্যকিরণ পড়ে যেন হড়কে যায়। স্নান সেরে সে ছোট আল-পথ ধরে পাড়ার দিকে এগোচ্ছিল। পরিচিত অপরিচিত অনেকের সঙ্গে দেখা হলো তার। কেউ সহজেই চিনল। কেউ বলল, কে বটে লোকটা—চেনা চেনা ঠেকে যে বড়। রমজান হাসে—হ্যাঁ বাবু ফিরে এলম। হ্যাঁ দাদা ঘুরে এলম। হ্যাঁ ভাই আবার আসতে হলো। সেই খালের ধার, মৃদু জলের খেলা। জালা-গোড়ার নাবাল জমিতে এখন জল নেই। পচা খড়ের নাড়া পড়ে আছে পাই পাই।

আদিগন্ত পৃথিবী যেন কর্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ঋতুমতী হয়ে শুয়ে আছে। গাছ আকাশ মাটি সবকিছুর ভেতর থেকে ঘুমিয়ে থাকা আনন্দ যেন নতুন করে জেগে উঠল রমজানের ভেতর। কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল—এ সবই তোর। তোর নিজের। তোর একার। রমজান, ভুল করে তুই এসব ছেড়ে এতকাল পরবাসে পড়েছিলি।—রমজান দুচোখ দিয়ে দুদিক গিলতে গিলতে ফিরেছে। ফিরে দেখে বন্ধুবৌ ঝুলন ভাত বেড়ে হাঁ করে বসে আছে—

নিজের জন্মের ইতিহাস রমজান নিজেই জানে না। তার মা একদিন এই গাঁয়ে এমনি ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হয়েছিল। তখন পেটে রমজান। তার বাপের কোনো ঠিক নাই। শলা—রামজীবনপুর থেকে একটা লোকের সঙ্গে ভেগে এসেছিল। বছর খানেক এই পল্লীতে ছিল—তখন রমজানের জন্ম। তারপর একদিন পাড়ার সবাই দেখল কাছাটি গেছে বাছাটি পড়ে আছে। লোকটার সঙ্গে সেই যে কোথায় চলে গেল সেই পাথরপ্রতিমা—দেখতে বড় সুন্দর ছিল। রমজান পেল সেই চোখ-মুখ-নাক। তুষারী বলে এক মুচি বুড়ি আহা বলে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেল। সে অনেক কালের কথা। ঘরে বাইরে আপনার মানুষ ছিল না রমজানের। তাই এভাবে ঝুলনকে ভাত বেড়ে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে তার বারবার নিজেকে নিয়ে নিজেরই হাসতে ইচ্ছে করল। বীরভূমের ইলামবাজারে থাকার সময় একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে কয়েকমাসের জন্য ভাব হয়েছিল তার। একদিন তাকে ঠাট্টা করে রমজান বলেছিল, জীবনে আর কোনো বাসনা নাই গো মক্ষীরাণী। মরলে কেউ কাঁদার নাই। তুমি অন্তত একবার চোখের জল ফেলো। আজ বন্ধুবৌকে আরেকবার সেই গল্প শোনাতে মন চাইল। খেজুরপাতার বোনা মোড়াটির ওপর একটি লুংগি ভাঁজ করা ছিল। সেটি পরে ভেজা গামছা উঠোন বরাবর মেলা নারকেল খোসার দড়িতে মেলে দিল সে। তারপর বসল ভাত খেতে। বা-বা ভালো হয়েছে তো—কি মাছ—কুথায় পেলে—

ঝুলন বলল—ছাঁকনি জালে ধরলুম ঘোষ পুকুরে। গেঁজা লেগেছিল—উঃ সব মাছ পেটে বীচ্ লিয়ে ভেসে উঠেছে। যে পেরেচে ধরচে। আমার জাল তো ছেঁড়া—ধরতে গেলে গলে যায়। বাছাই মরুল মাছ। আধুলির মতো চকচক করচে পেট, দেখই না খেয়ে। তেঁতুল দিয়ে রাঁধনু। তুমি এখন কইলকাতার বাবুলোক, তমার মুখে কি রুচবে?

ভাত খেতে খেতে একটা আকাশ লম্ফায় কামড় দিল রমজান। চিবতে চিবতে বলল, বন্ধু কোথায় গেল—

মাড়ো বাগে চলে গেল—মায়ের পূজা—

লক্ষ্মীকে দেখচি নি তো—

ওমা! তাকে দেখবে কেমনে—তার তো বিয়া হ গেল আট বছর আগে। দুগ্‌গা পূজার সময় আসে—ল্যাণ্ডাপ্যাণ্ডা হয়েচে। তবে ঘর দুয়ার ভালো। ভঞ্জ্‌ভূম পরগনার লোক। আমাদের মতো লোক লয়। জমিজমা আছে। কোঠা ঘর। গরু বাছুর ছাগল মুরগী হাঁস সবকিছু লিয়ে একেবারে ভরভরন্ত গেরস্থ তার। বড় লোকের ঘরে পড়েছে—শুনছি তিরিশ হাজার টাকা খরচা করে আইসকিরিম মেনসিন কিনবে—

আর দুটি ভাত দাও—

একটুন ডাল দিই—

না—মাছের আঁত দিই মটকা করে খাবো। তা তুমি কেমন আছো বল। তোমরা ভালো তো। বন্ধু বলল, দিনকাল এধারে ভালো। পার্টি করচে। মিটিংএ যাচ্ছে। সিজিনে-সিজিনে হেথা হোথা যায়।

হ্যাঁ—ভোটে দাঁড়িয়ে জিতবার তো কথা ছেল উবার—পধান হওয়ার কথাই তো ছেল। কিন্তু রামধনকে করল সবাই—

রামধন মানে সেই ট্যারা রামধন তো—

না গ না—সে ট্যারা রামধন আর নাই। এখন একেবারে সজাসুজি ছাখে। এই তো উ মাসে একটা লোতন গাড়ি কিনল। ওই ছাখ হেঁতুল গাছের নিচয় তার ঘর দেখা যাচ্ছে—আজবেসটর লাগিয়েচে চালে। আমি তো অকে বলি—ছাখো দিনি যেদি দুপাত লেখাপড়া শিকতে, নাম সই জানতে, দু চারটা ইংরাজি বলতে জানতে তবে রামধন কি পেত। না বন্ধু আমাদের অভাব আর ঘুচবে নি। বলচে ইবার বর্ষার আগে চালটা উড়াটি ছাইবে—খুলেই ছাইত কিন্তুন অত খড় পাব কুথায়। তাই গোঁজা দিয়ে বর্ষাটা ঠেকানো। তো পারবে কি মনে তো দেখি নি। আগাশের মেঘের মতো সরসর করে জোষ্টি মাস চলে যাচ্ছে। বাদল নামল বলে। বললম, গরমেন্‌ ঘর করার অনুদান দিচ্ছে—যাও ওই রামধনকে গিয়ে একটুন ধরাধরি কর। কে শুনে কার কথা। খালি বলবে উ শালা যাদের দালাল তাদের কাজ করবে। আচ্ছা বন্ধু বলো তো—শত্রুতা করলেই শত্তু, না করলে—মুখের খাতিরে চললে কুন মহাভারতটা অশুদ্ধু হবে? বল তো তুমি—

রমজান যখন এই গাঁ ছেড়েছিল তখন ঝুলন সদ্য বংশীর বউ হয়ে এসেছে। সে আর কত বছর হবে ১৬ কি ১৭। তারপর এই এতকাল পরে দেখা—কেমন

সহজ গলায় কথা বলে যাচ্ছিল ঝুলন। তার চেহারার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। রূপে কোথাও কোনো ধস নামেনি। শুধু বহুযুগ যাপনের ফলে চোখের তলায় অকাল মেঘের মতো একখণ্ড কালি জমেছে। কথা শোনার ফাঁকে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল রমজান। তাকিয়ে থাকতে তার কেন যে ভালো লাগছিল তা সে নিজেও জানে না। ময়লা শাড়ি, ব্লাউজের পিঠের দিকটা একটু ফাটা, বেশ বাঁধন-সই গড়ন—কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনের কোনো ইঙ্গিত নেই সেখানে। রমজান বলল—হবে হবে সবকিছুই একদিন হবে। এক দুঃখ কি মানুষের চিরকাল থাকে। সময়ের রকম ফের হয়। আরো কিছুদিন থাকো। দেখবে ভালো হবে তমাদের—

ঝুলন হাসে। বাঁশপাতার মতো নরম বিদ্রূপে তার ঠোঁট কাঁপে—মানুষটাই যখন মানুষ লয় তখন ভালো হবে কেমনে বল। শুধু ঢাক বাজাতে জানে, ফুলুট বাজাতে চায়। চাষের কাজ পারেনি। কোথাও কুনু দামড়া মরলে হোগলাপাত দা হাতে পাঠাও—পারবেনি। খালটা ছাড়িয়ে যে তকতকা চামটা লে আনবে তার মুরাদটুকুও নাই। দেখবে চামে মাসের পোচ লেগে রইচে। কতবার কান কামড়ে বলি চামে মান্‌স লাগিয়ে আনলে ই চাম দাম পাবে! ঘামে তখন বাবু নেয়ে ফেলেছেন—সে শুনবে কি আমার কথা। এক একদিন আমাকেই মারতে আসে।

অসুখী জীবনের একটি করুণ সুর যেন ঝুলনের নাক থেকে বেরিয়ে আসে। ভারি বুক দুটি থেকে যেন গোপন ঘামের মতো নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভাত খাওয়া শেষ হয়েছে বটে—রমজান আঙুল চেটে চেটে পরিষ্কার করছিল। বন্ধু-বৌয়ের সুখ-দুঃখের গল্প শুনছিল। দেখতে দেখতে রোদ নেমে গেল পশ্চিমে। নাক বাঁকানো বাঁশনি ঝাড়ের বনে হাওয়া ঢুকল। একা বোকা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ রমজান শুনল শেতলা মায়ের থানে ঢাকে কাঠি পড়েছে—জগঝম্প তরঙ্গ তরজা। এই গাঁয়ে ফিরে এসে পড়ন্ত বিকেলের চেহারায় সে চেনা অচেনার এক আড়াল দেখতে পেল। একটু এগিয়ে গেলে জালাগোড়ার ধারে প্রশস্ত ঘাসে ছাওয়া মাঠে এখনো গরুর মাথার খুলি, শিরদাঁড়া, হাড়গুড় চোখে পড়ল তার। মাঠের মাঝে সেই বহু পুরানো গোলঞ্চ গাছটা এখনো আছে। পাতা নাই, ফুল নাই। নখ দিয়ে গাছের গুঁড়িটি নকসে দিতে রস বেরিয়ে আসে ঝক করে। পাতাহীন এই বৃদ্ধ গাছটির দিকে তাকিয়ে অশিক্ষিত মুচিপল্লীর নতুন কুটুম রমজানের মগজে যেন অলৌকিক শিহরণ খেলে যায়। পৃথিবীর কোনো প্রাণই আসলে মরে না, আপাত চোখে তাদের দেখে মৃত বলে মনে হয়। মরে থাকা সেই জন্তুটির গায়ে পিঠে ঠিক

মতো আঁচড় দিতে পারলেই সে আবার বেঁচে ওঠে। জনহীন পৃথিবীটি থেকে জনবহুল জগৎটিতে ফিরতে ফিরতে এই নব উপলব্ধির জ্ঞানটি তার বন্ধুবৌ ঝুলনকে বলতে ইচ্ছে করল তার। কারণ একা মানুষ মনের খেয়াল কারো কাছে প্রকাশ করতে না পারলে ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করে। অশিক্ষিত রমজান জানে না—এই সত্যকেই শিক্ষিত সমাজ মানবসভ্যতা নামে চিহ্নিত করেছে—জন্ম মৃত্যু আর কথা বলাবলি।

পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার জগু দনপাটের সঙ্গে সাইকেল ঠেলে ঠেলে লম্বা সড়ক বেয়ে কেশপুরের পথ ধরেছে রামধন। কয়েকটা জরুরী ব্যাপারে জেলা পরিষদের পদাধিকারী তুহীনকান্তি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। তিনি প্রধানদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলেন। ডেকে ডেকে কথা বলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরে তাদের অভাব অনটনের খবরাখবর নেন। শোনা যাচ্ছে এবার তিনি এম এল এ ভোটে দাঁড়াতে পারেন। লোকটিও বড় জনদরদী। মানুষের সুখে-দুঃখে প্রাণ যদি না কাঁদল তবে সে কেমন নেতা হলো! এখন যিনি এম এল এ—তিনি হলেন রামকৃষ্ণ কয়াল। নেড়াদেউল মোহবোনির লোক, একটি স্কুলের হেডমাস্টার। বার বার দুবার এম এল এ হলেন। আরাম আয়েসের লোক। এলাকার লোকজন কালে কখনো তাকে দেখতে পায়। তখন ভরা মুখে হাসির খেলা। তার আগে এই সিটটি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেস নেতা রজনীবাবু। মেয়েমানুষ, টাকা নয় ছয়ের অনেক অভিযোগ আছে। নাম হয়েছিল খুব। বামফ্রন্টের প্রথম পাঁচ বছরে কংগ্রেস থেকে জিতে গিয়ে পরিষদীয় দলের নেতা হয়েছিলেন বিধানসভায়। এখন হেরে গিয়ে নাড়াজোল রাজ কলেজে প্রফেসরি করছেন। বাগদীর ছেলে—কিন্তু লেখা-পড়াটা ভালো শিখেছিলেন। —তো এবার শোনা যাচ্ছে রামকৃষ্ণবাবুকে নাকি এবার নমিনেশন দেওয়া হবে না। পণ্ডিত মানুষ, বয়স হয়েছে—ওনাকে টেনে আনা হবে পার্টি ফিল্ডে। তাই তুহীনবাবু উঠে পড়ে লেগেছেন যদি টিকিটটা পান। এতকাল অনেক অসুবিধে ছিল—কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবছর ধরে তপশিলী জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সত্যি, এলাকাটির বিভিন্ন অঞ্চলে অনুন্নত এইসব জনজাতি, তপশিলীদের বসবাস বেশি তবু কি কারণে যেন তাকে সাধারণ আওতায় আনা হলো।—

কিছু পথ হাঁটতে হাঁটতে এসে মাটির রাস্তা ফেলে মোরাম রাস্তা পেয়ে গেল

রামধন আর জগু দনপাট। আস্তে ধীরে কথা বলতে বলতে হালকা চালে প্যাডেল করছিল দুজন। রামধনের সাইকেলে একটা স্পোক খুলে গিয়ে মাটগার্ডে লাগছিল—শব্দ পেয়ে সাইকেল থেকে নেমে বেঁকে যাওয়া স্পোকটা সোজা করে আবার উঠে বসল সিটে। এবার কথা বলাবলি শুরু করল।

মুচি, কাহার, বাগদী, নাপিত, ধোপা, মাজি, ডোম এইসব অধ্যুষিত এক একটি গ্রাম থেকে নির্বাচিত এক এক জন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রামধনই প্রধান হলো, তার আরো একটি কারণ নিজের অঞ্চল ছাড়াও ব্লকের অন্যান্য অঞ্চলের মুচি বা নমশুদ্রদের সঙ্গে তার যোগাযোগটা ভালো। সাংগঠনিক ক্ষমতা ভালো। তাই শুধু গ্রাম প্রধানের দায়িত্বটিই নয়—এ তল্লাটের অবহেলিত লোকজনদের কাছে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক। নেতা। —আর জগু দনপাট হলো—খাস দণ্ডপাট। বামুনের ছেলে। এখনো পুকুরধারে বাহ্যে বসতে হলে কানে পৈতে তুলে বসতে হয়। নাকের নিচে মাছি গোঁফ—লোকটার স্বভাবই হলো কথার ফাঁকে বাঁকা চোখে তাকানো। যারা জানে তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। যারা জানে না তারা ভেবে বসবে—শয়তান লোক, মন্দ লোক, কূটনীতির চালে চলে। এই ধরনের লোকটিকে কখনো বিশ্বাস করতে যেও না হে, ছোবল খাবে। কিন্তু রামধন জানে লোকটা ভাবে যত, যদি তার একভাগও করতে পারত তবে ওর বৌয়ের মতো সুখী গেরস্থ আর কে হতো অঞ্চলে। লোকটা ভাবে যা তার একশ ভাগের এক ভাগ নিজে পায়, অধিকাংশটাই বুদ্ধিধারীতে খায়।

জগু দনপাট বলল, এবার সরকার থেকে লোন হিসাবে জার্সি গাই দিচ্ছে—

জার্সি গাই— ?

হ্যাঁরে—৮ সের ১০ সের দুধ দিবে।

এক গাঁয়ে কজনাকে দিবে—

নিয়ম তো পাঁচ। কিন্তু গরিব-সরিব দেখিয়ে যদি সুপারিশ করা যায় ৬/৭ হয়ে যাবে।

একদম বিন পয়সায়—

তা না—দু হাজার টাকা জোড়া। সেটা কি আর দাম হলো—এখন কিনতে গেলে এইসব উত্তরের গরু—জনাকে ৮ হাজার পড়বে—

তা আমার এলাকায় কার ক'জনার এই ক্ষ্যামতা আছে। এই হাজার টাকা খরচা করার—

আরে তাদের নাইবা ক্ষ্যামতা থাকল। তোর দ্বারা দেখচি রাজনীতি হবেনি। তুই

শুদু নামগুলি, জোগাড়কর না—আর টিপ ছাপ। আমি দেখি ক'দিনে তোর ঘরের মাথায় টিন উঠে। ঘরের দুয়ারে সিমেন্টের খুঁটি না যায়। যা টাকা লাগে আমি যোগাব। মালটা তুলে ব্ল্যাকে ঝেড়ে দিলেই নগদ টাকা। কি বলচি বুঝতে পারচু তো—

বুঝতে পারে কি পারে না মুখ চোখ দেখে তা বোঝার উপায় নাই। রামধন মুখ বন্ধ রাখে। সার সার তাল গাছ, কচিৎ আম গাছ, ক্ষিরকুল-অর্জুন-বকুল গাছের ভাঙা ভাঙা ছায়া আর হাওয়ার ভেতর দিয়ে মেজাজী গতিতে সাইকেল চলছিল। মাঠ-মাটি সব ধু-ধু করছে। কালবৈশাখ আসে কোনোদিন বিকালে, সন্ধ্যায়, মধ্যরাতে। রসহীন ঝুরো মাটিতে যে সব চাষীরা ধুলাচ ধানের তলা বুনেছে তাদের স্বপ্নের চারাগাছ রসহীন ধুলো মাটিতে চোখ মিলছে। এই মহাপৃথিবীতে অঙ্কুরোদ্গমের খেলা চলছে—কিন্তু তাতে কেউ চমৎকৃত হচ্ছে না। পৃথিবীর চিরকালের যা নিয়ম তার ভেতর থেকে চমৎকার কোনো কিছু আবিষ্কার করে ভাবনা চিন্তা করার মতো যোগ্যতা সাধারণ গেঁয়ো মানুষদের নাই। তাই চারা ফুটলে তারা শুধু হাসে।

নিজের ইচ্ছে থাক বা না থাক রামধন জানে একবার যখন এই বুদ্ধি বামুনের মাথায় জেগেছে একশটা রামধনেরও সাধ্য নেই যে ওদের কথায় রাজিনামা না দেয়। তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছে তো এরাই। তাও কি ক্ষমতা! লোকে জানে ক্ষমতাধারী—তারা যদি আসল খবরটা রাখত, জানত তাহলে হাসাহাসি করে মরে যেত নিশ্চয়। ঠুঁটো জগন্নাথের মতো এই রামধন যেন অদৃশ্য একটি চেয়ারে বসে ইতিউতি চায়।

দেখতে দেখতে ওরা তাতারপুর, ছোগেড়া, পুরুনবেড়িয়া পেরিয়ে গেল। তমাল নদীর বাঁশের পুল ঘটাং ঘটাং শব্দ দিল উপহার। রামধন বলল, কিন্তু এমন করে আর কতকাল চলবে গো ঠাকুর—

কেনে—এমন কথা বলচু কেনে—

সেদিন আনন্দপুরের রসিক বাগ আমাকে ডেকে বলল, এই মগের মুলুক, লুঠ-তরাজ আর বেশিদিনের জন্য লয় হে রুইদাসের পো। আবার জুতা সেলাইয়ের জন্য তোয়েরই হও। গুন ছুঁচ, চাম, সুতা সব আছে তো, নাকি ভুলে গেছ। এই জবর দখল আর চলবেনি—

আচ্ছা! আর কি বলে—

বলে রাজীব গান্ধী সরকারকে ভাঙল বলে। ফেয়ার ইলেকশান হলেই আমরা জিতব—

একটু বুঝি ঘাম হচ্ছিল—রামধনের কথার জবাবে জগু দনপাট আগে পিঠে হাত পাঠিয়ে কাঁধের দিকটা একবার চুলকে নিল। তারপর বলল—অত সস্তা লয় রে ভাই। রাজীব গান্ধী মিটিঙে মিটিঙে কি বলচে এখন—বলচে জ্যোতি বাসুজী খুব ভালো কাজ করচেন এ-রাজ্যে। তার মানেটা কি—সে কি আর ইচ্ছা করে বলচে, বলতে বাধ্য হচ্ছে। সোবিয়েত বলচে—রাশিয়া বলচে তোমাকে বামপন্থীদের বাদ দিয়ে চললে চলবে কী করে। তাদের সঙ্গে লাও। বুঝছিস তো, বিদেশের টাকায় চলে এ-দেশ। তাদের কথা না শুনলে তারা কলাটি দিবে। তাছাড়া এবার রাজীব গান্ধী ভোটে জিতে বামপন্থীদের সাহায্যে মন্ত্রীসভা গড়বে—মিলিয়ে লিস আমার আগম বলা। না যদি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় তবে বুথাই এতগুলা বছর ধরে রাজনীতিতে পোঁদ ঘসলম—

এত গভীর রাজনীতি-কথা রামধন কি বুঝবে! কি বুঝবে এদেশ বিদেশ সে-দেশের কথা। সে শুধু জানে যেই ক্ষমতায় আসুক তার কি, তবু এই জগুভগুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকার দরুন দু পয়সা হাতে আসছে। সমাজে একটা মান-সম্মান হয়েছে। পাঁচজন খাতির করে তবু কথা বলে। ডেকে ডেকে কুশল শুধায়। এসব গেলে তাকে তো আবার সেই জুতা সেলাইয়ের লোহার তেমাথা কাঁধে ফেলে হাটে যেতে হবে। তারপর সেই ছেঁড়া চামড়া জোড়া লাগাও—

সাইকেলটা থামিয়ে দিয়ে মাঠের আড়কোলে একটু মুতে নিল জগু দনপাট। কানে উঠে এলো তার পৈতা—আবার নেমে এল ছাতিতে। সাইকেলে উঠল দনপাট। তারপর বলতে থাকল—ই কি ওরা ত্রিপুরা পেল নাকি। লোভে লোভ/ বেড়াল পেল মাছ খাবার ডোব—ই রাজ্যে লাল পতাকা উড়চে উড়বে।

আশায় আছে—

সে তো বুঝতেই পারচি কিন্তু সে গুড়ে বালি। বলগে বসে বসে লবডঙ্কা চুষতে।

হ্যাঁ দাদা—আমার সম্বন্ধী লুলকার চাগরিটা হবেনি। একটু তদ্বির কর, চেষ্টা-চরিত্তি যদি তোমরা কর তবে ই আর কি—

কতদূর পড়াশুনা করেচে—

এইট পাস। কিন্তু বি. এ. পাসের বুদ্ধি মাথায়। কথা শুনার আগেই মুখ দেখেই ধরে ফেলতে পারে—

লাগিয়ে দে তো আগে পারটির কাজে। তারপর আমি দেখচি। না হয় দু ক্লাস বাড়িয়েই দেখাতে হবে। হয়ে যাবে। ভাবিস না।

তাকিয়ে আচি তো, আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আচি। একটা কিছু কর দাদা—

মুগবাসান এসে ওরা দুজন একটা চা-দোকানে চা খেতে বসল। এইবার পিচ বাঁধাই রাস্তা—সাঁ সাঁ করে সাইকেল ছুটতে লাগল। রামধন বলল, বল দিনি দাদা রামকিষ্টবাবুর সঙ্গে কি আমাদের তুহীনদার একটা খিঁচ আছে! কথায় কথায় কেমন যেন আকাড়া চঁচ শুনা যায় ভেতর থেকে—

তা তো থাকবেই—

কেনে থাকবে কেনে—একই রাজনীতির লোক তাদের তো মিলজুলটাই থাকবে। নিজেদের মধ্যে যদি মারামারি করবে তো পার্টি বাঁচে কি করে—

ইকি তোর পরিবারের সঙ্গে তার ভাজের সম্পর্ক পেলি। মারামারি করবে কেনে—কেনে করতে যাবে। এ হোল শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি—

কিরকম—

দেখা হলে ভাই-ভাই। বন্ধু কেমন আছ। ভালো আছ তো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। আর আসলে ওৎ পেতে বসে আছে, সময় পেলেই আছোলা বাঁশ দিয়ে দেয়। ওদের জন্যই পার্টির ভেতর ফাটল এল—নইলে এই এলাকাকে আমরা মুক্তাঞ্চল বলে ঘোষণা করেছিলম। ওরা ভেতরে ভেতরে খাওয়া-খাওয়ি যদি শুরু করে না দিত তবে কি আর এবারের পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস কটা সিটে জিতে যায়। যটাই পাক পেয়েচে তো। এক একজন শুধু নিজেদের গুছানোর তালে আছে।

কিন্তু রামকিস্টবাবুকে দেখলেই কেমন অমায়িক লোক মনে হয়, কি—

হ্যাঁ—তা যা বলেচিস। উপর মহলে যোগাযোগটাও ভালো। আর ই শালা তুহীনদা—এর শুধু পাবলিকের মাঝে কদর আছে। আরে বাবা রামকিষ্টকে যদি ল্যাং মারতে চাস তো যা উপরমহলে কিছু টাকা খাওয়া। তদ্বির কর। শালা এক পয়সার মা-বাপ। মাগীর দোষ—

সে কি কথা দাদা—

ভেতরের কথা কতটুকুই আর তোদের কানে আসে। এবার ডাইরেক্ট পলিটিক্সে ঢুকলি—সবই বুঝবি, শুনবি—

কেশপুরে এসে ঢুকে গেল ওরা। মাদ্রাসায় বসে বসে কয়েকজন মুছলমান খোকা মাথায় সাদা টুপি এঁটে শিক্ষা নিচ্ছে। আর একটু এগোলেই তুহীনবাবুর বাড়ি চলে এল। ইট সিমেন্টের গাথনি দোতলা বারান্দা বাড়ি। সাদা চুনকাম

করা। সামনে প্রাচীরের মাথায় মাথায় ভাঙা কাচের টুকরো বসানো—চোর যেন রাতের বেলা টপকে ভেতরে না ঢুকতে পারে। ঢুকতে গেলেই তো রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রাচীরের ভেতর ফুলের বাগান—কিন্তু ফুল ধরেনি। গাছে গাছে শুধু পাতা। সাইকেল দুটি প্রাচীরের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে চাবি বন্ধ করে দিল দুজন। তারপর চলে এলো ভেতরে—বৈঠকখানা ঘরে।

আরো জনাদশেক লোক পরিবেষ্টিত হয়ে তুহীনবাবু কথা বলছিলেন। জমিজমা নিয়ে বুঝি কথা হচ্ছিল। চোখ তুলে জগু দনপাটের দিকে তাকাতেই জগু হাসিমুখে বলল—হ্যা হ্যা দাদা। শরীরটা যে খারাপ ছিল ক'দিন—শুনলাম পোদ্দারের মুখে। শোনা থেকেই মনটা কেমন করছিল। ভাবলাম যাই একবার দাদাকে দেখে আসি। তা কি আর হয় দাদা—কতো রকমের ঝুট-ঝামাল। কিন্তু ঝুট-ঝামাল আছে বলে তো আর প্রাণের টান থেমে থাকবেনি। তা কি হয়েছিল হঠাৎ, খাওয়া-দাওয়ায় বিষ কিরিয়া নাকি! এখন একটু ভালো তো? আর সারাদিন যেমন খাটেন, কেনে পার্টি কি আর কেউ করেনি নাকি। দুদণ্ড বিশ্রাম নাই। এত ত্যাগ—কিন্তু কি পেয়েচেন বলুন তো সারাটা জীবনে! হ্যা—এখনই তো বলবেন প্রকৃত কর্মীরা কি আর পাওয়ার আশায় কাজ করে জগু। জগু—রাজনীতিতে নেমেছ মানে দেশের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দাও। কেনে ই কি বলির পাঁঠা নাকি যে নিজেকে উৎচ্ছুগ্য করতে হবে—

সভা সুদ্ধো লোকজন এই লোকটিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। সবাই চেনে না। উজবুকের মতো দেখতে—ঢুকে না ঢুকেই মুখস্ত নামতার মতো বলে গেল। সবচে অবাক হলো রামধন। এই এতটা পথ দুজন বন্ধুর মতো একসঙ্গে এলো। কই একবারও তো জানতে দেয়নি তুহীনবাবুর শরীর খারাপ হয়েছিল। সারা রাস্তা শ্রাদ্ধ করে এসে এখানে ঢুকে এখন যেন বলতে চায়—দীর্ঘকাল বাঁচো—

তুহীনবাবু বললেন—আমি ভালো আছি। তোমরা সব কেমন আছ। অনেকদিন পর। সব ভালো তো—

আর দাদা একেবারেই কি ভুলে গেলেন—

হ্যাঁ—এটা একটা কথা হলো—তোমাদের ভুলে থাকতে পারব। যাব যাব করি—বোঝই তো গোটা ব্লকই আমাকে দেখতে হয়। কতজনের মরণ বাঁচন সমস্যা। এই দেখ না এদের ঝাকরায় লেগেচে এক গোলমাল—দেওর-বৌদিতে ভালোবাসাবাসি করেচে। হাতে নাতে ধরা পড়েচে। আচ্ছা বলো তো শাসন করে কি আর মানুষের রুচি বদলানো যাবে—

বটেই তো—বটেই তো—

তারপর রামধন—ভাই তোমার সম্বাদ কি! সব ভালো তো। তোমার সঙ্গে অনেক জরুরী কথা আছে। রুইদাস ভাইরা সব ভালো আছে তো। যে কোনো অসুবিধায় পড়লেই এই দাদাটাকে স্মরণ করবে কিন্তু ভাই। যা পারি, যতটুকু পারি, যা আমার ক্ষমতা তাই দিয়ে আমি তোমাদের পাশে থাকতে চাই। অনগ্রসর বলে তাদের অবহেলা—অবহেলা যেন সইতে না হয়—

আপনি একদিন চলুন—

হ্যাঁ যাব। কিন্তু তার আগে তোমার সাথে কথা আছে। তোমাকে আরো অ্যাকটিভ হতে হবে। পারবে তো? এদিকে এসো—এক্ষুনি আমি বেরিয়ে যাব, তার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলে নিই—

এই বলে তুহীনবাবু রামধনকে ডেকে নিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য ভেতরের ঘরে উঠে গেলেন। অর্থাৎ প্রাইভেট কথা। লোকজন সবাই চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। জগু দনপাটের মুখ একেবারে থম—বামুনের মন কি গাইচে কে জানে।

এদিক ওদিক তাকাতাকি করে সবাই অপেক্ষা করছিল। কি এত পিরিতের কথা কে জানে। লোকটার শিরায় শিরায় বুদ্ধি। আর বিনা কারণে তুহীন চৌধুরী কাউকে কাঁধে হাত রেখে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ভেতর ঘরে, সে কথা বুঝি বালকেও বিশ্বাস করবে না—

এমন সময় ভেতর ঘর থেকে একটি খরখরে গলার বিষ শোনা যায়—এ বাবা মুচি! ও বৌমা, দেখে যাও কি কাণ্ডটা করেচে। বলি হ্যাঁরে খোকা—তুই কি বুদ্ধি-সুদ্ধির মাথা খেয়েচিস নাকি। এতক্ষণ বলবি তো—মুচি! এখন কে সামলাবে মুচনে ঠালন। ওরে মুখ্যু—এই ঘরে যে স্বয়ং দামোদরকে বসিয়েচি রে। ঠাকুর ঘরে তুই মুচি ঢুকাবি? এই তোর পার্টি হচ্ছে—অমন পার্টির মাথায় ঝাড়ু। ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা—যাও বাপু তুমি বাইরে দলিজ ঘরে গিয়ে ফুসফুস কর। এই পবিত্তি—গঙ্গা জলটা লিয়ে আয় মা। আগে গোবর জল তড়তড়া দে। ই চাঁড়াল ছ্যানাকে নিয়ে আমি কি করি রে। তা বলে তুই ঘরের ভাতের হাঁড়ির কাছে লিয়ে এসবি একটা মুচিকে। কেনে যে আমার মরণ হয়নি, কেনে তুলে নিচ্চে নি ভগমান। কাল সারারাত জ্বরে ভুগে সকালে এখন পুকুরের জলে ডুবে পাশ্চিত্তি কর—হায় হায়—

রামধন ভয়ে জোঁকের মতো নীল হয়ে এই দেওয়ালেরই এক ধারে সেঁটিয়ে গেছে। তুহীনবাবু বলে—আঃ পিসি কি হচ্ছে! আস্তে—বাইরে একগাদা লোক

বসে রয়েছে। তোমাদের না থাক আমার তো একটা মান সম্মান আছে। রামধন—চলে আয় ভাই—তুই আবার কিছু মনে করতে পারবি না কিন্তু। বুঝতেই তো পারচিস সেকালের লোক—পিসির বয়েস হয়েছে। চলে আয়, চলে আয় ভাই—

এদিকে পিসির গলার ঝাল শুনে বৈঠক দুয়ারে যারা বসেছিল তারা বেশ মজাই পাচ্ছিল। মুচির ঠালন লাও সামলাও। যে নিজের ঘরকে সামলাতে পারেনি, সে সামলাবে জগৎ!

যথানিয়মে খুব ভোরে সুধা সর্দারের দোকানে সওদা করার জন্য রেনুবালা মুচিপাড়া থেকে বাইরে বেরিয়েছে। শুধু কাক ডেকেছে—বাঁশবনে এখনো অন্যান্য পাখিদের কিচিরমিচির। সারা পৃথিবীর সর্বত্রই ভোর যেমন নির্মল হয়ে আসে তেমনি এই মুচিপাড়াতেও। এখানে ঈশ্বরের দাক্ষিণ্যে কোনোরকম কার্পন্য নেই। রেনুবালা ঘুম থেকে উঠে আর চুলে চিরুনি দেয়নি। দোপাট করে গুছিয়ে কানের পাসে ঠেলে দিয়েছে। করঞ্জতলায় এসে দেখল—একটা লোক মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে! চেনা পরিচিত নয়, কোনোদিন দেখেছে বলে মনে হলো না রেনুবালার। কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে গেল সে, কিন্তু নাহ্ একেবারে অসব্যের মতো কোমর উদোম, তাকানো গেল না।

যখন নেশা কাটল, রমজান তাকিয়ে দেখল মাথার ওপর রোদ বয়ে গেছে। পচা ভাদ্রের রোদ—এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। শেতলা পূজার সেই রাতেই লোকজন টের পেয়েছিল লোকটা একেবারে মাতাল বেহেড। কিন্তু যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন সে একেবারে অন্যরকম। মুচিপাড়ার শেষ প্রান্তে, বলা চলে জালাগোড়ার একেবারে ধারেই সে দরমার দেওয়াল তুলে এক কোঠা ঘর বানিয়েছে। এখান থেকে ভাগাড় খুব কাছেই। গবাদি প্রাণীসকল মরলে এই মাঠেই গাঁয়ের লোকজন ফেলে দিয়ে যায়। রাতে ভিতে হাওয়ায় ভেসে আসে সেসব কটু গন্ধ। রমজান ভালো গন্ধ আর খারাপ গন্ধে কোনোরকম তফাৎ করে না।

রেনুবালাদের উঠনের উপর দিয়েই যাচ্ছিল রমজান। আড় চোখে রেনু একবার দেখল লোকটাকে। তারপর তাকে দেখিয়েই উঠনে কাপড় মিলতে এল।

রমজান বলল—বলাই আছে নাকি। একবার ডেকে দও দেখি—

ক্যানে—

সে অনেক কথা—

ঘুমায় বটে। বিকালে এস। এখন তুলতে গেলেই মারতে এসবে—

রমজান বসে পড়ল চৌকির ওপর। বলল—একটুন আগুন দও দিকিন, বিড়িটা ধরাই—

এইবার রেনু ধরতে পারে এই হলো গে সেই নতুন লোক। বনসির বন্ধু। অনেক কথা শুনছে বটে কিন্তু চোখে দেখা এই প্রথম। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না কেন এই ভর দুপুরে লোকটা তার ঘরে এল। এই কদিন আগে মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়ে গ্রাম পঞ্চাতের লোকেরা বলাইকে মেরেচে। সেই থেকে ভয়ে ভয়ে আছে এই রেনুবালা। একটা তাল আঁটির খোলে করে দু টুকরা আগুনের আংরা এনে দেয় সে রমজানকে। বলে, খাও—

জনা কতক মুচি ছ্যানা আমগাছের ডালে ডাল লুকানি খেলা খেলচে। অবাক চোখে রেনুবালা সেই দিকে তাকাল—

রমজান বলল—আজ রাতে তো বলাইয়ের বিচার হবে। শুনেচ কিছু—

শুনেচি—

তো আমি বলি কি শুনবে—

কি—

ই বিচার বলাই মানবে নি। আজ পার্টির ডাকে যাবার দরকার নাই। চাট্টি মুড়ি আছে দাও না খাই—

ভাতের আয়োজন শেষ। দু জনের ভাত। চার মাসের পেট হয়েচে রেনুবালার। চাট্টি বেশি খায়—তবু হাঁড়িতে নাই। সানকিতে মুড়ি এনে দেয় সে। লাটু পিঁয়াজ। বুঝতে পারে লোকটার পেটে আজ ভাত যায়নি। কিন্তু সেই শত কথায় গেল না রেনুবালা। বলল—তারপর পার্টি যখন বেঁধে লিয়ে গিয়ে মারবে ত্যাখন কি হবে—

সে আমরা দেখব। আমি, বনসি, নেতাই, চকা, বংকু, মোতা আমরা সবাই এক হইচি। আমাদের কথা হইচে। রামধনের কথা মানব নি। উ হলো গ্যে দালাল—রেনুবালা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা রাগ দেখতে পেল। সেদিন ঝুলন মাগীটা এসে বলছিল—মরদ বটে। রামধনের মুখের ওপর কথা বলার একটা লোক এতদিনে এল। দেখতেও যেমন—। মাগীর কথার কোনো উত্তর দেয়নি রেনুবালা। ইদানিং ওই বজ্জাত মেয়েছেলেটার ওপর একটু চটা রেনু। বলাইয়ের গায়ে পিঠে ঢলে পড়ে কথা বলে। আর তখনই রেনুর মনে পড়ে যায় মাগীর সেই কথা—কুখিন ঘরে আগুন লাগা দেখুনু। দেখাব নাকি, দেকবি—দিই তোর ঘরের

চালে আগুন। মাগীর রস যেন উথলে ওঠে। এর আগে রেনুবালা লোকটাকে দেখেনি বটে কিন্তু তার নামে অনেক কথাই শুনেছিল। শুনেছিল এই ক'মাসেই নাকি বনসির বউ ঝুলনের সঙ্গে লোকটার ভাব হয়ে গেছে। নইলে মাগীর গতর এত ফুলচে কিসে। সে সাত ভাতারি মাগী হলেও হতে পারে এই ভেবে ওই পচালে মন দেয়নি রেনুবালা। এখন ওই লোকটির মুখে এরকম কথা শুনে তবু মনে হলো—এই মুচি পাড়ায় এযে একেবারে অন্য লোকের আমদানি ঘটেছে। কিন্তু এরা সবাই মিলে যে যুক্তি করচে তাতে যেন আরো ভয় পেল রেনুবালা। সে বলল—কি হবে উসব করে। অদের সনে কি পেরে উঠবে ভেবেচ। তারচে টাকা জরিমানা দিয়ে খালাস হয়ে গেলেই ভালোয় ভালোয় ল্যাঠা চুকে যায়—

খুব গম্ভীর হয়ে রমজান বলল—না—না সে হবেনি। গুড়েবাগানের লোকেদের নিজেদের দোষেই তাদের এই দুর্গতি। তোমার এত ভয় কিসের। আমার গায়ে না হাত তুললে আমি ওদের গা ছুঁতে দুবনি। হলো তো। ভয় মিটল। না হয় বার কয়েক মার খাব—। আমি হলম পাকা বাঁশ, মচকাবনি। ভাঙতে পারল তো ভালো—নয়তো আমি ভাঙব অদের—

কথায় যেন ভরসা পায় রেনুবালা। তবু সে বলে—যেদি থানা তানি পুলিশ এসে—

তো যাব থানায়। ভয় করলেই ভয়—

গোলমালটা লেগেছে গরু কুরিবে ঘিরে। নব ঘোষের গোয়াল থেকে কে গরু খুলে নিয়ে রাতারাতি পালিয়েচে। এদিকে কয়েকদিন আগে কালতার হাট থেকে যখন জোড়টি কিনে নিয়ে নব ঘোষ ফিরছিল তখন পথে বলামুচির সঙ্গে দেখা। ভাটুইগড়া কেনেলের ফ্যাকচারের মুখে। বলা মুচি হাটে গেছল বার কলের মাংস কিনতে। বউ পুয়াতি—সে বলল কাছিম মাংস খাব। পুয়াতি মেয়েমানুষ তার সখটি মিটাতেই হয়। সে হাটে চলে গেছল শুকভোর রাত থেকে উঠে। মুচি-পাড়া তখন ঘুমে চুপ। ফেরার পথে সে শ্যামলা রঙের হেলা গরু দুটিকে দেখে বলল, কি নববাবু লোতন লিলে নাকি—

হ্যাঁরে—দ্যাখ দিকি কেমন হলো—

ক দাঁত—

নজর কত?

কাঁচি জুয়ান—এই বলে ন্যাজ ঘুরিয়ে মুচড়ে দিতেই গরু তো লাফিয়ে ওঠে ফড়িংয়ের মতো। বলাই বলল—রাগী আছে বটে। দর্শনচিত্ত ভালো। তা কততে ব্যবস্থা হলো—

শত কম দেড় হাজার—ঠকে গেলম নাকি বলত—

না বাবু—আপনি জিতেচ। ই গরু তো কম করে ১০টা বর্ষা টানবে। গতর ভালো। ভালো। বেশ হইচে। দেখবার ভালো। ঘড়ার মতো লোম—দেখবেন তুমি গায়ের সবার লোভ পড়বে—কুড়ার সঙ্গে খোল দিবে, আমানি দিবে, ভাল বাগালি দিয়ে খাই খোরাকের দেখ-ভাল করবে, ঘাস দিবে, দেখবে জোড়টি দিনকে দিন হাতি হয়ে উঠবে—

নব ঘোষ বলল—হ্যাঁ গাঁয়ে তাক লাগাব বলেই তো এই টাকা খরচা করে কিনলম। পুষা চৌধুরীর খুব গরব ছিল হেলা জোড়টার জন্য। তাকে ডাউন দিতে পারব তো—

এইসব কথা—তো সেদিন হাট থেকে ফেরার সাত দিনও হয়নি। নব ঘোষ একদিন সকালে গোয়াল থেকে গরু বার করতে গিয়ে দেখল—নাই। খোঁজ রে খোঁজ। পেটের খিদায় দড়ি ছিঁড়েচে কিনা—। কিন্তু না—এ দস্তুর মতো দেখা যাচ্ছে মাথা গলিয়ে কেউ গলার ফাঁস খুলে নিয়ে চলে গেছে। তারপর হাজার তল্লাসিতেও সে গরু আর পাওয়া যায়নি।

গুড়েবাগানের লোক তো দিশেহারা। এই দিনে-দুপুরে ডাকাতি। এর একটা বিহিত না হলে বাঁচবে কি করে গাঁয়ের লোক। নব ঘোষকে জিজ্ঞেস করা হলো—কাকে সন্দ কর হে ঘোষ?

নব ঘোষ যেন মুখিয়ে ছিল, বলল—রুইদাস পাড়ার বলা-মুচিই এ-কাজ করচে—

কেনে, কি করে বুজলে—

সেদিন হাট থেকে এসবার সময় দেখি আমার এই হেলা জোড়টির উপর তার খুব লোভ—

সেকি—এমন জোয়ান হেলা লে সে কি করবে। মানলম সে না হয় নজর করতে পারে যে মরলে খাব। তার হাঁড়ায় ঢুকবে।

সেদিন বলে কি—গাঁয়ে ঢুকে আপনি দেখবেই জোড়টির দিকে সবাই লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—

বেশ তমার যখন সন্দ তখন তার একটা বিহিত হোক। বাটি চালা হোক। বিনা পরমানে তো আর কাউকে ধরা যাবেনি। দিনকাল যা পড়েচে মুখ থেকে কথা খসলেই সাত কাণ্ড।

এ তাবৎকাল ধরে এ গাঁয়ের চুরির ইতিহাসটি মোটামুটি একই রকম। ধরা পড়েচে ছোট জাত মুচি। তাদের গরু খেকো বুদ্ধি। সেখানে চুরি বিদ্যে ছাড়া আর

কোন বিদ্যের প্রসার ঘটবে। নব ঘোষের যত না রা তার দাদা বেন্দাবন ঘোষের চোটপাট তার দেড়া। সে বলে—দেখে লুব শালা মুচিপাড়াকে। শালা পায়ের কুত্তাকে লাই দিয়েচ তো মাথায় উঠবে। ডেকে লিয়ে আয়, দলিজে বেঁধে মার, লাথ মেরে পুয়াতি মাগীটার পেটটা ফাটিয়ে দে, দেখবি কেমন কথা না বেরয়—

লক্ষ্মীবারের বারবেলা। হেলেমপুর থেকে এল গুনিন। বাটিচালা শুরু হয়ে গেল। সেখানে রামধন, জগু বামুন, বেন্দাবন ঘোষ, নব ঘোষ, মাধাই মাজি সবাই আছে। একটি কালো লোমওয়ালা কুকুরকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে পস্কার করে এখানে আনা হয়েছে। মুচিতলায় বংকা মুচির ঘরের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় একটা বেল গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। হেলেমপুরের গুনিন জনার্দন চক্রবর্তীকে বেন্দাবন ঘোষ বলল—কি ঠাকুর আর দেরি কেনে—এবার লাগিয়ে দাও তোমার খেল।

একটা ধোয়া কলাপাতা কেটে আনা হলো। খড় দিয়ে মাটির ওপর চারকোনা গণ্ডি কেটে কলাপাতাটি সেখানে রাখা হলো। মাটির মালসার ভেতর ছিল মন্ত্রপুত জল। সেই জল কুত্তাটার গায়ে দিতেই সেই প্রাণীটা চনমন করে উঠল। তার গলার দড়ি খুলে দেওয়া হলো। এদিকে কলাপাতার ওপর একটি টিনের হালকা বাটির মধ্যে আতপ চালের ভাত আর ব্যাঞ্জন রাখা আছে। সেই গন্ধে লোভে কুকুরটা এদিকে আসছে। নিয়ম হলো—এত লোকের মাঝে না খেয়ে মুখে করে কুত্তাটি তুলে নিয়ে যাবে বাটি। যার গেরস্থর উঠানে মুখ থেকে বাটি নামিয়ে ভাত খেতে শুরু করবে, সেই হবে চোর।

অধীর আগ্রহে সবাই বসে আছে। হেলেমপুরের গুনিন মানে সাপকাটি থেকে শুরু করে ডাইনে ধরা পর্যন্ত যেদিকেই যাও না কেন তার নাম করতেই হবে। কুত্তাটি লোভে লোভে সবার দিকে তাকিয়ে-সাকিয়ে বুকে সাহস করে বাটির দিকে এগোচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সে বুঝে গিয়েচে আজকের উৎসবের সেই হলো গে জ্ঞানগোঁসাই। কাতারে কাতারে মুচি ছ্যানা কেন্নোর চাকের মতো ভিড় করেছে—বাবাহ্, এ পাড়ার মেয়েছেলেরা বিয়াতে পারে বটে! কুত্তাটা যত বাটিটি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে গুনিন ঠাকুর তত বিড়বিড় করে কি বলচে আর হাতের ঝাঁটাটি মাটিতে মারচে। ভুঁই-ঝাড় বলে একে। হঠাৎ সবাই হৈ হৈ করে উঠল—কুত্তা মুখে করে বাটিটি ধরেচে। মুখে করে মাটি থেকে উঠিয়েছে। উঠিয়ে সবেমাত্র এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

গুনিন সবাইকে বলল—অমন গোল করে যে আছ মা জননীরা, ভয়ে তো এই

তুচ্ছ প্রাণীটা এগাবেইনি। তমরা গোল ভেঙে একে রাস্তা দাও। সবাই একদিকে সরে এল। অমনি সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল কুত্তা। মুখে তার বাটি। খাবে। মুখ থেকে নামিয়ে শুধু খাওয়ার অপেক্ষা। কিন্তু বেশিদূর গেল না সে। প্রথম ঘরটি ছিল বলা মুচির। সেই উঠোনেই বাটিটি মুখ থেকে নামিয়ে খেতে শুরু করল কুত্তা—

আর যায় কোথা—হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল বলাই। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—নবা ঘোষের বেধবা বোনটা মুচিপাড়া পর্যন্ত এসেছিল। সে বলে উঠল—চুরি কুখিনো চাপা থাকেনি। বলাই ঘরে নাই—অকুলসাড়া গেছে রেনুর জন্য মা হাউড়ির থান থেকে জল আনার জন্য। সবাই বলল—তা থাকবে কেনে, চোর আবার বাটিচালার দিনে ঘরে বসে থাকে—পধান রামধন চুপ। গুম হয়ে বসে আছে। গোটা পাড়ার বদনাম। রেনুবালা কেঁদে কেঁদে বলতে গেল—না গয় বাবুরা উ চুরি করার মানুষ লয়। তাকে থামিয়ে দিয়ে নবা ঘোষের সেই বিধবা বোনটা বলে উঠল—তুই থাম মাগী। না থামবি তো তোর ইয়েতে ঝ্যাটা ঢুকিয়ে থামাব। বেশ্যা মাগী, সাতবাপের জন্মিত। মাগী চোখের জল ফেলচে—

কিন্তু একটু পরেই প্রথম সন্ধ্যাতেই ফিরে এল বলা মুচি। তার হাতের ভাঁড়ে মা হাউড়ির জল। কোনো কথা বলা নাই কওয়া নাই, নবা ঘোষ দৌড়ে গিয়ে তার গালে মারল চটাস করে এক চড়। হাতের ভাঁড় মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। বলা মুচি চোখে আঁধার দেখল—সত্যি এক নিবিড় অন্ধকার এখন মুচিপাড়ার ঘরে বাইরে, গাছ-গাছলির ফাঁকে জটিল আবহ সৃষ্টি করল। গম্ভীর গলায় রামধন বলল—ইখানে লয়। পঞ্চাতের আপিসে চল। মারধোর যা হবে সেখনেই। ঘরের মেয়ে-বৌদের সামনে মারধর ভালো দেখায়নি—

সেই বেধবা বামনি বলে উঠল—এখন তো বলবেই। পধান হইচে! নিজের জাতভাইয়ের হয়ে সাফাই গাইচে—

কিন্তু সে মেয়েমানুষটির কথায় তেমন কেউ কান করল না। সবাই মিলে বলা মুচিকে চারদিক থেকে ঘিরে পঞ্চাত অফিসে এল। সিমেন্টের খুঁটিতে বাঁধা হলো বেশ আঁটো করে। বেন্দাবন বলল—বলাই, এখনো ভালোয় বলচি গরু কি করেচু বল—

আমি গরু চুরি করিনি—

ভাই আমার ভালোয় ভালোয় বলে দে। তোকে না হয় ছাতা জুতার দাম দুব—

বললম তো ঘোষদাদা—তোমরা বিশ্বাস কর আমি চুরি করিনি—

পিছন থেকে নবা ঘোষ বলে উঠল, চোর না শুনে ধর্ম কথা। দাদা—সাদা কথায় কাজ হবেনি। উ শালাকে জুতিয়ে কথা আদায় করতে হবে। এই বলতে বলতে চোট-পায়ে এগিয়ে আসে নবা ঘোষ। পা থেকে অজন্তা হাওয়াই চপ্পলের একপাটি খুলে নিয়ে চটাস চটাস করে বসাতে থাকে।

বলাই চেঁচাতে থাকে—ওগো রামদা গো তমরা বাঁচাও আমাকে, মরে গেলম যে—

মরে গেলি—তবে মরেই যা—এই বলে মুচিপাড়ারই বংকা মুচি ছুটে এসে দমাদম লাথ মারতে লাগল। মদন মুচি ছুটে এসে চুলের মুঠি ধরে সিমেন্টের দেয়ালে মাথাটা ঠুকতে থাকে—শালা তোর জন্যে আজ গোটা মুচিদের বদনাম। এত লোভ তোর। তো খা—ভালো করে খা—

বলাই চেঁচাতে থাকে রামধনকে লক্ষ্য করে—ওগো রামদা গো—

বেন্দাবনের ছোট ছেলে সনৎ ছুটে এসে মুখে থুতু দিয়ে বলে—থুঃ! রামদা গো—রামদা—দেখি আই শালা তোর কোন বাপ তোকে বাঁচাতে আসে—

বলাই মুচির ঘরটির পাশেই থাকে ফকির মুচি। প্রতিবেশি কোন্দল—তার বহুকালের সখ ছিল শালা বলাকে দু ঘা দেয়। আজকে মওকা পেয়ে সেও হাত পায়ের সুখ করে নিল। কামার শালে যেমন ভোঁতা কাস্তে পাজানো হয়, নাঙলের ফলা পাজানো হয় তেমনি পাজিয়ে নিল বলাকে। সে গায়ের ঝাল ঝাড়ল—শালার মাগ আবার লাক্স সাবুন মেখে জলধুই করে। শালা চোরের বেটা চোর।

এদিকে রাত ক্রমে বাড়ছিলই। গুইরাম সবকিছু দেখেচে কিন্তু কোনো কথা বলেনি। সে আস্তে-ধীরে উঠে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে পাড়ায় ফিরে এসে খবর দিল—আহা গ, ছ্যানাকে যে যেমন করে পারচে মারচে। একদল শকুন যেনে মরা দামড়া পেয়ে ছিঁড়ে খাচ্চে। হায় হায় কি যে হবে আজ রাতে—বাঁচে কি মরে।

এই কথা শুনে পাড়ায় কান্নার রোল পড়ে গেল। রেনুবালার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঘোষদের শাপশাপান্ত করে সুর করে কাঁদছিল আরো জনাকয় মেয়েমানুষ। এরা সবাই হাসি আর কান্না এ দুটিকে একসঙ্গে সেবা করে। সংক্রামক জিনিস। আনন্দপুর 'আনন্দম' সিনেমায় সিনিমা দেখতে গেছল ওরা তিন বন্ধু—রমজান, ঝুলন আর বনসি। ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড। ঝুলন রেনুকে এসে বলে—ওলো চুপ মার। চুপ মার। কাঁদলেই কি তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবি—

কিন্তু সে কান্না কি আর থামে! বনসিও চুপ, কি বলবে না বলবে। ঝুলন

রমজানকে বলল—যাও না, দেখে এস। দু বন্ধুতে চলে যাও। যা হোক না হোক ঘুরে এসে রেনুকে মিছা কথা হলেও বলো মার বন্ধ আছে। এখন শুধু বিচার হচ্ছে।—এই বলে রমজানের দিকে তাকিয়ে হাসে ঝুলন। সে জানে যখন মুখের কথা বলেচে তখন রমজান শুনবেই। না বলবেনি। হলোও তাই। বনসিকে বলল—চ তো বংশী। দেখেই এসি। কি রকম কি মারধোর। ওইসব বাটিচালা নলচালা—এই যুগে আবার ঐসব কেউ মানে নাকি। তোর কি মনে হয় বলাই চুরি করতে পারে?

বনসি বলল—মনে তো হয়নি।

রমজান আর বনসি যখন পঞ্চায়েত অফিসে এল তখনও মারধোর চলছে। খিস্তি-খেউড় করছে সবাই। নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে বলাইকে—ঘসটানিতে বাঁধা জায়গাটি সরে গেছে তাই দেখা গেল—সারা গায়ে লাল লাল শালুক ডাঁটার মতো দাগ। রমজান এগিয়ে এসে রামধনকে বলল—এটা আপনারা কি করচেন। এ রকম করে কেউ আবার কাউকে মারে—

কোনো কারণে রামধন একটু তেতে ছিল। সে বলে উঠল—যে চুরি করবে সে মার খাবে—আমি তার কি করতে পারি—

কেনে, দেশে আইন কানুন নাই—

পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল, উনি কে এলেন আবার আইন মারাতে। আইন এখন জনগণের হাতে। রাখতে চাইলে আমরাই রাখব—মারতে চাইলে আমরাই মারব। তুমি কোথা থেকে কে ফোপর দালালি মারাতে এলে?

লোকটা কে রমজান চেনে না। তবে কথাবার্তায় একটা তেরিয়া মেজাজ যেন দেখতে পেল। কিন্তু রমজানের কথাবার্তার মধ্যেও ছিল আলাদা এক সাহসের তেজ। সে গলা বড় করে বলল—বিচার করুন। তখন যা শাস্তি হবে, হবে। এখন ছেড়ে দিন। পাঁচজন বসে যা বিচারে হবে—দেশ গাঁ যা মানবে তাই হবে।

এইসব একশ রকমের বচসা হয়েছিল সে রাতে। একজন এই কথা বলে তো আরেকজন সেই কথা বলে। এই ধরনের গোলমালের ভেতর দিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা খুব মুশকিলের কাজ। তবে শেষমেষ সে রাতে রমজান আর বনসি লোকটাকে খুঁটি থেকে খুলে এনেছিল। চোখাচোখি না দেখলেও রেনুবালা ভেতরের চোখ দিয়ে দেখেছিল শক্ত সমর্থ একজন পুরুষমানুষের চেহারা। তেজী রাগী চেহারা। মুচিপাড়ার আর পাঁচটা পুরুষের মতো মেয়ে-মুখো নয়। এখন সেই লোকটাই যখন বলছে সন্ধ্যায় বিচারে যেতে হবেনি। তখন নিশ্চয় আট কুল ভেবেচিন্তেই

বলছে। ঝুম হয়ে বসেছিল রমজান—মদের নেশা কেটে গেছে। কিন্তু নেশার বিষ এখনো শরীরে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে রেনুবালা বলল, বেশ যাবেনি। যেতে মানা করে দুব—

জলে-কাদায়, হালে-নাঙলে এবারের চাষের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। গাঁয়ে জোত-জমি যাদের আছে তাদের ভোগান্তি সইতে হলো অনেক। মজুর বন্দ, জরিমানা কথায় কথায়। মাথার সিথানে জালাগোড়া—অমন সরেস জমি ডাকলে রা ছাড়ে। এই ভরা বর্ষায় সে যেন ভর ভরন্ত পুয়াতি মেয়েমানুষের মতো আট-কলায় হাসে। জমিতে নাঙল পড়ল, তিন চাষ—উগাল-সামাল-তেউড়। কাঁকড়া ভেসে উঠল জলে কাদায়। মধুমতী খালে ভাসল শোল, বোয়াল, পাবদা, ট্যাংরা, কই, মাগুর। ভরা বর্ষণে তাল পাতার তৈরি পেখা মাথায় দিয়ে এইসব জনমুনিশরা ধানতলা টানল। এক পণ দশ গণ্ডা করে। ঠিকার কাজ। যা টেনেছ তা ফের রুইয়ে দিয়ে ঘর যাও। পচা মাটিতে সেদিনের সেই স্থানান্তরিত ধানের চারা প্রথম কয়েকদিন তো জণ্ডিস রুগীর মতো হলদে হয়ে রইল। তারপর লাগল মাটিতে শেকড়। আর হু হু করে বাড়তে লাগল গাছ। বনে জঙ্গলে—আশশ্যাওলায়—ঝোপে ঝাড়ে যত সবুজ ছিল, যত সবুজ ছিল টিয়া পাখির গায়ে, চিচিঙ্গে-ঝিঙে কাঁচা করলার যৌবনে যত সবুজ ছিল, যত সবুজ ছিল মানুষের মনের ভেতর সব যেন অলৌকিক এক যাদুর খেলায় ধান গাছের শরীরে জীব দান পেল। আদিগন্ত যেখানেই পৃথিবী, সেখানেই ধানের ইতিহাস। ভারত আর কাকে বলেচে। চড়াই পাখির মতো সুখের গলা—ধান বিল যেন ট্যা ট্যা করে ডাকাডাকি করে। ভোর বেলায় তার গায়ে-মাথায় শিশির নামে। রুপার দানার মতো সেইসব তরল কেউ কখনো চোখে দেখেনি—দেখলে বুঝতে পারত চোদ্দ বছরের সম্ভবনাময় কিশোরীর মতো মিঠে এই ধানের গাছ ধোয়া জল। এ তো আর শুধু গাছ নয়—ঘর গেরস্থের বহু সাধ আর স্বপ্নের সেই সোনার বালা, হার, চুড়ি যেন ব্যাঙ্কে জমা রেখেচে কেউ। পরে সুদে-আসলে ফিরিয়ে নেবে। তাই বিষণ্ণ সুন্দর শরতের এই নীল আকাশের নিচে আসলে দিনে দিনে বাড়ছে গুড়েবাগানের মানুষজনদের স্বপ্নগুলি। কিন্তু দুঃখের কথা একটাই রোজ ঘুমতে যাবার আগে যাদের চোখে পড়ে এই জালাগোড়া, রোজ ভোরে যেন নতুন করে তাদের সাথেই আলাপ করে এই ধানী-কন্যা। তারা হল মুচি। ছোট জাত তাই তাদের সঙ্গে কোনোরকমের আত্মীয়তা নাই। কোনো কথা বলবে না, শুধু ছেনাল রঙ্গে মেয়েমানুষটি তাদের দিকে তাকিয়ে

হাসবে। খেলাবে। যাবে অন্য ঘরে। শরীর দেখাবে কিন্তু ভোগে লাগবে না—অধিকারটি তার অন্য জায়গায় বাঁধা আছে।

সকাল সন্ধ্যারাত্রির মতো যে সত্য ধ্রুব হয়েছিল এতদিন তা মিথ্যা হয়ে গেল। জোতদার থেকে কয়েক কাঠা জমি এই বছরই খাস বিলিবন্দোবস্ত হয়েছে। ভূমিহীনদের জমি দান এই নিয়মে বনসি রুইদাস আর রামধন কাঠা চারেক করে জমি পেয়েচে। দিয়েচে ধানের চাষ—বাড়ন্ত ফলনবতী সেই ধানের বনে একটি ছোট আল। রাতেরবেলা এই আলে শুয়ে থাকে বিধুমুখি ধান-কেউটে। আর সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে এসে মুখোমুখি বসে গল্প করে দুই মুচি বুড়ো। গুইরাম আর নন্দকিশোর। রামধনের অকেজো হয়ে যাওয়া বাতিল বাপটা।

সে গল্প কোনো সাধারণ গল্প নয়—রূপকথার গল্পের মতোই বহুবাহারি। চমকদারি। ধানের গল্প। মানের গল্প মানুষের গল্প।

নন্দকিশোর বলল—ধানের বনে পোক ঢুকল নাকি গ খুড়া—

এই যে—দেখচনি, কে পালা খায়—

না না উ পকা লয়। ই বানার বছরে ধানে পকা লাগার কথা ত লয়—

লিকান দিবে কবে—বেগাছ জন্মেছে গোড়ায়—

দিনা কুড়ি যাক। চারদিন তো মেঘজল হলো। গাছের গড়ায় রোদ চাখলে ঝাড় কাটবে—

পূজা তো এসে গেল গ। ইবার ছোট সেই ছ্যানাটাকে একবার আনবে নিকি—

মনে তো সেই খেয়াল। দেখি—

বাজাতে যাবি নাকি বনসি—

যাবে বলছিল। জার্সি গাই কেমন দুধ দিচ্চে—পাতে ফোঁটাফাটি পড়ে, নাকি পয়সা করচ শুদুই—

কথায় কথায় বেলা বাড়ে। দুই বুড়ো যে যার কাজে চলে যায়। বই সিলেট বগলদাবা করে মুচি ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। ইস্কুলের ভেতর তারা চিৎকার করে সবার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে নামতা পড়ে। দূর থেকে শোনা যায়।

ঝুলন বসে বসে খেজুর পাতার পাটি বুনছিল। এমন সময় কানে এলো নিতাই চামারের মায়ের গলা। সে তার বউকে বলচে—বাপ ভাতারি—

কি বললি যা মুখে এসে বলবি—এই বলতে বলতে ছুটে এসে শাউড়ি গিরি-

বালার চুলের মুঠি ধরে পিঠে গুম্ গুম্ করে কিল মারতে লাগল নিতাইয়ের বউ জবা। শাশুড়ি-বউয়ের সেকি রুদ্র মূর্তি। যত মার খায় শাশুড়ি তত বলতে থাকে—ঝরতে থাকে তার মুখ থেকে পচাল—

নাড়ি, সর্বনাশী,—যে হাত দিয়ে মারলি সে হাতে তোর পোক পড়বে। গলে গলে পড়বে। গুটি হবে। ঝামরা হবে। তোর ঘরে যোগী ডাক্তার ঢুকবে। আধ রাত্তে বিধবা হবি তুই। মরণকালে কুত্তায় মুতবে তোর মুখে। যে হাতে মারলি সে হাতে তোর ঠুঁটা হবে। কুঠা হবে। শকুনে ছিঁড়ে খাবে। মাগী বেশ্যা মাগী—রাতের বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে কলাতলায় কার সঙ্গে শুতে যাউ বলব—বলে দুব সব—

কি? কি বললি—আরেকবার বল। যদি তোর জিভটাকে আমি ছিঁড়ে আনতে না পারি—

জিভ ছিঁড়বি, মাগী তোর বাপ দিয়েছিল নাকি—

আবার। চুপ্ মার বলচি। না চুপ মারবি তো মাথাটি ধরে ঠুকে দুব দেয়ালে।

ঠুকাবি মাথা—তোর ইয়েতে ঢুকাতে মন করচে। ছিনাল মাগী—

না—এ্যাকে গাদগিদ করে আরো দু'ঘা না দিলেই চলচেনি।—বলে খর পায়ে এগিয়ে আসছিল জবা। ঝুলন ছুটে এসে হাত দিয়ে টেনে ধরে—ওলো—থাম না লো। রাগ যে একেবারে গোখরা সাপের ছাতা, একবার মাথা তুললে আর নামাতে পারুনু।

জবা হাতের কাছে সইকে পেয়ে খর মুখে হাজার রকমের নালিশ করতে থাকে। ওদিকে শাশুড়ি বুড়ি এক নাগাড়ে শাপশাপান্ত করেই চলেছে। মুচি পাড়ার এ নিত্য নিয়ম। এ ঘরের সঙ্গে ও ঘরের লড়াই। এ বউয়ের সঙ্গে ও বৌয়ের। পুরুষ মানুষরা কাজে যায়—আর মেয়েমানুষরা ভাত রাঁধে। পরচর্চা করে। মারপিট, চুলোচুলি করে।

জবা বলে, আর কি বলব ভাই। সাতকালে গে এককালে ঠেকল—ই বার মরবে, নিম ডাল পুড়বে। এখনো খাবে এক কাঁড়ি। কত খেতে দিই বল দিকিন। তিনটা ছ্যানা প্যানা—ছোটটা তো জোঁকের মতো চুষে চুষে খায়। হাঁকলাপনা আর সহ্য হয়নি যে। ছ্যানা দুটাকে যত দিতে পার তত খাবে—আর তত হাগবে। কাঠি গজাটি—গায়ে মাস লাগেনি। আর লাগবে কি করে বল ভাই। এই খেল এই ছুটল, শরীরে কি থাকতে পেল সেসব।

তা ছ্যানা প্যানারা খাবে বৈকি—

আমার হাড়মাস চিবিয়ে চিবিয়ে খাক না—মগজ ভেজে খাক—

এই বিষ বাষ্পের খেলা কিছুক্ষণ পরেই শিথিল হয়ে যায়। বেলা বাড়ে। ঘরে ফিরে এসে ঝুলন দেখল মধ-দুয়ারে একটা পাটি পেতে রমজান এসে বসেছে। আর তার মুখের কাছে পড়ে আছে একটা রক্তারক্তি পাখি—

ঝুলন একবার লোকটার দিকে তাকায়। কোনো কথা বলে না, তার চোখের কোণে আর ঠোঁটের বাঁকে মানুষের মনের মতো বাঁকা ঢেউ। ঘরে বনসি নাই দেখে লোকটা ইচ্ছে করে-করে এই সময়গুলিতে আসে। রমজান বলল—হোরেল। আড়ফাপড়া ছুঁড়ে মারলম। রাঁধো তো জুত করে। কতকাল খাইনি।

ঝুলন বলে—মাংস খেতে এত ভালো লাগে। যে এমন ফুলের মতো পাখিটাকে মারলে—

রমজান হাসে। পুরুষমানুষের লাজ যেরকম হয়। সে বুঝি বুঝতে পারে মেয়েমানুষের ঠিসারা। ঝুলন বলে, কি হলো ইবার যে চুপমেরে গেলে—দাও একটা রা—

কি রা দুব—কে না জানে বলো, পাখি নিরীহ বলেই তো তাকে মেরে সুখ—আর মাংস কে না পছিন্দ করে বলো, তুমিও তো ভালোবাস—চাও—

এ কথায় আর পাঁচটা মেয়ের মতো লজ্জায় রাঙা হলো না ঝুলনের মুখ। লাজে মুখ রাঙা হয়ে ওঠার বয়স তার চলে গেছে। শুধু ঠোঁট চেপে চকিতে রমজানকে দেখে নিল যেন। তারপর হাত বঁটিটা নিয়ে জিনিসটার পালক ছাড়াতে লাগল। হাসি মুখে ছাড়ানো ভুট্টার মতো বিকিরন।

বঁটির পাতে হাঁটু উঁচু করে চেপে আর একটি পা মাটিতে পাতা। শাড়ির চাপান উতোর ঠেলে বুক দুটি তার ভারি পিছলায়। দুটি বুকের মাঝে দু মুঠো ধান রেখে দিলে কিছুক্ষণ বেমালুম রয়ে যাবে। কিন্তু তার পরই যেন ফুটতে ফুটতে এক একটি সাদা খই বেরিয়ে আসবে। সত্যিকারের মানুষের মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে রমজান—

কি দেখ অমন করে—

যা দেখাও—

আমি দেখাই নাকি—অসব্য কাপড়টা যদি একটা কথাও শুনতে চায়—এই বলে শাড়িটি টেনে দেয় ঝুলন। এ যে একেবারে গলার কণ্ঠিহাড়টি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। বলল—হাঁ করে বসে বসে যেন গিলে খাচ্ছো।

কথা এতক্ষণ ধরে বসে বসে বলছিল ঝুলন। কিন্তু মন বলছিল কি কইচিস

লো। বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ে। ভালো লাগচে বুঝি খুব। এই তো মরণ দশা—তোর বুঝি ধরল। কোন পথে ছুটচিস লো—কুথায় মিলাবে তোর খেয়াল। মিশ খাবে নাকি। আরে উ হল গে পুরুষমানুষ। ডাকবে। চাইবে। খাবে। তারপর দুখির পাখির মতো উড়ে যাবে সাগরের দিকে। নীল সমুদ্দুরের লোক নীল শুয়ুকের মতোই জলের তলায় তলিয়ে যাবে। তাকে ঘিরে কি অত ভাবচু মনে মনে—

বহুঘাটের জল খাওয়া লোক। রমজান বিড়িতে আগুন লাগিয়ে টানতে থাকে। চোখে তার মদের ছটা। মুচিপাড়ায় কেউ জানে না—ঘরের ভেতর পাখি কাটতে কাটতে দুই হাত রক্তাক্ত হয়ে উঠল ঝুলনের। সে সামনে বসে থাকা পুরুষটার দিকে তাকিয়ে ঠাটের হাসি হাসে। বলে—ছাখো দিনি হাত দুটি—

তখন আকাশ ফেটে রোদ নামছে জগতে। গাঢ় ঠাণ্ডা খড়ে ছাওয়া ঘর সংসারের ভেতর। খিলখিল করে ডাকিনীর মতো হেসে উঠল মেয়ে। তারপর মাছ ধোয়া বাঁশের খালইয়ে মাংসের টুকরোগুলো ফেলে ঘাট থেকে ধুয়ে নিয়ে এল ঝুলন।

কিন্তু অবাক কথা—এই বুঝি মানুষ। একেবারে চুপ। কথা নাই। চোখে-মুখে কথা বলার কোনো দাগড় যেন লাগেনি। এক মেয়ে ঘাটে গেল—ফিরল আরেক মেয়ে। যেন তার কোনো হাসি দুঃখ নাই। ভাব-বিভাব নাই। রাগ-শাকের বালাই নাই। চোখ দুটি ম্লান। এতক্ষণে চোখের কালি স্পষ্ট দেখা যায়।

রমজান কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে না। শুধু জিজ্ঞাসার চাউনি তার চোখে। সর্বক্ষণ যেন মনের বাইরে ছুটছে মন। কেন, কিসের এত ছমছমানি এত চলমল্লানি কুথায় গেল। তবে কি তেল নাই শিশিতে? মসলা নাই ডিবায়? নাকি চাল বাড়ন্ত—

ঝুলন বলল—সে কথা লয় বন্ধু—

কি কথা—

ভালো লাগেনি—

কেনে—

বুকের ভিদরে কাঁকড়া চলে গ—

ধাঁধাটি যে ভাঙতে পারলম নি বন্ধু—খুলে বলো না—। এই বলে আদি মানবের মতো মুগ্ধ চোখে রমজান তাকায়। মেয়েমানুষ সেখানে রহস্য। আঁধারে ঢাকা বিদ্যুতের মতো চকিতে ঝিলিক টানে। হাসে। চমকায়। বিষ ঢালে। যেন বড় চেনা চেনা লাগে। আবার অচেনায় হারিয়ে যায়।

কেমন তাকাতাকি করে কি দেখে দুজনা—দুজনের দিকে! কি আছে চোখে—পরানের ঠেলায়। লোকটা কি খারাপ লোক, বজ্জাত! নাকি মেয়েমানুষটাই নষ্ট মেয়েমানুষ। আগুন ছাড়া মানুষের জন্য কি মানুষের আর কিছুই নাই!

বনসি এসে যায়—আরে বন্ধু তুমি কখন! হোরেল—কে মারল। অনেক কথা আছে—

কি—

সে বসে বলব। অনেক কথা। সব কথা তোমায় শুনতে হবে। শুনে-দুনে বুদ্ধি খাটাবে। ভীমরুলের চাকে তো গুঁতা দিয়েচ। ক্ষেপেছে মাছি। এবার সামলাতে পারবে তো—নাকি আপোষ মীমাংসাই আসা ভালো বল দিনি—

কি বলবে তো—

ওরা ঠিক করেচে আমাকে আর তোমাকে মারবে। আমরাই মাথা—আমাদের জন্যই লোকজনের মুখে, পাড়ার মুখে বোল ফুটল।

আমাদের দলে এখন আর আমরা দু'জন নাই বন্ধু। এ পাড়ায় যা আছে আছে—তা বাদে তাতারপুর, আগর, ডলং, সাতসোল—এসব গাঁয়ের লোকজন আছে। তুমি থামোই না—দেখই না কত ধানে কত চাল—

কিন্তু আমাদের তো ভয় হয় সাঙাৎ। তোমার কি, কিছুমিছু হলো তো রাত-বিরাতে ঘরদুয়ার ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গেলে। মাথা যাবার আমাদের যাবে। গর্দান যাবার আমাদের যাবে।

না বন্ধু। আমি এবার এখানে থাকব বলেই তো এলম। তোমরা সবাই যদি নিজের করে লাও—

তবে একটা বিয়া সাদি কর। ঘরকন্না কর। থাক। দেখব নাকি ভালো মেয়েছেলের সন্ধান—

ভেজা কাঠের ধোঁয়া বেশি। বাঁশের ফুকনিতে করে উনানে ফুঁ লাগাচ্ছিল ঝুলন। এই কথায় সে একবার রমজানের দিকে তাকিয়েই আবার মুখটি ফিরিয়ে নিল। আহা বেচারির সারাটা জীবনই বুঝি এই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাটল।

কথায় বার্তায় রমজান এ পাড়ার মুচিদের থেকে আলাদা। একটু অন্যরকমের। এ বিষয়টাকে প্রথম প্রথম পাড়ার লোকেরা বিষ নজরে দেখত বৈকি। কিন্তু তার বাক চালে অন্য এক আকর্ষণ আছে। শুধু ঝুলন নয়—এই ব্যাপারটা টের পেয়েছে অনেকেই। সেদিনের বলাইয়ের বিচারের সূত্র ধরে রমজান যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এখন এই গাঁয়ে কেন, চার তল্লাটেরই লোকজনেরা কেউ কেউ এসে

তাদের মনের ভেতরের খবর রমজানকে দেয়। যেন এই লোকটাই পারে সব রকমের মানুষের সব রকমের অভাব দুঃখ মোচন করতে। আর কিভাবেই যেন রমজানও নিজের বাহুতে, বুকের পাটায় আস্তে আস্তে বল পাচ্ছিল। নতুন নতুন বুদ্ধি এখন খেলছে তার মাথায়—কিভাবেই যে মুখ দিয়ে অমন ভালো ভালো কথা বলে ফেলছে তা রমজানই জানে না। এই জন্যই বুঝি বলেছে—তুমি যন্ত্র পড়ে আছ বাজাবে লোকে তবে বাজবে। নইলে যন্ত্র আর মরা জীব এ দুই হলো এক হে। গানটা কি, গানটা কি—সুরটা যেন পেটে এল, মুখ পর্যন্ত আসতে পারল না। হারিয়ে যেতে যেতে তার খুঁটটা ধরে ফেলল রমজান—যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে। কেমনে বাজিবে যন্ত্র যন্ত্রী বিনা কাজে……

বনসি বলল—নাইতে যাবে তো বন্ধু। নাকি আজ থাক—বেলা পড়ে গেল—

রমজান বলল—আমি নেয়েছি সে কোন সকালে। নাইতে গিয়ে দেখি একটা পানকৌড়ি ডুবছে উঠছে। আর মাছ খাচ্ছে।

মাছ খেতেও দেখলে—

হ্যাঁ। জলে ডুবে ঠোঁটে আনল একটা রূপালু মাছ। কি মাছ কে জানে। পাখিটাকে দেখে আমার ছোটকালের কথা মনে পড়ে গেল। মারতেই হবে একটা পাখি। খেতেই হবে। জীবন একটিই বন্ধু—যা সাধ আছে এই বেলা পুরিয়ে লাও। একটা বাবলা ডাল ভেঙে বাটুল বানিয়ে ইট আড়ফাপড়া নিয়ে চললম সামের বেড়।

ঝুলনের কথা শেষ হয়নি। কথার মাঝেই বনসি এসে সুতো কেটে দিল। নিশি পাওয়া এক নেশার মতো ঘোর। বুকের ভেতর যেন সহস্র ফেনার গাঁজলা উঠছিল। সব কথা বলতে নাই, বুকের ভেতর মাটি চাপা দে রাখতে হয়। মানুষ বুঝবে কেনে। ঝুলনের দিকে তাকিয়ে রমজান বলল—মনের ভেতর বুঝি বড় জলুনি—

এই কথায় যেন চমকে উঠল ঝুলন, তেমনি চকিতে দৃষ্টি হানল চৌদিকে। দেখল বনসি নাইতে চলে গেছে মুচিপাড়ায়। এইবার তার বুকের ভরা মাটির কলসি দুটি ঠোকাঠুকি করে। ভাঙে। আপন গাঙে ডুবে মরে। সে বলে—মাটির টানে এসেচ ভালো। টিকলে হয়—

কেনে, এমন কথাটি বললে কেনে—

ঝুলন হাসছে নিঃশব্দে, রাঁধছে পাখির মাংস। তার শরীর উঠছে ফুলে ফুলে—সে বলে, তোমার এই তেজটা আমার খুব ভালো লাগে। কাউকে বলে ফেলনি আবার—

রমজান যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই মুখটা সামনে বাড়িয়ে ঝুলনের মুখের কাছে চোখ এনে বলল, তেজ। একলা মানুষের, যার কেউ কোথাও নাই তার এই জিনিসটি যে থাকতে হয় বন্ধু। নইলে শিয়ালে ছিঁড়ে খায়—

ঝুলনও যেন আরো একটু কাছে সরে এল। বলল, দু চাকা মাংস চাখবে নাকি—

তার গায়ে বড়ো সুবাস—রমজান জানতো না এই সুবাসের খবর। মাংস চিবাতে চিবাতে সে দেখল ঝুলনের চোখ দুটি তাকে ধুচ্ছে। ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করচে। যে জল আর নরম সাবান এখন রমজানের গায়ে—সে শুধু গন্ধ পায়। এত ধোয়া মোছা, এত কাচাকুচি—শুধু দুটি চোখের সাগরে ধুয়ে ধুয়ে ঝুলন বুঝি এই মুচি লোকটার মুচিত্ব ঘুচিয়ে দেবে। রমজান বলল—লোভ দেখাচ্ছ!

ঝুলন বলল—কোলজাটা খাও। ভাল সিদ্ধ হয়েচে—

দুর্গাপুজো কেটে গেলো। এখনো পুরুষমানুষরা ঘরে ফেরেনি। কাঁধে ঢাক তুলে নিয়ে তারা চলে গেছে দূর-দূরান্তে। কেউ কেউ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর, কেউ মুর্শিদাবাদ। যাদের ভালো যোগাযোগ আছে তারা কলকাতায় ডাক পেয়েছে। সময় অনেক অন্যরকম হয়ে গেছে, তবু মাঠে এখনো কাশফুল ফোটে। শরতের শোভা দেয় নীল আকাশ। সেই স্বচ্ছ পরিষ্কার আকাশের নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জবা আর রেনুবালা। তাদের কাঁখে বাঁশের তৈরি আটাং ঠেকাঝুড়িতে শুকনো কাঠ। আরো কয়েক বছর আগে এই রেওয়াজটি খুবই চালু ছিল—দুপুর হলো তো কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে মুচিনিরা চলল কাঠ কুড়োতে। এত কাঠ পৃথিবীতে আছে নাকি যে রোজই কুড়িয়ে শেষ করা যায় না। আসলে হাতে সুসময় এলে তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না মুচিনিরা—এর চালের বাতা, ওর বেড়ার কাঠি চুরি করে ঝুড়ি ভরবেই। কখনো সঙ্গে নিয়ে বেরয় পালাকাটি—খেজুর পাতা কেটে আনে। পাটি বোনে। আজ দুজনেরই ঝুড়ি একেবারেই ফাঁকা—পৃথিবীতে কোথাও কোনো গাছ শুকোয়নি। দুই সখি তাই খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পরের ঘরের কাসুন্দি ঘাঁটছিল। এমন সময় চোখে পড়ল ঘেঁটু দাড়ায় কারা একটা গরু ফেলে দিয়ে গেছে—

আঙুল বাড়িয়ে রেনুবালা জবাকে বলল, হদ্যাখ—

ওমা—এখনো কেউ খপর পায়নি নিকি—

তাই তো দেকি। চ দিনি তরসতরি পায়ে। কাছে গে দেখি দামড়াটা কেমন—

কিন্তু দেখেইবা কি লাভ—

কেনে—

ই তো আমাদের ঘেরের মাল লয়। হাত দিলেই দাঙ্গা বাঁধবে। ই তো তাতারপুরের মুচিদের জিম্মা।

কে আর জানচে—আয় না, অরা আসতে আসতে চার কাঁটা ছাড়িয়ে পালাই। পালাকাটি তো আছে—

কিন্তুন অমন সোন্দর চামটিকে লষ্ট করবি।

তুই যে একবার বলেছিলি খাল ছাড়াতে জানু। কি লো ভুলে গেলি নিকি—

তেমন জানা সে তো জানিই। কিন্তু চামে যদি পোচ পড়ে। গায় মাস লেগে থাকে—

তায় আর কি হবে—দু পয়সা কম দাম পাবো এই তো—লে কোমরে কাপড় বাঁধ—

তুই গরুটাকে উল্টে ধর দিনি—ঠ্যাং দুটাকে চিরে ধরবি—আমি কাটতে থাকি—

জীবন আর জীবিকার সম্পর্ক মানুষের কেমন সহজাত। আনাড়ি চারটি হাত আর চারটি চোখ ঝড়ের হাতে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় পশ্চিমদিক থেকে এ পাড়ার মুচিরা হৈ রৈ করে ছুটে এলো। বেঁধে গেল লড়াই।

সত্যি ঘের যে পাড়ার আওতায়, দামড়ার ওপর অধিকার তাদের। জবর দখল চলবে না। রেনুবালা আর জবা দুজনে মিলে গলা তুলে চেঁচাতে শুরু করল। অনেকসময় চেঁচামেচিতে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কথায় বলে চোরের মায়ের গলা বড় / ঘন ঘন যায় শেতলা মাড়ো। কিন্তু কোনো সুরাহা হয় না। আগেকার দিন হলে দুই দলে হয়ত মারপিঠই শুরু হয়ে যেত। কিন্তু এখন মানুষ অনেক সভ্য হয়েছে—হুট করতেই কেউ কারো গায়ে হাত তুলতে ভয় পায়। এ পাড়ার যেসব মুচি মুচিনিরা এসেছিল তারা বলল—এখন যা, আজই রাতে পঞ্চাতে ফেলে বিচার দুব। এককাঁড়ি ট্যাকা দে জরিমানা দিবি। যেমন আমাদের ঘেরে চুরি করতে এসেচু। তরা চোর—তোদের গুষ্টি চোর। কিন্তু আমরা সব্য লোক—কষ্ট করে ছাড়ালি যখন দু কাঁটা চার কাঁটা লে যা। পিণ্ডির সঙ্গে রেঁধে খাবি।

এতগুলি লোকের মাঝে পড়ে রেনু আর জবা চুপ করে যেতে বাধ্য হয়। এক-জন মুখ বাড়িয়ে নাকে পরে থাকা খেজুরছাড়ি নথ দুলিয়ে বলল—শিখ্ লো শিক, দ্যাখ্—তোদের ঘেরে তরা যখন গরু ছুলিস সারাদিন গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও দু

কাঁটা ছোঁয়াস না। কুত্তা, গরু, ছাগলের মতো নিজেদের পেটটাই চিনলি! যা যা লে যা। লিয়ে বিদায় হ। তোদের তো মানসম্মান নাই—খা খেয়ে মর—

জবা আর রেনুবালা ভয়ে ভয়ে ছিল। এখন পালিয়ে আসতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আর বলাবলি করতে লাগল এখন কি হবে। পঞ্চাতে বিচার মানে টাকা গুনাগার দাও, তবে গে খালাস। জবা বলল—বাজাতে গেচে, ঘুরে এলে আমার পিঠে চেলাকাঠ ভাঙবে। বনু তোকে—যাসনি লো। ইবার ফলল তো। লে সামলা—

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগোচ্ছিল বাবুপুকুরের দিকে। রোজকার নিয়ম যা—বনেবাদাড়ে, শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে এই পুকুরে নেয়ে ঘরে যায়। আগে এই পুকুরে জলসরার অধিকার ছিল না মুচিদের। এখন সেই অধিকারটি পেয়ে মুচিনিরা ইচ্ছে করে অনেকক্ষণ ধরে পুকুরে গা ডোবায়, গায়ের ঝাল মেটায়। এই কিছুদিন ধরে রেনুবালা দেখে, সে যখন নাইতে আসে তখন পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে বসে বামুনপাড়ার সতেবামুনের মেজ ছেলেটা। শহরে থেকে পড়াশুনো করে। ঘরে এসেছে কদিন। রেনু নাইতে এলে সে এসে ঘাটে বসে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। রেনুও ইচ্ছে করেই জলের মধ্যে বুক ডুবিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে দেয়। পোয়াতি মেয়েমানুষের ভরা বুক দুটি ছোট ছোট ডাবের মতো জলের ওপর ভাসে। ছেলেটা তাকিয়ে দেখে, রেনু মজা পায়। মুখে মিটি মিটি হাসি।

রেনুবালা বললো, দেকলি ছেলেটা এসে ঠিকই বসে আছে—

দেখবেই তো—এমন চেহারা যখন আমার ছিল তখন এইসব হ্যাপা আমাকে সামাল দেতে হয়েচে—

দেখ, কেমন করে বসে আচে, যেনে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেনি।

স্নান সেরে ওরা কাঁখে ঝুড়িটি নিয়ে ফের ঘরের পথ ধরল। আবার বোলচাল চলতে লাগল বিচারের কথা ভেবে। সত্যিন—কি হবে, কতো টাকা গুনাগার দিতে হবে, না গেলেই হোত, কেনে কু ডাকল মন, আর ছুটে গেলম। ভুতে টানলে না গিয়ে কি আর রক্ষে। রেনু বলল, মরা গোরুটা পুয়াতি ছেল। দেখবি রাতে গোময়া হয়ে ঘাড় মটকে খাবে—

কিন্তু সবাই অবাক হয়ে গেল যখন দেখল বিষয়টি আদৌ পঞ্চাতে উঠল না। দু-ঘর দু-ঘর চার ঘর মুচিকে একসঙ্গে বসিয়ে রমজান দু পক্ষেরই বিষ ঢেলে মাটিতে ফেলে দিল। শুধু কয়েকটি মুখের কথা—সব ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। সে তো হলো কিন্তু মুচিপাড়ার জনাকয়েকের বুক তো ভয়ে দুরু দুরু করতে লাগল—পঞ্চাতে

উঠল না, বিচার সালিশে রামধন, জগু দনপাট, লেউল কর্মকারের ডাক পড়ল না। তাদের কাছে খবর গেল না। একা রমজান মাথা হয়ে ঘর বিবাদের ফয়সালা করে দিল। কি অঘটন ঘটতে চলেছে গাঁয়ে কে জানে। একটা খুনটুন যদি হয়ে যায়।

রমজান হাসে—সে কি রাস্তায় পড়ে আছে নাকি গো—খুন। মানুষের জীবনের দাম কি এতই সস্তা নাকি। মার খেলেই লোকে মার দেয়—। যে রুখে দাঁড়ায়, তার গায়ে হাত তোলার আগে সবাই চেয়ে চিন্তে দেখে। তারপর মারবার হলে মারে। চুপ করে সরে যাবার হলে সরে যায়—

জবার বর নেতাই ফিরে এসেছে বাজিয়ে। জবার জন্য কিনে এনেচে একটা নকল টাঙ্গাইলের শাড়ি। আসলটার অনেক দাম, এ জন্মে আর হলো না। বনসি এখনো ফেরেনি—একেবারে কালিপূজা বাজিয়ে সে ঘুরবে। কলকাতা থেকে তাকে যেতে হবে চন্দননগর, হালি শহর, চব্বিশ পরগনার পুরানো দিনের টাকি রাজবাড়িতে। নেতাই বলল, তা যা বলেচ ভাই। কেউ মারে কেউ মার খায়—ই যেনে দুটি জাত—নিকি বল দিনি—

আরে দুর দুর—ই কি আর জন্ম থাকতে ঠিক হয়ে থাকে নিকি। সবকিছুই কম্ম থেকে—

যেমন কাজ, তেমন সাজ— ?

এই তো। এইটি হলো আসল কথা—

আর ভাই আমাদের জীবন হলো ভিন্ন। অভাব আর মাঙার জীবন। চেয়ে মেগে চলে। বড় বেটাটি প্রতিবারই বলে, বাবু গ—ইবার, ইবছর বাজাতে যেতে হবেনি। গেলেও দুগ্‌গা পূজা বাজিয়ে লক্ষ্মী পূজার আগেই ঘুরে এস কিন্তুন। আমি বলি কেনে রে বাপ। কি খেয়াল আবার জাগল ওর মনে? সে বলে—মনে নাই বাপ উ বছর বললি—এসছে বছর আমরা ঘরে লক্ষ্মী তুলব, পূজা হবে। ঢাক বাজবে আমাদের ঘরে। তুই বছর বছর বলবি এক কথা আর করবি আরেক কাজ। ছ্যানাটির আমার সখ—এত কষ্ট করে ছাইব ঢাক আর বাজবে লোকের ঘরে। হ্যাঁ ভাই তাকে কেমন করে বুঝাই বল তো—আমাদের হলো গে অভাবের সংসার। মনের খেয়াল যে মনেই মরে যায়। টাকা না আনলে পেট চলবে কি করে। ইবারও লক্ষ্মী পূজা বাজিয়ে ঘরে এলম। ছ্যানার আমার তো মুখ হাঁড়ি। কাল সারাদিন কেটে গেল, ফিরপাই খানি বাবর শা কিনে আনু ছ্যানার তরে। সে কথা বলেনি। হ্যাঁ ভাই বলো তো—আমারও কি সাধ যায়নি ছ্যানা বউয়ের মুখে

হাসি ফুটাতে। কিন্তু কি করব বল—ই যে একেবারেই অপারক হয়ে গেলম। দেখি আসচে বার কি হয়—

রমজান বলল—তোমাদের নিজেদের তরেই তোমাদের এই দুর্দাশা। যদি না নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ তবে ই দুর্দশা আর কুনোকালেই মিটবেনি। আমি খবর লিয়ে দেখলম মুচিপাড়ায় ৮ জনের নাম গেছে জার্সি গরুর দাখিলে। পেল শুদু রামধন—গ্রাম পঞ্চায়েত বলে। বামুন কায়েতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে তাদের সঙ্গে ভোগ করচে সব। আর তোমাদের ভাগে কলা—

আরে চুম মার—চুপ মার ভাই। দেয়ালেরও কান আচে। কে কুথায় শুনবে, আর আগুন লাগাবে—

কার ভয়ে থাকতে হবে নাকি, ই কি মিথ্যা নাকি, চাইলে পরমান—

মোরগ লড়াইয়ে ছুরি খেকো মোরগের মতো রমজানের চোখের দুটি গোল আগুনের আঙরার মতো জলতে থাকে। সে দিকে তাকিয়ে থাকলে যেন শরীরে ছ্যাঁকা লাগে। ধারে পিছে কেউ নাই, থাকলে বলবে মুচিপাড়ায় আগুন ধরেচে। নেতাই বলল—কি করবি ভাই। সয়ে যা। যে সয় তার জয়। ধম্মে থাক সুখ পাবি। আর অধম্ম মানেই বজ্জাতি—

পৃথিবীতে এই দুটি নীতি চিরকালই একটি আরেকটির সঙ্গে লড়াই করেছে। একজন নরম নরম কথা বলে, পিঠ পেতে মার খায়—আরেকজন রুখে দাঁড়ায়। জীব আর জগতের এই সত্য থেকেই একদিন সম্পদের সৃষ্টি হলো, নারীর সৃষ্টি হলো। লোভের সৃষ্টি হলো। চলল দখলের লড়াই।

নেতাই মুচির ঘরের দোরগোড়ায় বুকল গাছ। বর্ষা চলে যাওয়ার পর গাছ আগাছা সরিয়ে জবা গোবর জলের নাতা দিয়েচে। সেইখানে কাঠের চৌকিতে বসে বসে দুজন কথা বলছিল।

তখন এক একটি ঘরে এক এক রকমের তরজা চলছে মুচিপাড়ায়। তার ফিরিস্তি দিতে গেলে রাত পুইয়ে সকাল হয়ে যাবে। ঝুলন এসে রেনুবালাদের ঘরে ঢুকল। টিমটিমে ডিবরি কেরোসিনের একলা আলোটি ম্লান। বলাই বসে বসে তকালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাটের দড়ি বানাচ্ছিল—সেদিনের সেই পাপ উদ্ধারের কালে বনসি আর রমজানকে তার রাম লক্ষ্মণ মনে হয়েছিল। আজ সেই বংশীর বউকে এই সন্ধ্যাকালে ঘরে ঢুকতে দেখে মনটা তার কেমন যেন ভালো হয়ে উঠল। ঝুলন বলল, রেনু কুথা গেল—

দকানে—

অমন পুয়াতি মেয়া—দকানে পাঠালে কি ভরসায়—

কি করব, যেতে খুঁজে যে—

তমাদের কোনো ব্যাপারেই কাণ্ডজ্ঞান থাকেনি কেনে। আমি বলব বলব করেও বলা হয়নি।

বনসি কবে ঘুরবে—

বলে তো গেছে কালিপুজা বাদে—ঘরের মানুষটা না থাকলে চারদিক কেমন ফঙ ফঙ করে। মন খারাপ। সন্ধ্যাবেলাটা একলা একলা কি করি—গজল্লা করতে এলম। তা—তমাদের ডোবায় কেরকম ডিমপনা ফুটল—

রামসাগরের ডিমপনা। ভারীদের কাছ থেকে দুটি ডিবা তিরিশ টাকায় কিনে ছেড়েছিলম জোষ্ঠি মাসে। আষাঢ় মাসে দেখলম ভরা ডোবায় বিজবিজায় পোকার মতো। এখন দেখি হাতের চেটো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রুই কাদলা যখন মাথা তুলে ঘুরে বেড়ায় সে দেকবার মতো—ভোরে শিশির খায় আর কি—

ধরে ধরে খুব খাচ্চ তাইলে—

উঁহু। উ কি আর খাবার মাছ—

তবে—

গোনতির দামে ইবার ছেড়ে দুব ভাবছি। দু'শ টাকা শ। ব্যাপারির সঙ্গে কথা বলে এলম লক্ষ্মীবার—

তবে আর কি, ঘরের চালে টালি ফেলে দাও। আরেকটা কোঠা ঘর তুলবে নাকি—

আরে দুর দুর। পেটে খেলেই শেষ হয়ে যাবে। ভাদ্দ মাসটায় ঘটিটা আর একটা কাঁসা থালা আনন্দপুরে চাবড়িদের ঘরে বন্দক রেখেচি। সেসব ছাড়াতে হবে। ছাগলটা মরে গেল বর্ষায়। ছাগল কিনব একটা। ঘর তুলবে তোমরা ভাই—

সেকি গঅ,—ই আবার কেমন কথা—

পুজা বাজিয়ে বনসি ঘরে ফিরবে এই এক কাঁড়ি টাকা লিয়ে। তোমার তরে ফুলেল তেল, লোতন কাপড়, মিঠাই আনবে। একগাদা টাকার সঙ্গে যোগ দাও ধানের টাকা। কাত্তিকের শেষাশেষি এসে গেল—আঘুনের মাঝামাঝি তো ধান ঘোড়া মারা হবে। পাকবে। কাটলেই টাকা। এত টাকা রাখবে কুথায়—

লনঠনের ঢিমে আলোয় দুটি মানুষের মুখ দুটি তাজা পান পাতার মতো চিক-চিকায়। যেন এইমাত্র বরোজ থেকে তুলে আনা হয়েচে। বলাইয়ের কথা শুনে

ঝুলন তো হেসেই বাঁচে না। বার বার হাসিতে দুলে দুলে উঠছে তার মুখ। বাকিটা তো আঁধারে ঢাকা। সেই হাসির সঙ্গে তাল রাখার জন্য বলাইকেও হাসতে হচ্ছিল। এক—হাসিটা সংক্রামকও বটে। দুই—কেউ হাসলে তার সঙ্গে হাসতে হয়—

এমন সময় গামছায় পুটুল পুটুল করে সওদা বেঁধে নিয়ে রেনুবালা এসে ঢুকল। ঢুকেই দেখল দুজন বসে হাসাহাসি করছে। এই ক'দিন আগে মুচি দাড়ে নাইতে গেছল বলাই। ঘরে ফিরল অনেকক্ষণ পরে। ফেরার পথে মুখ বাড়িয়ে দেখল রেনু, মাগীটার সঙ্গে গজল্লা করতে করতে আসচে। দেখে সেদিন যেমন অঙ্গ তার জলে গিয়েছিল—আজও তেমনি হলো। জালা করতে লাগল শরীর। তার কানে বাজতে লাগল ঝুলনের সেদিনকার কথাগুলি,—ঠাটের কথা: 'ঘরে আগুন লাগা কুখিনো দেখুনু—দুব নাকি লো—তোর ঘরে আগুন।' চকিতে সাপের মতো সপাৎ করে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঝুলনের ওপর। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় হাসির ছলবলা নিতে মাগীর বুকের কাপড় সরে গেছে। ঢঙ মারাতে এসেচে, মনে মনে বলল—তার চে আর কাপড়ের দরকারটা কি—না হয় সব খুলেদুলে ওলঙ্গ হয়ে বসনা। তোর বরের মাথা খা। স্যাঙাতের মাথা খা। খর মুখে বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—ই যে আকাবারে ভাবের হাসি লেগে গেছে—

জগতে পুরুষমানুষ বউয়ের ধমককে যতটা ভয় পায় আর কাউকে যদি ততটা পেত! বলাই চুপ করে গেল—যেন খিড়কির দরজা দিয়ে একদমকা হাওয়া এসে নিভিয়ে দিল জীবন্ত ডিবরি বাতিটি। রেনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুলন পরিষ্কার দেখতে পেল ভেতরের বিষ সান দেওয়া ছুরির মতো ঝলকে ঝলকে উঠছে। রসিকতা করে ঝুলন বলল, হ্যাঁ তোর বরের সঙ্গে ভাবের হাসি হেসে হেসে আমি মাথাটা চিবি চিবি খাচ্চি। খুব মিঠা রসের মাথা—একলাই খাবি। দেখলম তুই নাই—এই সুযোগে একটুন চেখে নিলম—

রসের গলায় শুধুমাত্র রসিকতার খেয়ালেই কথা ক'টি বলল ঝুলন। কিন্তু ঝুলনের সুপ্ত আগুনে যেন তা উত্তরের বাতাসের মতোই প্রলয় ঘটাল। সে বলল, তোমাকে আমার বিশাস নাই। তোর তো ভাই-দাদা জ্ঞান নাই। যাকে পাউ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লেই হলো। আমি অত সহজে ছাড়বনি। ই গাঁয়ের লুতন লোক রমজান লয়, যে বন্ধু বন্ধু বলে অসব্য করবি। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দুব।

বলাই বলে উঠে—কি ক্ষেপে গেলি নিকি। মাথায় রাগ চড়লেই চাঁড়াল।

ঝুলন চুপ—সত্যি সত্যি একটু আগে দমকা বাতাস এসে নিভিয়ে দিয়ে

গেছে ডিবরি বাতি। ভুবনময় অন্ধ আঁধার। কোনোকিছু দেখা যায় না। বোঝা যায় না। শুধু সহবাসে অতৃপ্ত রাতপাখির মতোই কর্কশ শব্দ তীক্ষ্ণ কোনো ধারালো ব্লেডের মতো নরম রাতের বুকে নির্মম দাগ টেনে দিল—মাগী মান-সম্মান যদি থাকে এ ঘরের চৌকাঠ পারাবি তুই। তোর বরের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ু—

অন্ধকারে মুহূর্তে কেঁপে উঠল ঝুলন, কিন্তু জনপ্রাণীহীন আঁধার ভেদ করে তা কারো চোখে পড়ল না। ধীর পায়ে উঠে এল বনসি চামারের ঘর থেকে। এতই নিঃশব্দে সেই চলে আসা যেন বনসি আর রেনুও টের পায়নি। আনন্দ করতে গিয়ে ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে একা একা ঘরে ফিরে এল ঝুলন। উঠনের মাটিতে ধপ করে বসে পড়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—এ পাড়ায় ঘাটের মড়ার চুলের মতো ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ উঠেছে—এক্ষুণি তলিয়ে যাবে গহীন আঁধারে।

উঠনে একা ভূতের মতো ঝুম হয়ে বসে থাকে ঝুলন। মনে হয় যেন একটি রাত নয়—অনন্ত সময়ের মাঝে সে একা পড়ে গেছে। দুচোখে শুধুই আঁধার, যেন দুচোখ খোলা না রেখে বন্ধ রাখলেও এই একই জীবন। দিকদিশাহীন, চিহ্নহীন জীবন। বসে বসেই চোখ বন্ধ করল ঝুলন, সে টের পেল চোখ বেয়ে জল নামছে।

চোখের সামনে থেকে মাঠের পর মাঠ সরে যায়। নীল আকাশ নেমে আসে মাটিতে। দুঃখ দুর্দশা সব চলে গেছে। এক একটি পাকার ঘর উঠছে মুচি পাড়ায়। শীতের ফসল আলু, লঙ্কা, কুমড়ো ফলেছে মাঠে। ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়, মানুষের মুখেচোখে সুখ উপচে পড়চে—তারই মাঝে পেট হয়েছে ঝুলনের। বুক, মুখ, তলপেট ভারী। শুধু রমজান কেন যে পিছন দিকে সরে যায়। মাঠ ঘাট, পথবিপথ বনজংলা ফেলে সে শুধু সরেই যায়। মেঘের মতো সরে যায়; হাওয়ার মতো সরে যায়, নদীর মতো সরে যায়। লাল নীল সবুজ রঙ ধরেচে গুড়েবাগানে—ঝুলন দুহাত ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চায় সেই রঙ, সেই গাছ, সেই অনন্তকে। এমন সময় কে এসে পিঠে হাত রাখল—

ঘুমের ভেতরে চমকে উঠল ঝুলন। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সেই মুচিপাড়াটি, ছোট জাতের জীবন। ঝুলন বলে উঠল, কে—

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল—বসে থাকতে থাকতে কখন মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল সে, চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল। খালি ভুঁইঞে তার শরীর—চোখ থেকে জল ঢালা হয়ে ভিজে আছে উঠনের এক চিমটে মাটি। বৃদ্ধ গুইরাম বহুদিনের পুরানো বাপের মতো ঠাণ্ডা হাতটি গায়ে রেখে বলল—হ্যাঁ বৌ—খালি ভুঁঞে কিছু না পেতে এমন করে ঘুমাতে আছে,—ঠাণ্ডা কাল। কত রকমের

জর হতে পারে—মালেরি, পিলেজর, কালজর—যা দিনি ঘরের ভিদরে গিয়ে মাদুরি পেতে শুবে যাও। জামে ঢাকা ভাত—পিঁয়াজ কামড়ে খেয়ে লে না মা—

ঝুলন নিজে ভাত খেল, শ্বশুরকে বেড়ে দিল। একটু একটু শীত লাগছে গায়, বুঝি হিমের কলকলানির দিন এসে গেল। ভেতরের ঘরে গিয়ে কাঁথা জাঁকা দিয়ে গুইরাম শুয়ে গেল। দুয়ারে মাদুরে শরীর ঢেলে শুয়ে পড়ল ঝুলন।

নেতাইয়ের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা হলো—রমজান পিঠ পেতে মার খাওয়ার লোক নয়। সে শুধু বড়ো বড়ো কথা বলেই গেল। মাঝে মাঝে রেডিও শুনল। জবা পাড়ার কোনো সাথীর সঙ্গে ভিডিও দেখতে গেছল। হাসতে হাসতে ফিরে এল। তখন উত্তর আকাশে সাতটি তারার খেলা। রমজান উঠে এসে নিজের দরমা দেওয়ালে ঘরটির দাওয়ায় বসল। ওবেলা ভাতে ভাত ফুটিয়ে ছিল, তারই খানিকটা আর একটা সেদ্ধ আলু হাঁড়িতে আছে। পিঁপড়ে লাগল, নাকি বিড়ালে মেরে দিল—উঠে গিয়ে আর সেসব দেখতে ইচ্ছে করল না তার। দাওয়ায় বসে বসে শ্যামল মিত্রের গান গাইল সে কিছুক্ষণ।

মনরে—এ-এ-এ

সাগরে মিশিলে নদীর মরন নাহি হয়

আবার সেই সাগর থিকাই হয় রে বন্ধু

মেঘারই উদয়—

মনরে তুই মুক্ষু বড়, তুয়ার বিসার কেমন

তর—

গাইতে গাইতে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়ল রমজান। আলো জ্বলেনি ঘরে—সুতরাং নেভানোর কথাই ওঠে না। অন্ধকারের পিঠে হামাগুড়ি দেয় ইঁদুর। চিঁ চিঁ করে ছুটে যায়। আরশোলা ফরফর করে, আবার থেমে যায়। জালাগোড়ার দিক থেকে রাতপাখির ডাক ভেসে আসে। শুধু ঝুলনের মুখ ভেসে ওঠে, আর ভেঙে যায়। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখে ঘুম এসে যায়। হঠাৎ কার ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে রমজান। কে—

আমি ভাই—আমি নেতাই

কি হল? এত রাতে—

আর ভাই বউটা ভাত খেয়ে শুল। হঠাৎ কেমন করচে ভালোমানুষটা। একবার ডাক্তারকে—। আমি ডাকলে কি আর এসবে—এই রাতে মুচনে ঠ্যালন। রাগ কোরনি ভাই। একবারটি এস না বাইরে—

মুহূর্ত দেরী না করে রমজান দরজা খুলে দেখে কাঁচুমাচু মুখে একটা লণ্ঠন হাতে নিতাই দাঁড়িয়ে। চাঁদ ডুবে গেছে প্রথম রাতেই। চারদিকে কুজ্ঝটি অন্ধকার। বাইরে থেকে দরজার শেকল তুলে দিয়ে রমজান বলল, চল—এই বলে দাওয়া থেকে মাটিতে নেমে এল।

কিন্তু নেতাইয়ের ঘেরগোড়ায় কাছে এসে সে দেখতে পেল বউয়ের অসুখের খবর মিথ্যা। বুকল গাছের তলায় তিনটে লোক দাঁড়িয়ে। দেখে চিনতে পারল একজনকে—সে রামধন। রমজান নেতাইকে বলল, কি রে নেতাই? নেতাই কোনো জবাব না দিয়ে লণ্ঠন হাতে ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। রমজান পড়ে রইল আলোহীন আঁধারে—তিনটে প্রায় অচেনা লোকের মাঝে। তারা রমজানের হাত ধরে টানতে লাগল। রমজান বলল—কি ভেবেচ কি? কোনো জবাব না দিয়ে তিনজনে জাপটে ধরে লোকটাকে নিয়ে চলল কোথাও। শুধু ধস্তাধস্তি আর রমজানের কাটা কাটা কথা মুচি পাড়ার হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে গেল—

গাঁয়ের দশ মাথা মাঝে মাঝেই এক হয়ে যেন রাবণের হুঙ্কার ছাড়ে। হতে পারে এটি তাদের বহুকালের বদ অভ্যেস, পৃথিবী পাল্টালেও তারা ছাড়তে পারেনি। লেউল কর্মকার তার লৌহতপ্ত তামাটে মুখটি নিয়ে আলোর সামনে এল। হ্যারিকেন জ্বলছে—সে আলোয় এক একটি মানুষের মুখ এক এক রকম। লেউল বলল, হ্যাঁরে এমন কাজটা করতে আছে। কে এই বুদ্ধি দিল তোদের। সেই যখন করলি লোকটাকে আধমরা করে বাঁচিয়ে না রেখে একেবারে মেরে ফেল—আপদ চুকে যায়। এখন কি হলো বল তো—লোক জানাজানি হলো। তুই হলি গ্রাম পঞ্চায়েত। তোর সম্বন্ধে সবাই ভাবচে কি—ছ্যা ছ্যা করচে।

ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল—তবে আর কেনে বলেচে মুখ্যু। এদের জন্যই তো এই অরাজকের শাসন—

রামধন তক্তাপোষের এক প্রান্তে চুপ করে বসে আছে। এবারও বেন্দাবন ঘোষের দলিজে সভা বসেচে। ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সুধা সর্দার এসেচে। সে বলল, শুনবি তরা তবে শুন উ কেমন মুখ্যু। তখনও গ্রাম পঞ্চায়েত হয়নি। আমার বড় বেটা সরোজ—কো-অডিনেশন কমিটি করে। প্রথম সেই ফ্রণ্টের পাঁচ বছর কেটেচে। সরকার নিয়ম করেচে কিছু কিছু লোককে হর গাঁয়ে ডাক্তারি শিক্ষা দেয়া হবে। এক একটি গাঁয়ের এক একটি লোক দাক্তরখানার

মাঠে লাইন দে দাঁড়িয়েচে। দাক্তর প্রথমে তাদেরকে শিকাবে কি করে ইনজিকসন ফুঁড়তে হয়। হাতে সিরিঞ্জ—দাক্তর ডিসটিল ওয়াটার দিয়ে এক এক জনের হাতে ফুঁড়ে ফুঁড়ে শিক্ষা দিচ্চে। এমন সময় একটি মেয়েমানুষের পালা এল। তার ভাই পেট হয়েচে। ভরা পেট লে সে বলল, দাক্তর দা আমি কিন্তু প্রেরেগনেন্ট। সেই কথা শুনে দাক্তর বলল—আচ্চা। তাহলে তমাকে ইনজিকসান দুবনি। তুমি বাছা ওই চেয়ারটিতে বস। এই বলে সামনে দাঁড় করানো তিন চারটি চেয়ারের মধ্যে একটিকে দেখিয়ে দিল। তো ওই মেয়েটির পরেই ছিল একটি পুরুষ মানুষ। সে দেখল প্রেরেগনেন্ট বলতেই দাক্তর মেয়েমানুষটিকে ছেড়ে দিল, সুই ফুঁড়লনি, বরং চেয়ারে বসতে বলল। অনেক বুদ্ধি করে লোকটি বলল—দাক্তর দা, আমিও যে দাদা প্রেরেগনেন্ট। লাইনে দাঁড়িয়েছিল যারা—তাদের মধ্যিখানে যারা আবার ইংরাজিটির মানে জানে তারা তো হো হো করে হেসে উঠে। দাক্তর লোকটি কেশপুর হেলথ সেন্টর থেকে এসেচেন। মুখ্যুর কথায় তারও হাসি পেল। কিন্তু সে হাসির শব্দ নাই। বললেন, প্রেগন্যান্ট হও আর যাই হও হাতটা দাও ইনজেকসন দিই—। সেই লোকটিই ওই মুখ্যু রামধন। শালা প্রধান হইচে—এই লোককে যদি চেয়ারে বসাও তবে সে এই কাণ্ড করবেনি তো করবে কে—

সভাসুদ্ধো সব লোকজন গল্পটি শুনে হো হো করে হেসে উঠল। ইচ্ছে করে কেউ বেশিক্ষণ ধরে হেসে হেসে মুচির ওপর জমে থাকা বহুকালের ঝাল ঝাড়ল। মুখ্যু, গোমুখ্যু, সাতমুখ্যু—আরো কত রকমের কথা বলল কেউ কেউ। বেন্দাবন ঘোষ বলল, কত করে বলি—রুইদাসের পো আমাদের কথা শুন, শুনে চল। তোরও লাভ হবে—আমাদেরও হবে। তা তো শুনবিনি মগজে কিছু থাকলে তো। শালা মুচির বেটা মুচি। আমরা ভাবলম আমাদের হাতের লোক, ওই প্রধান হোক। কিন্তু লে এখন সামলা—এক একটা ঘটনা ঘটাবি তাকে সামাল দিতে নাকের জলে চোখের জলে। এই বলে বেন্দাবন জণ্ড দনপাটের বাপ উমেশ দনপাটকে বলে—সেই শেতলা পূজার রাতে উর দাদা মদে একেবারে টোর হয়ে আছে। ছোট জাত যাবে কুথায় বলঅ। এই জন্যই তো বলেচে টেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বর গোপাল দাস বৈষ্ণব বামুনের ঘরের পাশে থাকে। জাতে নাপিত। তবে এখন ভোটে জিতে চুল কাটার ব্যবসায় জলাঞ্জলি দিয়েছে। সবাইকে লক্ষ্য করে সে বলল—উ মুখ্যুর আর জ্ঞান হবে! সুধাদা তো বললে

একটা গল্প। এবার আমি বলি শুন। একসঙ্গে তো কাজ করি তাই আমি জানি হাজারটা। তার একটা শুনলেই বুঝবে তোমাদের পঞ্চায়েত পধান কেমন—

ভোট হলো—যারা সব গাঁ পঞ্চায়েতে জিতল, সেইসব মেম্বরদের লিয়ে মিটিন। পঞ্চাত সমিতি, জেলা পরিষদের লোকেরা অতিথি হয়ে এসেচেন। তাদের সাক্ষাতে, সামনে মেম্বরদের ভিদরে প্রধান নির্বাচন হবে। কুন দিক থেকে কি হলো কে জানে, লখা মারিক বলল—আমি প্রধান হিসাবে রামধন রিশির নাম পস্তাব করচি। মোড়ল পাড়ার তিনু মণ্ডল বলল, আমি সমর্থন করচি। আগে থাকতে অদের সেট ছিল কিনা কে জানে। রামধনই প্রধান হয়ে গেল। ইবার মিটিনের কথা সব একটা খাতায় লেখা হলো। লিখল সূর্য মিদ্দা। তারপর সভা শেষ। এজেণ্ডা খাতায় সই করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতির জগুদা বলল, এই নাও ভাই রামধন, পেনটা লে ওই খাতায় একটা সই দাও। এতোকাল তো এজি কমিটির মেম্বর ছিলে—এবার হলে গ্রাম প্রধান। তোমার অনেক দায়িত্ব। দেখে বুঝে চলতে হবে ভাই। রামধন তো হাসিমুখে গদগদ হয়ে পেনটি লে খাতায় সই দিতে গেল। বাংলায় নামটা লিখতে শিখেচে, লিখলও। কিন্তু তারপর গো-মুখ্যুটা কি বললে জানো—সে মুখে চোখে চিন্তার ছায়া ফুটিয়ে বলল—হ্যাঁ গঅ জগুদা, সই তো করলম, কিন্তুন আমি যে সিগনেচারটা আনতেই ভুলে গেছি। ঘরে বাক্সে রয়ে গেচে। শুনে তো ঘরসুদ্ধ লোক হেসে বাঁচেনি। শালা ভেবেছে সিগনেচার মানে ইস্ট্যাম্প—সেই রবারের ছাপখানি। সেদিনই আমরা বুঝেছিলেম, ই কাকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে—

রামধন কালো জোঁকের মতো চুপ হয়ে পড়ে আছে। এক ঘর লোকজন। গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বর জনাকয়েক আছে, তা বাদে সবাই মধ্যবিত্ত বাবুঘরের লোক। উপায় বুঝে যারা সি পি এম হয়ে গেছে, তারা এতক্ষণ এই ঘুরঘুরা পোকার মতো মুচি লোকটার ঘুরঘুরানির গল্প করছিল। আর হাসছিল। নবা ঘোষ বলল—আমরা তো জানি আমাদের কাছে এসতেই হবে। চেয়ারে বসালম তো আমরাই সবাই মিলে। গরু চুরির ফয়সালা হবার দিন বললম—ওরে রামধন ওই লুতন মুচিটাকে আমাদের হাতে তুলে দে। আমরা কামারশালের হাফরে ফেলে ফাল পাজানোর মতো পাজি দিই। তারপর বাপ বাপ বলে ই দেশ ছেড়ে আবার বিদেশ পালাতে বাধ্য হবে। মারের নাম বাবাজী—এই ওষুধে সব রোগই সারে। বোকা-চোদা শুনল কি সেদিনের কথা। আর, একটা গ্রাম প্রধান হয়ে রাতের বেলা তাকে ঘর থেকে তুলে এনে খুন করতে গেল। ধরল গাঁয়ের লোকজনেরা—ছ্য ছ্য। হ্যাঁ রে

রামধন—গোমাংস খেয়ে খেয়ে মাথাটায় কি তোর একেবারেই গোবর বুজাই হয়ে আছে! একটুনও ঘি নাই! এই বুদ্ধি তোর মাথায় নাই যে লোকে তোর হাতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দিয়েচে। তুই যদি এরকম কেলোর কীর্তি করবি তবে আমরা হাজার চেষ্টা করলে কি হবে, তোকে কে বাঁচাবে রে গাধা। সরকার বলচে—তোদের মতো ছোটলোকদের জীবনের সংস্কার করা হবে। যারা নিজেরাই গুয়ে-মুতে থাকতে জন্মেচে তাদের ভালো কে করবে রে মুখ্যু। তারপর জাসি গাই লিয়ে, ধানের বীজ অনুদান থেকে পেয়ে যে কাণ্ডটা ঘটালি—তোকে আমার থাবড়াতে ইচ্ছে করচে। গালের পাটা লাল করে দিলে তবে গে রাগ মিটবে। ওরে গো মুখ্যু তোর হার মানে যে আমাদের সবার হার রে গাধা।

সান্ধ্য মজলিস বা সভা না বলে আজকের এই জমায়েতটাকে একটা গোপন বৈঠক বলা যেতে পারে। পার্টির ক্লাশ মাঝে মাঝে গোপন বৈঠক করে হয়। তখন সেখানে উটকো লোকের প্রবেশ নিষেধ থাকে। কিন্তু এই গ্রামীন রাজনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে অলিখিতভাবে পরিচালিত করে কিছু লোক। তাদের আদেশ উপদেশেই সব কিছু চলে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির লোক নয়, তারা শুধু মদতদার। বিপাকে পড়ে অশিক্ষিত উজবুক রামধন আজ এসেছে এদের কাছে। যা হবার হয়ে গেছে, এবার ক্ষেমাঘেন্না করে একটা মুসকিল আসান করা দরকার। সুতরাং যে যাই বলুক সবই তাকে সইতে হবে। বলির পাঁঠার মতো একদিকে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল রামধন—কি করবে না করবে সে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না। বুঝি কৃত কাজের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল। এদের হাতে পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর নাই। কাহার, কামার, মাজি, বাগদী, মুচি—এইসব মেম্বার! তাদের থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল রামধনকে। তার মধ্যেও ভিলেজ পলিটিক্স ছিল। সেই পলিটিক্সের গেঁড়াকলে তুমি যদি ঠিক ঠিক তেল ঢালতে পারলে তো হলো, নইলে গেল তোমার রাজ্য, রাজত্ব। আর গ্রুপের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে মেম্বারদের যে নিজের কব্জায় আনবে কেউ, তারও উপায় থাকে না। কেননা ছোট জাতের ওই গরীব হাভাতে মেম্বারগুলি মধ্যবিত্ত বাবু-সম্প্রদায়েরই কারো না কারো পেটোয়া লোক। সুতরাং এই বহুবিধ চরিত্রের লোকগুলিকে কোনো একটি জায়গায় সরকারি নীতি-প্রকৃতি সম্মিলিত করল বটে। কিন্তু একযোগে কোনো একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এরা দেখাতে পারল না। তাই দশজন মেম্বারের এই গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটি দশটি ঘরের বউয়ের মতোই একসঙ্গে বসে শুধু বাজে কথা আলোচনা করে। যেন প্রত্যেকেরই আলাদা

আলাদা একটি স্বামী আছে। বাজে কথার আসরে তাই অনুপস্থিত দশটি স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাদ-বিবাদ চলে। এরই নাম মিটিন। তবে হ্যাঁ, এই কয়েকবছরে শিক্ষা সংস্কৃতি, সামাজিক ব্যবস্থা-অব্যবস্থায় সংস্কারের নামে এদের দেখানো হয়েছে অনেক কিছু। এরা শুধু শিখেছে একজন আরেকজনকে কমরেট বলে ডাকতে।

লেউল কর্মকার বলল, কি হে কমরেট চুপ মেরে থাকলে হবে? তমাকে লিয়েই আজকের আলাপন। আর তুমি যদি ঝুম মেরে থাকো তো চলবে কেমন করে? দাও—জবাব দাও দু-একটা কথায়—

এই কথায়, নিচু করে রাখা মুখটি তুলে রামধন একবার সবার দিকে তাকাল। বলল, কি জবাব দিব আমি। যা করেচি সবই তো আপনাদের কথা মতোই করেচি। আমার নিজের ইচ্ছায় কোন কাজটা করেচি বলুন—

এইবার চরণ মাজি মুখ খুলল। সে চড়কডাঙা থেকে এসেছে। বলল, করনি—আমরা কিছুই জানিনি ভাব নিকি। কথা ছেল সাতটা গাঁয়ে যে সাতটা টিউপওয়েল হবে—প্রেতিকটি ৩০০ ফুট নল যাবে গহীনে। দেখিয়েচ তাই, টাকাও লিয়েচ সেই মতো, অথচ করেচ ১৫০ ফুট আর ঠিকাদারদের লিয়ে লিখিয়ে লিয়েচ ৩০০ ফুটের ফিরিস্তি। এক বুঝতম এই টাকা দিয়ে তুমি কুনো ভালো কাজ করেচ—সে কথা বলতে পারবেনি। তাহলে আর কি থাকে—এত টাকা লয়ছয় করে তুমি পেট-পূজায় লাগিয়েছ—

এই কথা পড়তে পায় না। সনাতন দোলই বলে ওঠে, সত্যি তো—ই কি তমার বাপত্তি সম্পত্তি নিকি, সবার সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র করে তবেই কাজ করা উচিত ছিল। উপস্থিত সকলে বুঝল ষড়যন্ত্র অর্থে সনা দোলই আলোচনা বোঝাতে চাইচে। গুরু কথা আলোচনা হচ্ছে তাই লঘু রসে কেউ হাসাহাসি করল না। আবার বলল সনা—সবাই মিলে একটা ডিসন নেওয়া উচিত ছিল।

নবা ঘোষ বলল, সবাই মিলে ডিসিসন নেবে এই জন্যই তো কমিটি। শালা চোর—

চরণ মাজি আবার বলল, মনে কোরনি আমরা কিছু জানিনি। ভাবতম ধম্মের কল একদিন বাতাসে লড়বে। কিন্তু অপেক্ষা করে করে সে অপেক্ষা যেনে আর ফুরায়নি। আজ কথা উঠেচে তাই কথা—ই-কি আর একটা! একের পর এক এইসব দুর্নীতি ঘটিয়েচ তুমি। এই যদি বলি রিলিফের সড়ক রাস্তার কথা। মাট কাটিয়েচ রাস্তা ভরিত করিয়েচ, খাতায় কলমে দেখিয়েচ মজুরদের কুড়িটাকা আর ১ কেজি গম দিয়েচ। সত্যি সত্যি তো আর তা তুমি করনি। দিয়েচ ১৫টি করে টাকা

আর আধ কেজি গম। ছ' মাসের কাজ—তারপর মুরাম পড়ল রাস্তায়, কথা ছিল রাস্তার দুধার কর্কচ-ঘুস্থম-পাথর দিয়ে বাঁধাই হবে, হয়েচে সেসব ? একবার মিটিনে কথা উঠেছিল—তুমি বলেছিলে বাড়তা টাকায় দেশের উন্নতি হবে। কি উন্নতি করেচ বল। চুপ থেকনি। জবাব দাও। আজ তোমাকে জবাব দিতে হবে—দেকি দাও তুমি কেমন কমরেট। আর আমি যদি পেঁদা কথা বলি তবে এত গুলান লোকের মাঝখানে জুতিয়ে আমার মুখ ছিঁড়ে দাও।

রামধন কোনো কথা বলে না। কি বলবে, কি বলার আছে তার। আজ এই যে এত কথা উঠছে, এর সবই তো জগু দনপাট, অমিয় মিত্তির এদের কথা মতোই তাকে করতে হয়েচে। আজ তাদিরই লেলিয়ে দেওয়া কুত্তা মিটিনে গলা তুলে চেঁচায়। কোনো কথা বলতে গেলেই তারা এসে ছিঁড়ে খাবে। তার চে মিথ্যা দোষগুলি ঘাড়ে তুলে চুপচাপ বসে থাক। অরা বাপ মা, গুষ্টিগুত্তোর উদ্ধার করুক, শুধু সহ্য করে যাও। অন্যায় যদি হয়ে থাকে সেকি তার একার হয়েচে নাকি। লাভের গুড় সবাই মিলে ভাগ করে খায়নি ? এখন যত দোষ নন্দ ঘোষ—

লেউল কর্মকার বলল, কি হলো, জবাব দাও হে—আমরা কি তোর পঁদে ঝাল লাগাতে এসেচি নিকি এখনে। তোর গাঁয়ে জনা সাতের নামে জার্সি গাই অ্যালোট হলো, কেনে একটি মাত্র জোড়া তোর ঘরে ঢুকল। বাকি ছ' জড়া গেল কুথায়। ই কি পুকুরের জল নিকি হে, যে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে গেল—

সনা বলল—আমরা আপিসে গে অ্যাকরমেণ্ট খতিয়ে দেখেচি—সাত জনার নামেই টাকা জমা পড়েচে—

উপস্থিত সকলে বুঝল সনা দোলই এই অ্যাকরমেণ্ট অর্থে এগ্রিমেণ্টকে বোঝাতে চাইচে। লোকটার সব ভালো—ওই একটাই দোষের। কথায় কথায় ইংরাজি ঝাড়ে। আগে এ-রকমটা ছিল না। কিছুদিন পার্টি সমাবেশে ট্রেনে চেপে কলকাতা গেছে, ব্যস তারপর থেকেই এই উপস্বর্গ—ফুলপ্যাণ্ট পরবে আর কথার মাঝে ইংলিশ ঝাড়বে। ওর বউ লক্ষ্মীমণি বলে—লোতন কাগ গু খেতে শিকেচে, খেতে দাও। যাক সে কথা। সেই সনা আবার বলল, দাও হে বাপ রামধন এবার একটা কমপ্লেনলোশন দাও। এবার সবাই হেসে উঠল, নবা ঘোষ সেই হাসি থামিয়ে বলল—হ্যাঁ কমপেনসেশন, মানে ক্ষতিপূরণ। জরিমানা—

বেন্দাবন ঘোষ বলল—হ্যাঁ রে রামা—সত্যি তো অদের কি দোষ, অরা ত বলবেই। তুই যে একটা অযোগ্য সেটা সবদিক থেকেই বোঝা গেছে। এখন নাকি তোদের ঘরে ঘরে লড়াই দাঙ্গা বাঁধলেও তোকে কেউ আর ডাকেনি। ডাকে

সেই লোতন মুচিকে। আমরা তো চাই তোদের একটা ভালো হোক। ছোট জাত—আর কতকাল ছোট থাকবি। এই ভেবেই না তকেই প্রধান করা। উ বেচারিরা আর কি করবে—আক্ষেপের কথা বলচে এখন। তুই বা এমনটা করতে গেলি কি মনে করে। দেখ বাবা—পাপ কুনোদিন বাঁচেনি, সয়নি। ই কি এমন মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে যেত যদি ভাইয়ের মতন সবাই মিলমিশ খেয়ে কাজ করতিস। আজ অরা তোর বিরুদ্ধে কথা বলচে—চিরটাকাল তো আর তোদের শত্রুতা তা তো লয়। বল দিকি। সুযোগ মানুষ জীবনে একটা পায়। বার বার কি আর সুযোগ আসে জীবনে। বুঝদার পাঁচজনে মিলে কত ভেবেই না তোর হাতে তুলে দিয়েছিল দায়িত্ব। তাদের বিশ্বাস ভালোবাসার কি দামটা তুই দিলি বল। কি নামটা রাখলি তাদের। রাতের বেলা খুন করবি বলে যে লোকটাকে, ভালোমানুষটাকে ঘর থেকে ছল করে ডেকে এনে আধমরা করে ঘাটকুলে ফেলে দিলি, গাঁয়ের লোকেরা তাকে হাসপাতালে দিয়ে এল। দলকে দল দেখতে গেল। শুনলম এম এল এ রামকিস্টবাবু নাকি কাল বিকালে দেখতে গেইল। তুহীনবাবুও দুবার না তিনবার গেছেন এসচেন এই এক সপ্তাহে। ইটা তুই কি করলি বাপ। নিজের পায়ে কুড়ালটি তো বাপ নিজেই মেরে রাখলে। আজ এত কথা শুনে নিশ্চয় গায়ে জালা ধরচে, যখন বলতম ওরে ভাই রামচন্দ্র ইটা কর, সেটা কর—তোর ভালো হবে। কে শুনে কার কথা। সেবার যখন খাঁদা জমাদারের মেয়াটার সঙ্গে গুনা বামুনের বেটাটা ধরা পড়ল খড় গাদায়, তখন পই পই করে বললাম—ভাই রামচন্দ্র, মাগীটার সঙ্গে ছোঁড়াটার বিয়ে দিয়ে দাও। তবু লোকে বলবে একটা ভালো কাজ করল মুচিপাড়ার রামবাবু। সেকি শুনলে, তাদের জরিমানা করে খালাস করে দিলে। খড় গাদায় চলত এখন চলে ঘরের ভিদরে। এখন বসে বসে কাঁদলে কি হবে। চোখের জলে কি আর পাপ ধোয়া যায় নাকি—

একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল এই রামধন। হালকা হ্যারিকেনের ঢিমে আলোয় বুঝি স্পষ্টাস্পষ্টি দেখা যাচ্ছিল না। কে একজন সামনের থেকে তিন সেলি টর্চ মারল একেবারে মুখে—দেখা গেল বেচারার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে নামছে। সবাই ভাবল পাপ করে সেই অনুশোচনায় বুঝি রামধন কাঁদছে। ভয়ে, ক্ষমা পাওয়ার জন্য, সহানুভূতি ভিক্ষা করে। আসলে শুধু রামধনই জানে লজ্জায় ভয়ে অনুশোচনায় নয়, তার চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে আসচে অসহায়তায়। আর কতকাল তাদের মতো ছোট জাতের লোকজনদের অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে ! গাছে সবাই মিলে তুলে দিয়ে নিচ থেকে এরা মই কেড়ে নেয়। তারপর

নিচ থেকে হাততালি দিয়ে বলে—গাধা। অথচ গাছে না উঠতে চাইলে এরাই আবার সবাই মিলে মাটিতে পিসে মেরে ফেলবে। তারপর বলবে—আহা!

আমার ঘরের চৌকাঠ পেরুলে তর বরের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়—রেনুবালার সেই কথাটি সেদিন সন্ধ্যায় ঝুলনের বুকে যেন শেল বিঁধেছিল। কিন্তু নিয়তির কি নিয়ত পরিহাস—একটা রাতও কাটল না, আগ বাড়িয়ে ঝুলনকে আবার যেতে হলো রেনুবালার ভিটায়। একলা মানুষটা বাজাতে গেছে কোন বিজন-বিভূমে—দুগ্‌গা নাম জপতে জপতে দিন কয়েকের তরে বিদায় দিয়েছিল ঝুলন। সেদিন সন্ধ্যায় এমন ল্যাখরা ঝগড়ার পর মন খারাপ লাগছিল খুব—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল জান থাকতে আর ও-ভিটার ত্রি-সীমানা মাড়াবে না সে। মাগীর এতো ছোট মন, ও লো সুখের সত্বি তোর বর বলাই যে আমার ভাইয়ের মতন লো। আমার একটা ভাই থাকলে যে আজ সে তোর বরের মতো বড়ো হয়ে উঠত। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঝুলন, এমন সময় লোকটার গলার স্বর কানে এল। এই আওয়াজটি তো তার চেনা, বড়ো জানাশুনা লোকের গলা। ধড়ফড় করে উঠতেই ধস্তাধস্তির শব্দ পেল যেন। উঠে এসে ডোবার ধারে দাঁড়াতেই দেখতে পেল ডোবার ওধারে নেতাই মুচির বুকল গাছের তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তায় চারজন ষণ্ডামতো গুণ্ডা, লোকটাকে জাপটে ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর অতবড় লোকটা সেই জাপটাজাপটি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়েমানুষের বুদ্ধি—এসব দেখে কি করা উচিৎ না উচিৎ তা বুঝি মাথায় খেলল না। জীবনভর যারা শুধু কাঁদতেই শিখেচে তাদেরই একজন ঝুলন—এই কুঁদোকুঁদি দেখে 'ওমা গো'—বলে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।

বুড়োমানুষ গুইরামের রাতে ঘুম হয় না—সে শুধু বিছানায় শুয়ে উসখুস করে। বেটার বউয়ের এই ভয়ার্ত গলাটি শুনতে পেয়ে সে দৌড়ে বেরিয়ে এল। বলল, কি হলো গঅ? ঝুলন শুধু আঙুলটি বাড়িয়ে দেখাল—ওই। পৃথিবীর যত অন্ধকার যেন এই মুচিপাড়ার আনাচে কানাচে ছেয়ে আছে। তবু সেই জমজমাট ঝুঝকা আধার জগৎকে একেবারে অন্ধ করে দিতে পারেনি। টানতে টানতে ওরা এতক্ষণে অনেক দূর নিয়ে গেছে। ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে এই নিচু পল্লীর গুইরাম যেন দেখতে পেল, বুঝতে পারল লোকগুলো কাউকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গুইরাম বলল—কে—কাকে—

ঝুলন বলল, বন্ধু—রমজান

ডাক বৌ ডাক, ঘরে ঘরে জাগিয়ে দে লোকদের। তার আগেই ছেনাটাকে না আবার মেরে দেয়। এই বলে বুড়ো চলল উত্তরে, ঘরে ঘরে জাগল লোক। ঝুলন প্রথমেই ছুটল বলাইকে ডাকতে। দুটি হাঁক দিতেই বেরিয়ে এল বলাই। ঘুমন্ত রেনুবালা ন্যাংটাপাঙটা হয়ে উঠে এল—ওমা কি হলো—কি হলো গ? রেনুবালাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঝুলন। লোকটাকে ধরে লে যায়—তাই তো আসা। না তো কে আসে এই বে-জ্ঞান ভিটায়।

বনসি ফিরে এসেছে বাজিয়ে, রমজানও হাসপাতাল ঘুরে এল—এখন ভালো আছে। এমন রক্তপাত থেকে উঠল—ডাক্তার মাগুর মাছের ঝোল খেতে বলেছে। চৌদিকে মাঠ ঘাটের জল শুকিয়েছে, এখন আঘুন মাস শেষ। নীল রঙের ধানের ফুল ঝরে গিয়ে দুধ লাগল পেটে, পরে তা আবার চালের রূপ পেল। ধানের গায়ে লাগল সোনায় ধোয়া জল। আর পুরোপুরি শীত এসেছে গাঁয়ে—জল শুধু জালাগোড়ায়। সেই জলে কাদায় ঘাঁটাঘাঁটি করে রোজ দুপুরে মাগুর মাছ ধরতে জালাগোড়ায় যায় ঝুলন। কিন্তু মাছ কি তার জন্য ডাঙায় উঠে এসে হরিঠাকুরের মতো বসে থাকে!

জবার সঙ্গে দেখা হলো। সে কথা বলতে এলেই ছ্যা ছ্যা করে ঝুলন। ঘর শত্রু বিভীষণ। যে লোকটা আমাদের সবার তরে করে, তাকে কি বলে তুই ভুলিয়ে ভালিয়ে গুণ্ডাগুলার হাতে তুলে দিলি—

জবা বলল—ওলো, আগে শুনবি ত—

কি শুনব—কি শুনাবি তুই—

অরা আগে থাকতে হুঁসার করে দিয়েছিল, বলেছিল—যেদি না কথা শুনু নেতাই ই পাড়ায় বউ ছ্যানা লিয়ে ঘর করতে হবেনি তোকে। জলে থেকে কুমিরের সনে লড়াই দিয়ে পারবি থাকতে! আম্মো ত বলছিনু—লোকটা কত বিশ্বাস করে তোমার সনে কত রাত পর্যন্ত গল্প করল, আর তুমি কিনা সেই বিশ্বাসের এই দাম দিলে!

হঠাৎই পাড়ার মধ্যে যেন একটা পরিবর্তনের ঢেউ এল। লোকজন অন্যরকম হয়ে গেল। রামধনকেও কেমন যেন বিষণ্ণ বিষণ্ণ লাগে। সে দাপট যেন ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। যেন জলন্ত কয়লা চোখের সামনে জেলে রাখলে ক্ষণে ক্ষণে যেমন তার প্রভা হারায় তেমনি। লোকের মুখের সামনে এসে দাঁড়ালে লোকে হেসে কথা বলে হয়ত, কিন্তু ভেতরের মধু কাজ করে না, বরং প্রাণ ঠেলে যেন বিষ বেরিয়ে আসতে চায়।

কিন্তু রমজান যেন অন্য জগৎ দর্শন করছিল। ফিরে এসে দেখল বন্ধুবৌ সারাদিনই প্রায় তার সেবায় মগ্ন থাকে। বনসির এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই—বউ কোথায় কি করল বা করচে তাই নিয়ে সারাদিনমান নজর পাতার মতো তুচ্ছ পুরুষ সে নয়। সে জানে তার বউ ঝুলনকে। সামনে যে লগনসা বিয়ের বাজার—সারাদিনের কাজের পর তাই সন্ধ্যার পর তাকে ফুলুট নিয়ে বসতে হয়।

একা অসুস্থ অসহায় রমজানের জীবন যেন ঝুলনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, পরশ পেয়ে, হাসি খেয়ে, কথার মধু চেটে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিল। ডাকিনি বিদ্যা নাকি মারণ বশীকরণে ঝুলন যে রমজানকে তুক করল, তা যেন রমজানকে প্রতি দিনই নতুনতর জীবনের দিকে গভীরভাবে উদ্দিপ্ত করছিল। এক দিনে কয়েক ঘণ্টা চোখের আড়াল হলে পরে রমজান চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। মেয়েমানুষের শাড়ির আঁচলের ছায়ায় শুয়ে যেসব পুরুষ স্বপ্ন দেখার জন্য জন্মায়, এই রমজান তাদের দলের না হয়েও যেন তাদের দলেই নাম লিখিয়েছে। ধীরে ধীরে কি হলো কে জানে, বহুদিনের উপোষি যৌবন যেন ঝুলনের মধ্যে আবিষ্কার করে মুহুর্মুহু চমৎকৃত হতে লাগল। কখনো ঝুলন বলল, না। কখনো হ্যাঁ। কখনো চুপ থেকে, ঝুলন চোখ থেকে বিদ্যুৎ ঝরিয়ে দেয়। তখন অচ্ছুতপল্লী এই মুচি পাড়ার ভেতর দিয়ে বয়ে যায় অন্যরকমের এক মায়াবী আলো। মায়াময় হাওয়া। এতকাল খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকার যে কৌশল এই মুচি পাড়ার লোকজনেরা শিখেছিল, তার বাইরে জীবনবোধের আরেকটি উপকরণ খুঁজে পেল রমজান। তাকে কি বলে—ভাব! ভালোবাসা—নাকি অন্য কোনো উন্মাদ উন্মাদনায় পায়। এ যে নিশিডাকের মতো। ঝুলন একদিন বলল, সাড়া দিয়েচ কি মরেচ। প্রাণটি খাব আমি হে ফটিক চাঁদ—

এক এক সময় রমজান বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। ঝুলন কিন্তু তুলনায় স্বাভাবিক থাকে। পরিণত মেয়েমানুষরা যেমন হয়। পুরুষের আবেশ আর মেয়েদের গভীরতা দুটি বিপরীত ধর্মের। এতোদিন একটা রাখ-ঢাক ছিল, এখন যেন জনসমক্ষে তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

এ কথা আর কেউ তেমন আপন করে জানে না। জানে শুধু একমাত্র ঝুলন—রাতের পর রাত শরীরে অঙ্গ লেপে পড়তে থাকার স্বাদে সে জেনেছে—বনসির মনের ইচ্ছা, সে একদিন গ্রামপ্রধান হবে। সে ইচ্ছা চাপা আছে মনের তলায়, যেমন কাঁথা চাপা শিশু। আসলে ঝুলন জানে গ্রামপ্রধান-টধান লয়, আর পাঁচটা পুরুষের মতোই বনসিও চায় কিছুটা ক্ষমতাধারী হতে। রাজা হতে। তাই যখন

তুহীনবাবু রমজানকে দেখতে এসে একেবারে গদগদ হয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন থেকেই বনসি বুঝেছে এই রমজান লোকটাকে কাজে লাগাতে হবে। দিনে দিনে গাঁয়ে লোতন মুচি রমজানের প্রসার ছড়াতে থাকে। প্রতিপত্তি কমে রামধনের। ঝুলন দুচোখ মেলে শুধু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সহজ সরল সুন্দর প্রকৃতির মানুষ রমজান দিনে দিনে তার আপনার লোক হয়ে ওঠে। বাঘের মতো তেজী—লোকটার কাছে এবার বুঝি মুচি, মাজি, কামার, কাহার সবাই এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। মাগুর মাছের ঝোল রাঁধল সে। এই ঝোল খেয়ে আরো তেজ হোক লোকটার। আরো বেপরোয়া হয়ে উঠুক তার ছাতি। দুই হাত। তাকে লক্ষ্য করে কেউ পাথর ছুঁড়ে মারলে সেই পাথর যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আঁচলের খুট থেকে দু টাকার একটি লাল নোট বের করে সে সুধা সর্দারকে বলে—আদা দাউ ৫০ নয়ার—

এতো আদা কি হবে রে বনসি বৌ—

কই মাছের ঝোল রাঁধব—

কই মাছ এমন দিনে কুথায় পেলি—

ডোব ডাবরি ছিঁচে জল সরানু, বেরিয়ে এলো পাকা কই। হলুদ চাঁপার পারা। আমের আঁটির মতো মাছ—

মাছ খেলে তর গতর যে আরো ফুলবে রে মেয়ে। এই গতরেই বাঁচু কি মরু, আবার—

নজর দিওনি গো—অনেক কষ্টের শরীর আমার। ধসে যেন যায়নি আবার—

খা ভাই খা তুই, যত পার কই মাগুর খা। বল আর কি দিতে হবে—

ঘরের সামনে ঝুলন এসে দেখল মাঝ-পৌষের আলোয় তাদের তিন কাঠার ধানী জমিতে সোনার বরন ধরেছে। দূর থেকে দেখলে জালাগোড়ার ঝলমলে রূপ। আর কদিন বাদেই কাটা হবে। ধান উঠবে ঘরে—মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এইসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে যেন চোখের সামনে মুচিপাড়াটার গায়ে লেগে থাকা বাসন্তী রঙ দেখতে পেল ঝুলন। অমনি সে হেসে উঠল।

তখনই বেলা বাড়ছে গগনে। গুইরাম হনহন করে ছুটছে পুবে। যেন বহুকালের আদি মানবটি কালো আঁধারমানিক রঙে ধোয়া লোকটি মুচিপাড়ায় একেবারে বেমানান। আধুনিক হয়ে ওঠা সব কিছুর ভেতর যেন একটি প্রাচীন কালের দাগ। এখন ক্রমশই যেন তা দিগন্তরেখায় গিয়ে মিলিয়ে যাবে। মুছে যাবে সেকালের মুচিপাড়ার ইতিহাসটি। কোথায় যাবে গুইরাম—রোজ এই যে এমনি হনহন

করে পুবে কোথায় হেঁটে যায়। আবার ফিরে আসে। তার এই যাওয়া-আসার খেলার ভেতর দিয়ে যেন মহাজাগতিক সত্যটি নিজেকে জাহির করে। মুচিপাড়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রমজান, আর ফিরছে ঝুলন। দুটি একেবারে বিপরীতগামী মানুষ। যেন এরা কেউ কাউকে চেনে না।

লোকটাকে যেতে দেখে আর ডাকল না ঝুলন। রোজ পরিশ্রম করে যায় আসে—এই বুড়ো হাড়ে আর এসব কি সহ্য হয়। বয়সকালে মানুষের ভীমরতি হয়। ঘরের মানুষ তখন ক্ষেপার মতো বনে বাদাড়ে ছোটে।

ঘরে ফিরে এসে হাড়িটি উনুন থেকে নামিয়ে ভাতের ফেন গালতে বসল ঝুলন। ভাদ্র মাসের আউস চালের ভাত—মিঠা মকরের মতো এক গন্ধ থাকে এই চালে। এখন ধুঁয়োর সঙ্গে মিলেমিশে তা নাকে আসে। এমন সময় কে এসে ডাক ছাড়ে—বলি ও বনসি বউ—

কে গ, কি হলো—

মুখ বাড়িয়ে একটুন দেখবে তো বাবু। নাকি সে অবসরও তোমার নাই—

ভাতের মাড় গালচি যে—

তাহলে গাল—আমি বরং আম গাছটার এক মত্তর দাঁড়াই। জিরান লিই—

মাড় গেলে, হাতের সুসার করে ঝুলন ঠরঠর করে বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে লোকটিকে দেখেই মাথার ঘোমটাটা নাক পর্যন্ত টেনে দিয়ে বলল—ওমা আপনি এসেচ, আমি ভাবনু বলাই। এতক্ষণ বলবে ত আপনি—এই রোদে গাছ-তলাটায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কেউ।—এই বলে ঘর থেকে একটা পিঁড়ি এনে বাইরে পেতে দিল ঝুলন। গাছের ডালপালায় ভেঙে রোদ ছায়া—সেই উঠোনেই পাতল পিঁড়িটা। ঝুলন জানে জগু দনপাট মুচিদের দুয়ারে বসে না কখনো। আগে আগে পিঁড়িতেও বসত না। এখন কি মনে করে বসে। একটু হেসে জগু দনপাট বলল—এসছিলম, রমজানের সনে একটুন দরকার আছে।

ঐ তো ঐ ঘরটা—

ঘরে তো কুঁজিতালা ঝুলচে। ভাবলাম তুমি যদি বলতে পার—কুন দিকে গেল—

ই আবার কেমন কথা। আমি বলব কি করে। কার কুথায় কাজ, কে কুন দিকে যায় তার আমি কি জানি। আমাকে আপনি কি মনে করে জিগেস করলে—

হঠাৎ অকারণে বোকার মতো রেগে ওঠে ঝুলন। ঝাঁঝিয়ে ওঠে। হ্যা হ্যা করে বেহায়ার হাসি হাসে বামুন। এমন চোখে তাকায় যেন ঝুলনের মনে হয়

তাঁর শরীরে কোনো কাপড় নাই—। জগু দনপাট বলল—শুনি তমাদের বামুনের সঙ্গে তার উঠাবসাটা বেশি। তা এমন খেঁকিয়ে উঠলে কেনে—

লোকটাকে ভালো লাগে না ঝুলনের। সে হাসবার চেষ্টা করে বলে—আমরা হলাম মুচি—জাতে ছোট। অশিক্ষা আমাদের। কথায় মধু ঝরবে কুথা থেকে গজ বামুনদা—

ছোটলোকদের মেয়েমানুষের সঙ্গে বেশি হাসিমস্করা করে মাথায় তুললে সে মানসম্মান রাখতে চায় না। পেয়ে বসে। তখন তাকে সামলানো দায়। সেই ভালমন্দ ভেবেচিন্তে জগু দনপাট বলল—পারটির কাজে এসেছিলম। দেখা হলে ভাল হত। তমাদের ঘরের বাগে যেদি এসে লুতন মুচি তো বলে দিও আমি একবার দেখা করার কথা বলেচি—

এই বলে আর কোনো অপেক্ষা না রেখে এক হাতে ছাতাটি ফুটিয়ে মাথায় ধরল দনপাট। তারপর সাইকেলে উঠে সাঁ সাঁ করে চলে গেল সড়ক ধারের দিকে। ঝুলন সেদিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—হুঁঃ। বুড়োর চোখ দেক না—শকুনের মতো। তোর জন্য পই পুকুরের পাড়ে নিমগাছট বাড়ে। মর মর বুড়—মর—

রামধন পাথরের মতো চুপ হয়ে বসে আছে। নিবিড় জ্যোৎস্না নেমেছে পৃথিবীতে। ফাঁকা মাঠে বিবাগি হাওয়া এলোকেশি মেয়ের মতো ঘুরে ঘুরে হাসে, দেহ এলিয়ে ঢলকে পড়ে। মাঘ মাসের শেষে শীত একটু মরেছে, শুধু খর হাওয়া। গৃহস্থ লোকের ঘরের সামনে ধানের গাদি। মুচিপাড়া মুচিপাড়ার মতোই শ্রীহীন। লেবী বলল—কি হল গ, এমন গুম মেরে রইচ কেনে—

রোজকার মতো আজও ব্যাণ্ডপার্টি দলের তরজা চলচে। কোনো কোনো দিন রামধন যায়। ফুলুট বাজায়। গানের গত তোলে। মাঝখানের কিছুদিন পার্টির কাজে সে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল—এসব বাজনগাওনে আসতে পারত না। ঘরে এসে ঢুকত গভীর রাতে। তো বেশ কিছুদিন হলো সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসে রামধন। মন খারাব থাকলে কখনো-বা ফুলুটের দলে এসে বসে। বাজায়। তাল দেয়। সঙ্গত ধরে।

রামধনের বউ লেবী পুথুলা মেয়েমানুষ। দুধে আলতায় গোলা তার গায়ের রঙ—তাই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। তার উপর আবার স্বামী যার গ্রামপ্রধান তার নিজের পাড়ায় একটা দৌরাত্ম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিছুদিন ধরেই লেবীর চোখে পড়ছে লোকটা কেমন ঝুম মেরে যাচ্চে। কিন্তু পেটের কথা যদি

কুখিনো খুলে বলে। এক সাথে এতগুলান বছর কাটিয়েও মানুষটাকে চিনতে পারল না।

লেবী বলল—কি গ বলই না কি হইচে। আমি ত আর পর লই নিজের বউ—

এই কথার উত্তরে রামধনের মুখের ওপর জমে থাকা নীল বিষটা যেন একটু ফিকে হতে দেখা গেল। বলল, সে তুই বুঝবিনি। কত রকমের জালা আচে। এই ক বছরে কি আর কম দেখলম—মানুষই এক সর্ব্বনাশা জন্তু। সবাইকে বিশ্বাস করা যায়। যাবেনি শুধু এই মানুষ জাতটাকে।

কেনে কি হল বলবে তো—

কি আর বলি—বলার কিছুই নাই, এখন শুধু বসে বসে চুপচাপ দেকে যেতে হবে। কুন লদীর জল কুন লদীর বাগে গড়ায়। জলের যে বিষ তা আমি গায়ে মাখলম, লোকে বলল কাদা। আর ওরা যখন নেয়ে এল তার নাম হল গে স্নান—এই বলে রামধন বউয়ের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকায়। কিন্তু বোধহয় শিক্ষার অভাবে মেয়েমানুষের মগজ এখনো পাকেনি, সে ইসব রাজনীতিক কথাবার্তা বুঝবে কি। শুধু হাবার মতো অবলা চোখে তাকিয়ে থাকে।

খোলসা করে বলবে ত নিকি—

কি আর বলব। গণ্ডোগল চলচে—

কুথায়—

কুথায় আবার পাটির ভিদরে

কি হল আবার—

সে অনেক কথা তুই বুঝবিনি। আচ্ছা লেবী, আমি যদি কিছুদিন ঘরে না থাকি তুই সংসারটাকে চালিয়ে লিতে পারবি তো—

ই আবার কি কথা, কুথায় যাবে—

না যাবনি কুথাউ। যাবার জায়গা আচে নাকি—মরতে যাব কুথায়। কথার কথা বলি। ভাল লাগেনি—এক একবার মনে হয় সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দে পালি যাই। ফের মনে হয় আর যাবই-বা কুথায়। পুরো দেশটাই তো এখন বিষে গেছে। চুরি করবে সবাই অথচ আঙুল নেড়ে বলবে তুই চোর। গুড় খাবে সবাই—কিরমি হাগবে শালা রামধন রিশি—

লোকে বলে দশচক্রে নাকি ভগবানও ভুত বনে যায়। আর মানুষ তো কোন ছার। পল্লী সমাজের নোংরা নীতির মধ্যে যে লোক জড়িয়েছে একমাত্র সেই বলতে পারে গেঁয়ো চরিত্র কি জিনিস। মানুষ চরিত্র বোঝা—একটি মানুষের

জীবনে অন্বেষণের আর কি তাগিদ থাকতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে, ভাবনা চিন্তা দিয়ে কাজ করে মানুষ—কিছুকাল পরে টের পায় একটি বড়ো রকমের ভুল তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। এতকাল ধরে রামধন জানত এই মুচি অসব্য পল্লীতে সব্য বলতে একমাত্র সে নিজে। সে পণ্ডিত, জ্ঞানী, গাঁয়ের মুখ্যা হওয়ার জন্য একমাত্র যোগ্য লোক। তেজ নামের দর্পটি তাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে এই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু কাজের গোড়ায় যে এরকম মারাত্মক মারাত্মক কয়েকটা ভুল রয়ে যাবে একথা যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানত! আসলে কথায় বলে কপালে যদি থাকে তুমি মরবে সাপ কাটিতে তবে আকাশ খানি নামবে সাপ। মরবে তুমি। চোখের সামনে একটা অন্ধকারের কুজ্ঝটিকা ছেয়ে আছে। দূর দেখতে পাওয়া দুষ্কর। আলোচনা পরামর্শ করার জন্যও যেন একটা লোক নাই তার। যে দুটা ভালমন্দ জবাব দেবে। একটি তুচ্ছ বউ, একটি পাকা জামের মতো কুচকচে কন্যে আর বাতিল বাপ নন্দকিশোর। রামধন দু দণ্ড ফুলুটের ধ্বনি শুনল—বনসি সত্তমে তোলে প্যাথস টিউন—আর না হবে মোর মানব জনম / পাথরে ঠুকিয়া মাথারে—।

লেবী বলল—পই পই করে বলেচিনু—এই ভীরকুটির পাটি কাজে যেওনি। যেতে হবেনি। মরবে আধ রাস্তায় পা মচকে—শুনবে যদি আমার কথা তালে কি আর এই ফ্যাসাদ হয়—

সে চরিত্রের লোক রামধন নয়। কখনো কারো কথায় উঠেনি বসেনি। যা মন চেয়েচে করেচে। প্রাণ বলেচে যা তাই গেয়েচে সে। ভুল হলে শুনে শুনে মাশুল দিয়েচে কিন্তু পিছিয়ে আসেনি। যেমন পাকা বাঁশ তেমনি তার জেদ—মচকাবে না বরং ভেঙে যাবে। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে এ যাত্রা উদ্ধারের কোনো পথ কিনারা করতে পারল না সে। এই পৃথিবীতে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়, বাঁচো বা মরো। কিন্তু একশ জনের সঙ্গে লড়তে গেলে ক্ষমতাহীন লোককে পড়ে পড়ে মার খেতে হয়। রামধন একবার ভাবনায় ডুবে যায়, পর মুহূর্তে ভেসে উঠে মুচিপাড়ার গভীর প্রাণের সুর। ফুলুটের জিভ থেকে গানের গত এসে চরাচরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সেই মধুর সুর শুনে রামধন ভাবে কোথাও কোনো মরা তেঁতুল গাছের ডালে বসে বুঝি একটি সন্তানহারা কোকিল ডুকরে ডুকরে কাঁদে। কারো পোষ মাস—কারো সর্বনাশ।

লেবী বলল—এক কাজ কর, হাতে পায় ধরে তুমি বনুচ অদের কাছে ক্ষমা চেয়ে লও। ক্ষমাঘেন্না করে বাবু মানুষ একটা মিটমাট করে লিবে—

তুই চুপমার। বুজ্জুনু কিচু, কথা কয়িসনি—

তবে মর—এরকম বসে বসে গগনের পানে তাকিয়ে বসে থাক। আমি শুতে যাব। চোখ জড়ায় বটে। হাঁড়িতে ঢাকা ভাত আছে—জল দেয়া ভাত। আলু পিঁয়াজ ভেজেচি। পার ত বেড়ে পেটে দিও। না পারলে চাঁদুকে ডেক। ভাত দিবে—

আমাকে একটু মতিহার আর শালপাত দে—

আর কত খাবে পেট ভরে—ঐ ধুঁয়াগুলানকে। তিনটা পাত তো শেষ করলে সন্ধ্যা থানি। ঐ গু গুলান আর নাইবা গিললে। তারপর সারারাত ধরে ত খুক খুক করে কাশবে—

সে তকে অত ভাবতে হবেনি। শুতে যাবি নাকি যা—আগে আমাকে দক্তাপাতা দিয়ে যা। তোরা সবাই মিলে আমার ঢের ভালো করেচু, আর করতে হবেনি—

আচ্চা বল দিনি ইসব কথা তুমি আমাকে শুনাও কেনে। আমি কি তমাকে ইসব করতে বলেচিনু। যা করেচ তা তুমি তমার লিজের বুদ্দিতেই করেচ, লিজের তরেই করেচ। এখুন আমাকে শুনাচ্চ কেনে—গায়ে ঝাল হইচে, ডোবায় গে ধুয়ে এস—

এই বলে ঠর ঠর করে ঘরের ভেতরে চলে যায় লেবী—ভেতর থেকে মতিহার আর শালপাত ছুঁড়ে দেয় রামধনের দিকে। দিয়ে, মেয়েমানুষের যা স্বভাব, শুধু গজগজ করতে থাকে। রামধনের মনে হয় বউ ছ্যানা এ জগতে কেউ কারো লয়। যার জন্য চুরি করবে সেই বলবে চোর। লেবীর এইসব কথা শুনে তাই তার শরীরে রাগ রত্নাকর দস্যুর মতো হু হু করে কেঁদে উঠে। কিন্তু জল পড়ল না। রামধন উঠোন থেকে একা একা উঠে খালের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এগিয়ে চলল রামধন—পিছে পড়ে রইল মুচিপাড়া। গুড়েবাগানের চৌহাদ্দি—উত্তরে বামুনপাড়া, দক্ষিণে ঘোষেদের ভিটেমাটি। পুবে কলুপাড়ার সীমা। পশ্চিমে কামার বসতী। উত্তর পশ্চিম কোণে জালাগোড়া—মধুমতী খাল, সেই বায়ু-কোণের জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রামধন দেখল পৃথিবীময় ছেয়ে আছে এক জটিল আঁধার। ঈশানে নৈঋতে যেদিকে চাও আঁধার—এই আঁধার গায়ে না মেখে মানুষের নিস্তার নাই। ভালোই ছিল রামধন—গরীব মুচি জুতো সেলাই করত আর খেত। গায়ে ছিল বোটকা গন্ধ, মাথায় খরখরে চুল। ছোট্ট ঢিবির মধ্যে উই পোকার জীবন যেমন হয়, তেমনি উৎপাতহীন জীবন ছিল রামধনের। তারপর এলো লোভ—

গভীর রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত পৃথিবীর ওপর একা একা ঘুরে বেড়িয়ে রামধন আজ একটা নতুন জিনিস শিখে গেল। সে এক নতুন বিদ্যা—

যদি বলো—কি, কি সেই বিদ্যা—তবে বলতে হবে সে বিদ্যা বলে বোঝানোর নয়। দল ছাড়া যে কাক একা একা উড়তে উড়তে ঘরের পথ হারিয়েছে সেও জানে এই আঁধারটি কিছুতেই অতিক্রম করা যাবে না। মাথার উপর আকাশ সারাদিনের পর একসময় অন্ধকার ঢালবেই ঢালবে—সেই আঁধারকে ঠিকমতো চিনতে পারলে, জানতে পারলে ভয় চলে যাবে হাওয়ায় বাতাসে ভর দিয়ে। ঘুরতে ঘুরতে রামধনের আজ আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না। বরং সকাল হলেই যাবে।

এমন সময় সে তাকিয়ে দেখল—আকাশ থেকে আগুন পড়ছে। অশিক্ষিত রামধন বুঝতেও পারল না সে আসলে দেখল নক্ষত্র পতনের ইতিহাস। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এই যে মহাকাশের নীচে অবাধ পাঠশালা, এখানে নীতিশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তার কোনো জাতবিজাতের জন্য পক্ষপাত নাই। কার্পণ্য নাই। জলের দিকে তাকিয়ে, গাছপালার দিকে তাকিয়ে, মাটির দিকে তাকিয়ে তাই যে যেমন পারে তার প্রয়োজন মতো বিদ্যাটি শিখে নেয়। শেখানোর দরকার পড়ে না, মুখস্থ বিদ্যা—পড়িলিখি সমাচার এখানে অচল। এখানে একজন মুচির সঙ্গে একজন বাবু একইভাবে বোধ ক্ষমতার গুণে জগৎরহস্য টের পায়। যেমন অবহেলিত, লাঞ্ছিত, যাঁতাকলে পিষ্ট রামধন আজ টের পেল এই কুটিল জটিল অশ্লীল সামাজিক অবস্থার ভেতর দিয়ে হাত মুঠো করে প্রাণ আঁকড়ে যাতায়াতের নাম আসলে জীবন। এই জিনিসটি মুচি, বামুন বা বুদ্ধিধারীদের জন্য আলাদা আলাদা নাই। একটাই। যে হাওয়াই-বাজি আগুন বুকে ধরে একবার আকাশে উঠেছে, আগুন খুইয়ে তাকে ঠিক নিচে পড়তে হবেই। তাই রামধন, তোমার এত দুঃখ কিসের। আরে ভাই মুখ বুজে সবই সহ্য করে যা—আর তারই আরেক নাম বিপ্লব।

গ্রামপ্রধান রামধন রিশির বিরুদ্ধে এই চুরিচামারি, পার্টির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ বা পার্টি সংগঠনে এই আপাত ফাটলের খবর কিন্তু বাইরে জানাজানি হয়নি। এ সংবাদ এখনো গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটির নিজস্ব সীমানার মধ্যে বন্দী আছে। কিন্তু রমজানের ক্রমশ সেরে উঠাটা এক আশ্চর্য রকমের। যেন প্লাবনে বিধ্বস্ত এলাকার ধানজমি যেমন রোদ খেয়ে লকলকিয়ে উঠে, তেমনি রমজান এক-বার মার খেয়ে যখন উঠে দাঁড়াল তখন সে আর পুরুষ নাই—বাঘ বনে গেছে।

এতকাল ধরে এই মুচিপাড়াকে নিয়ে ঢের ব্যাবসা হয়েচে। কে কার উন্নতি করে জগতে! মারিধান্দা পৃথিবীর সর্বত্রই, কে কার মেরে খেতে পারো। এসব আর চলচে নি—সে গিয়ে নেতাইকে বলল—কি নেতাই, মারতে তো পারলিনি। আবার ত ঘুরে এলম। আয় না লড়বি নাকি আরেকবার?

ততদিনে তল্লাটের লোকজনেরা জেনে গেছে এই লোকটার প্রাণের মায়া নাই। ভয় নাই। এই এখন মুচিকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। একদিন বেঘোরে মরবে। কিন্তু যে কদিন বাঁচবে মারবে খেয়ালখুশি মতো।

ঘরের ভেতর জবা বসে ছ্যানাপ্যানাদের জন্য জলখাবার খুদসিদ্ধ করছিল। আধমারা সাপ জীবনদান পেয়ে ফিরে এসেচে—সেই হুঙ্কার শুনে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় রমজানের পা দুটি জড়িয়ে ধরে নেতাই বলে—আমার কথাটি ভেবে ইবারের মতো সমঝে লও ভাই। আর কুখিনো এমনটি হবেনি—

আশ্চর্য রকমের লোক। এক মন্তরে রাগটি তার পড়ে গেল। নেতাই আগের দিনের মতো বিড়িটি এগিয়ে দিল। ফুক ফুক করে টানতে লাগল রমজান। শীতের শেষ—খেজুর গাছে জিরান কাটের রসের বদলে গাঁজলা নামচে। সকালের কাঁচা রোদ মুচিপাড়ায় এসে ঢুকেছে ঝিঙে ফুলের মতো হলুদ হয়ে। রমজান বলল, নেতাই—চ, দু গ্লাস তাড়ি পেটে দে আসি—

পহা—

ভেঙিয়ে বলে রামজান—পহা! পয়সা আবার কি—চ না—গাছের রস সবাই খাবে—

চমকে ওঠে নেতাই। একি জবরদস্ত কথা রে ভাই। গাছে গাছে খেজুর রস দিয়েচে হরি ছুতার। তার সনে পার্টির লোকেদের ভাল খাতির। যেদি শান দেয়া হেঁসোটা লে গলায় বসি দেই ত নেশা করা বেরি যাবে পুটকির দিকে। সে বলে—দ্যাখ, ঝামাল হবেনি ত—

ঝামাল আবার কিসের, আমরা দু ভাইয়ে দু গেলাস খাব। ই তো আর রোজ চাইচি নি—

তবু ভালোমন্দ কি বিবেচনা করে নেতাই তার ফতুয়ার পকেটে দুটি এক টাকার নোট ঢুকিয়ে রাখে। যদি কথা উঠে তখন এই টাকাই মুসকিল আসান করবে। এই ভেবে নেতাই বলল—চল—

আচ্ছা নেতাই—

উঁ—

তোদের কত ভালোবাসি। বল—বাসিনি? কি মনে করে সে রাতে তুই আমাকে—

সে কথা তুলে আর আমাকে লাজ দিওনি ভাই। ভিদরে ভিদরে আমি মরে আচি—

তাই বল—আমিও ভাবছিলম, অনুশোচনা একটা নেতাইয়ের হবেই। লোভে পড়েই হোক আর ভয়েই হোক কাজটা সে করে ফেলেচে। বনসি বন্ধুও বলছিল—বুঝেসুঝে ই কাজ করার লোক নেতাইকা লয়।

ভাইপো ঠিকই বলেচে—

সেদিনে জগু দনপাট এসেচিল আমার খোঁজে। কি বলবে কে জানে—দেখা করতে বলেচে—

ত যাও। একবার দেখা করে এস—

না রে ভাই। যার দরকার সে এসবে। আমি কেনে যাব। বামুন কায়েত বলে আমার কাছে খাতির নাই। আমাদের যারা ভাল চায়—আমার যারা বন্ধু, তারা সবাই বলচে ইবার আর কেস্তা হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিবেনি। তা তুই কি করবি—

তুমি যা বলবে—

ঠিক তো—

হ্যাঁ রে ভাই—

এই জন্যেই বুঝি সুনেই দনপাটের পো চোঁচা আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আমি যাবনি—দেখিই না কি হয়। আমি বলব—আমাদের পাড়ায় টিউকল বসাতে হবে। রিলিফের সড়কটি বাড়াতে হবে রুইদাস পাড়া পর্যন্ত। হচ্চে হবে করলে চলবেনি, করে দেখাতে হবে। আর নাহলে ইবার ভোট পড়বে হাত চিহ্নে।

ইসব করতে যেওনি ভাই। আবার না একটা কাণ্ড ঘটে যায়—

মারবে। না হয় খাব। ইবার আর আমি একলা খাবনি। সবাই মিলে পিঠ পাতব। কি পারবি তো। কত মারবে মারুক দেখি। ভাত খাইনি নিকি—আমরাও পাল্টা দুব—

সাহস আছে ভাই তোমার—

ছিলনি, এখন হইচে। বন্ধুবৌ ঝুলন মাগুর মাছের ঝোল রেধে খাইচে। কই মাছ খাইচে। সেই রক্ত দরকার হলে না হয় তোদের তরে খরচা করে দুব রে নেতাই—

এইসব কথায় নেতাইয়ের বুক ভয়ে দুরু দুরু করছিল। সামান্য মুচি সে—ছারপোকার মতো জীবন, বুড়ো আঙুলের তলায় ফেলে টিপে দিলেই মরে যায়। তার সামনে বসে কেউ যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গল্প বলে তবে তো কম্প দিয়ে তার জ্বর আসার দাখিল। এমন সময় পেটে পড়ল তাড়ি।

বুদ্ধিমানের মতো নেতাই বুঝেসুঝে খেল। সে সংসারী লোক। ছ্যানা, বউ আছে। রমজান কিন্তু অসুখ থেকে সদ্য উঠেই আকণ্ঠ তাড়ি খেল—যতক্ষণ গলায় যায় ততক্ষণ ঢালতে লাগল। খেতে খেতে নেতাইকে বলল—ছ্যাখ নেতাই, একটা কথা—নেশা হয়ে গেলে ওই বটতলায় গে শুয়ে থাকব। এখন ঘর যাবনি। ই সব নেশাপানির কথা বন্ধুবৌ ঝুলনকে বল্যা যাবেনি। তার কানে না পৌঁছায়—

নেতাই বলল—আর খাসনি ভাই—

দুর। খাব একদিন—ভালো করে খাব। নেশাটাই হল আসল বুইলি ত—

ত চল—বড়তলায় যাবে যে—

চ আগে ওই পুকুর ঘাটে মুখ ধুয়ে লি, তারপর গাছতলায়—

না এখন উ পুকুর ঘাটে বাবুদের ঘরের মেয়ে-বউরা নাইচে। কাচাকুচি করচে—

তায় কি—আমরা মুচি বলে—ওদের বলে দিবি আমরা হলম ভক্ত রুইদাসের বংশধর। আমরা মুচি লয় মানুষ—এই দুনিয়ায় সবাই সমান—

নেতাই বুঝতে পারে লোকটা তাড়িতে টোর হয়ে গেছে। এখনি বমি করবে। ভুল বকচে। সে হাত ধরে টানতে টানতে বটতলায় নিয়ে আসে। রমজান সেখানে চিৎমাৎ দিয়ে শুয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে তার গাঁজলা ওঠে। খালি বালি মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। যেন বুকে তার বিষম ব্যাথা। যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে ওঠে। হাত পা গলাকাটা ছাগলের মতো ছুঁড়তে থাকে। কেউ দেখলে বলবে লোকটা একটু পরেই মরে যাবে। কিন্তু নেতাই জানে এর নাম নেশা।

সারাটা দিনের খর রোদ রমজানের দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল। বেঁহুশ, মাতাল, চরিত্রহীন রমজান পড়ে রইল বটগাছের তলায়। নেশায় মত্ত এই পাথর পুরুষকে টেনে হিঁচড়ে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারেনি নেতাই। অবশেষে গাছের তলায় শুইয়ে রেখে সে চলে গেছে তার কাজে। রমজান এখানে শুয়ে বসে আইঢাই করেছে, বমি করেছে, অসভ্যের মতো পড়ে থেকেচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকজন দেখেছে আর ছি ছি করেছে।

পশ্চিম আকাশে সূর্য ছুটন্ত এক লাল মুরগীর মতো অস্ত যাচ্ছে। এমন সময়

নেশামুক্ত রমজান মাঠের আলপথ ধরে মুচিপাড়ার দিকে এগোচ্ছিল। শরীরে তার অবসাদ—সে চলেছে ঘরের পানে। দিনের তেজ ফুরিয়ে, আলো ফুরিয়ে এখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্নতা নেমে আসছে পৃথিবীতে।

ইচ্ছে ছিল এগিয়ে গিয়ে ডোবার ধারে পাথরে শুয়ে শুয়ে একটু জল লাগাবে শরীরে। তারপর শুদ্ধ হয়ে ঘর থেকে মাদুরটি দুয়ারে বের করে শুয়ে পড়বে একটু। খাবে না কোনোকিছু। গরমকালের সন্ধ্যার উড়ন্ত ফুরফুরে হাওয়ায় শুয়ে যদি একটু শরীর জুড়ায় তার।

কিন্তু ডোবার ধার পর্যন্ত যেতে হল না রমজানকে। মুচিপাড়ায় ঢুকতে গিয়েই সে দেখল, চোখে আগুনের তেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝুলন।

কোনে কথা না বলে ঘাটের দিকে নেমে গেল রমজান। সে বুঝল—ঝুলনের কানে সবকিছু এসে পৌঁছেচে। এত মদ খাওয়া বা তাড়ি টানা সহ্য হয় না ঝুলনের। নিজের বউয়ের মতো মুখ ঝামটা মারে। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্বেও নিজেকে সামলাতে পারে না রমজান। নেশার মতো একটা কিছু শরীরে তার চাই। এখন চোখ তুলে তাকাল না রমজান, অপরাধীর মতো নিচু চোখে এসে নামল জলের ধারে। চোখ তুলে তাকালেই মেয়েটা প্রথমে খ্যাক খ্যাক করবে। তারপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে চোখের জল ফেলবে। আত্মীয় অনাথ পৃথিবীতে এ ভাবেই বুঝি হাঁটতে হাঁটতে মানুষ পথের সঙ্গী পায়। ভাব-ভালোবাসার মুখ দেখে। তেমনি এই মুচিপাড়ায় ঝুলন আর বনসি কবে কবে কিভাবেই যেন তার আপন হয়ে উঠল।

ডোবার জলে গা ধুচ্ছিল রমজান। ঝুলন সেদিকে এক মত্তরের জন্যও না তাকিয়ে ফিরে গেল ঘরে। আড়চোখে চোখ তুলে রমজান শুধু সেই চলে যাওয়াটা দেখল কয়েকবার। কোনোরকম উচ্যবাচ্য করল না।

স্নান হয়ে গেলে গা হাত মুছে ঘরে এল। এক কক্ষ্য দরমার দেওয়ালের ঘরটি তার। এখানে কোনোরকম সংসারের বালাই নাই। বোঝা নাই। মাদুরটি বার করে মাটিতে পেতে গা এলিয়ে দিয়ে দেখল সন্ধ্যা এল এইমাত্র। আকাশে নাকছাবির পাথরের মতো তারা ফুটেছে। রমজানের মনে হল, সত্যি এই কাজটা তার মোটেও উচিত হয়নি। —এমন সময় বনসি এল ঘরের দুয়ারে। বলল, চল বন্ধু, নাইলে-দাইলে ইবার চাট্টি গরাস তুলতে হবে তো মুখে। ভাত বেড়ে বসে আচে যে—

লজ্জা বা ভদ্রতা করার কথা মনে পড়ল না রমজানের। সে ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বলল—চল—

আবার সেই আঁধারের মাঝে যেন একখণ্ড পাথর জলছে—কেরোসিন তেলের

ডিবরি বাতি। ভাত বেড়ে ভাতের থালাটিকে যেন পাহারা দিচ্ছিল ঝুলন। লোকটা গরম ভাত খেতে ভালোবাসে, তাই এইমাত্র চার মুঠা চাল ফুটিয়ে নামিয়েছে সে। রমজান এসে খেতে বসল।

নিয়মিত মানুষ বনসি—তার খাওয়া চুকে গেছে হেলতা দুপুরে। তখন মাঝ-গগন থেকে নামছে রোদ। ভাত খেয়েটেয়ে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে নেতাইয়ের কাছে শুনল বন্ধুর খবর। অমনি ঘরে এসে বউকে বলল—শুনলি। আবার তাড়ি খেয়ে পড়ে আছে বড়তলায়—

কে—

কে আবার—রমজান

আবার—?

যে পাখি একবার গু খেতে শিকেচে সে কি অত সহজে ছাড়বে নিকি—

হ্যাঁ গো—লোকটার যে অসুখ—এই উদিনে ত অসুখ থিকে উঠল। ভয় ডর নাই—

রমজান বাবু হয়ে পদ্মাসনে বসে লক্ষ্মী ছেলের মতো ভাত মেখে মেখে খাচ্ছিল। এক দুবার মুখ তুলে তাকিয়ে ঘর-গিন্নি ঝুলনের মুখের চিত্র-চেহারাটা দেখল। শ্রাবণের মেঘের মতো থম হয়ে আছে। বনসি বলল—কইমাছের ঝোলটা কেমন হইচে বনধু—

খুব ভালো। আচ্ছা স্বাদের রান্না—

ত তুমি যদি দিনের বেলা মদ তাড়ি খেয়ে পড়ে থাক—তো বিকালবেলা কই-মাগুরের ঝোলটি খেয়ে তোমার কি উবগারটি হবে বল দিনি—

আর খাবনি—

ই ত ভাই সাত কালের কাসুন্দির মতো পুরানো কথা। একজন তমার চেহারটির কথা ভেবে ভেবে কই-মাগুর ধরে ধরে ঝোল রাঁধবে আর তুমি ই রকম অনিয়ম করবে—তা ত হবেনি বন্ধু।

এই বলে ঝুলনের দিকে তাকিয়ে চোখ ঠেরে রমজানকে দেখল বনসি। হাসল মৃদু, রসিকতার সেই হাসিতে ঝুলনের মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়ে ঝরে পড়ল—আর লোক-জন যে ছ্যা ছ্যা করে। মানুষ হয়ে জন্মেছ তমার মান সম্মানের বালাই থাকবেনি? কি করচ না করচ ভেবেচিন্তে করবেনি—?

রমজানের সেই মিটিমিটি হাসিতে এখন কোনো বিরাম নাই। প্রত্যেকটি কথা সে শুনছে আর সেই তালেতালে খাচ্ছে ভাত। যে ভাত জোগাড় করতে মানুষ

হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে—শুদ্ধ ব্যাঞ্জনে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে সেই ভাত যে কত সহজেই রমজানের ঠোঁটের কাছে চলে আসে তা যদি জানত পৃথিবীর লোকজনেরা। রমজান বলল—আর দুটি ভাত—

ঝুলনের ব্যাজার মুখে হাসি—আর ঝোল নাই কিন্তু—

আলু দিয়ে খাব। মাছের মুড়ো দিয়ে খাব। ঝোল চাইনি। যা রেঁধেচ—ই তো গন্দে গন্দে ভাত রুচে যাবে।

সন্ধ্যা উতরে গেলে সাত ঘরের মুচিরা এক হয়ে ফুলুট বাজাতে বসল। কত রকমের গানের গত বাজে। প্যাথস গানের গত, মজার গানের গত—কখনো বা ঝমাঝম করে সেই গানের গত মানুষকে নাচায় কাঁদায় ভালোবাসায়। সন্ধ্যের পর মুচিপাড়ার চৌদিক অন্য এক লীলায় মেতে ওঠে। গরমকালে একটি মাঠের হাওয়া ছুটে আসে, ধাক্কা খায় আরেক মাঠের হাওয়ার সঙ্গে। কখনো বা মাঠের হাওয়া আর খালের হাওয়া করতালি বাজায়। রুদ্ধ নিশ্বাসে মানুষ অপেক্ষা করে থাকে পরের দিনটির জন্য। সকালের জন্য—আঁধার যামিনী কখন হাসবে মুখ তুলে। কখন মাঝপুকুরে পদ্ম ঘোমটা খুলে বলবে—এই দেখ আমার মুখ।

আজ বনসি বাজাতে যায়নি। বন্ধুর সঙ্গে কথা আছে—গুপন কথা।

বনসি বলল, বন্ধু শুনেচ—

কি—

আরে বল কি, গটা গাঁ-দেশ জানাজানি হয়ে গেল—আর তুমি তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকবে—

আসল কথাটাই বলবে ত আগে—

পাটি থেকে আমাদের রামধনকে সাসপেন করেচে—

কবে—কবেকার খবর বলচ—

আজই শুনলম। আজ থানি রামধনের পোষ্টে কাজ চালাবে লেউল কামার।

সে আবার কে—

সেই তো উপপধান। ভালোই হইচে, যেমন বেড়ে উঠেছিল আওতায় আওতায় তেমনি ভেঙে পড়ল ঝড়ে। এই জন্যেই তো বলেচে—অতি বাড় বেড়নি, ছাগলে মুড়ে খাবে।

তাই তো বলি, রামধনকে সেদিন দেখলম মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে—

শালা চোর—উ কি দেশের কাজ করবে। নিজের আখের গুছাতে গিয়েই এই মরণ—

দেখলে কিন্তু মনে হবেনি—

আর বন্ধু দেখে কি আর ভালমন্দ বুজা যায়? নাকি মানুষের মুখে লিখা থাকে।

হায় হায় বেচারির অবস্থাটা একবার ভাবো দিগি—

কি ভাববো—যখন রাতের বেলা তমাকে ঘর থানি তুলে লে গিয়ে খুন করতে চেইছিল ত্যাখন। ভাল হইচে। ভগমান যা করে মঙ্গলের তরেই করে—

এমন কথাটি বলোনি বন্ধু। ভুল কি আর লোকে করেনি।

কিন্তুন একবার যেদি তোমার ভুল হয়ে গেল ত সারাটা জীবন বদনাম। সে তোমাকে পুয়াতেই হবে। বলো বন্ধু, যেদি বেভুল কিছু বলি—

হ্যাঁ ঠিকই তো—

আরো সুখবর আচে—

কি রকম?

কি খাওয়াবে বল—অন্দুফুর থানি মিঠাই এনে খাওয়াবে বল—

তাই খাবে না হয়। বলোই না—

তবে কাছে এস—কানে কানে—

কেনে—ইখনে কে আছে যে শুনবে—

না বন্ধু, লোকে কথায় বলে—বাতাসেরও কান আছে। কুন কথাকে কুন রঙ্গে বয়ে বেড়াবে কে বলতে পারে। তারচে এসো কানে কানে বলি।

কানে কানে ফিসফিসিয়ে বনসি কথা বলতে শুরু করল। কেউ কোথাও নেই তবু এক অলৌকিক হাওয়া রুদ্ধশ্বাস আয়োজনের সৃষ্টি করেছিল। রমজানের চোখের তারা আরো স্থির হয়। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলছে বনসি—। মুচিপাড়া থেকে ফুলুটের ধ্বনি বেরিয়ে এসে এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায়। বলতে বলতে বনসির মুখ উজ্জ্বল হয়, চোখ জলে, বুকের ভেতর থেকে উত্তেজনা যেন তার শরীর ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। সপ্তমীর চাঁদ অনেক আঁধার সহে মুখ দেখাল, বাঁশবনের শালিক ভোর হয়েছে এই ভেবে কিচমিচ ডাকে তাকে বলল—এসো। আমাদের ঘরে এসো। চাঁদ বলল—আগে মুচিপাড়ায় যাই, আঁধার খেয়েচে তাদের। সেখান থেকেই আমি তোদের দেখতে পাব। হ্যা রে ওই আঁধার পার দুটো লোক বসে বসে কি এত কথা বলে বল দিকি! তখন বনসি আর রমজানের কথা থেমে গেছে, কিন্তু জের রয়ে গেছে বুকের ভেতর, তাই চোখ দুটি একে অন্যকে দেখছে। তার মানে আর কিছুই নয়, একের অন্তর অন্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—যাকে বলে শুভদৃষ্টি।

খবরটা শুনে নবা ঘোষ আনন্দে আটপাগল—ওই মুচি জাতটার ওপর তার যেন জন্মক্রোধ। সে বলল—ইবার তাইলে বাঁচা গেল। কথায় কথায় মুচনে ঠ্যালা সামলাতে হবেনি। কামার—তবু ভালো। মুচি যে একেবারে ছ্যা ছ্যা।

তরমুজ খেলে এই বুড়ো বয়সে সুগারের রোগ হয় একথা মনে রেখেও বেন্দাবন ঘোষ তরমুজ খাচ্ছিল। ছেলেমেয়েরা গাজন থেকে কিনে এনেছে। বৈশাখী ফল—খেতে যোরকৃত ঠাণ্ডা হবে। ছোট জাতের ফল, বাড়তে পায়নি, একটি বড়সড় বেলের মতো সাইজ—তারই আধখান থেকে সবটুকু আঁত বের করে নিলে একটি বাটির মতো দেখায়। বেন্দাবন ঘোষ খেয়ে দেয়ে সেই বাটিটি আদুরে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দেয়। অমন তকতকে বাটি দেখে একটি কুত্তা আশায় আশায় ছুটে আসে—তারপর বাটিটির চারপাশে এখানে ওখানে শুঁকে ফিরে যায় কুত্তা। হাত মুখ ধুয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে সামনে পেছনে ফুঁক দিয়ে বেন্দাবন ঘোষ ধরায় আগুন। সুলুক টান দিতে দিতে নবার দিকে তাকিয়ে বলে—এই ত তোদের বুদ্ধি। মুচি ব্যাটার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমাদের কথা তারা ফেলতে পারবেনি। যতই হোক বর্ণে শ্রেষ্ঠ। লেউল কামার কি আমাদের বাগে থাকবে নাকি?

এই কথার আলোচনা—এরই মধ্যে একটির পর একটি সাইকেল এসে পৌঁছল। ভিড় বাড়ল বৈঠকখানা ঘরে। রোদ একটু দুলেছে পশ্চিমে। তক্তাপোষে এত লোক বসলে ভাঙবে নির্ঘাত। সামনের গোবর জলে নিকানো মেঝেতে নতুন একপাটি সতরঞ্চি পেতে অভ্যাগতদের বসতে দিয়েছে বেন্দাবন ঘোষ। চা এসে গেল সময় মতো। কিন্তু এখনো এল না আলোচনার আসল পুরোহিত। জগু দনপাট। তার হাতে আছে উপর মহলের চাবি কাঠি।

পাঁচরকম সাতরকম বচসা হচ্ছিল। কার মাগ পুয়াতি। কার জমি থেকে তিন কাঠা ইবার বেহাত হল। ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বক্তৃতায় কি বলেছেন। উমুকের ছেলে হাইস্কুলে মাস্টারি পেয়েচে ৩০,০০০ টাকা ইস্কুলকে ডোনেশন দিয়ে—সে টাকা আসলে কে খাবে। কণ্ট্রোলবালা সুদন রায় তেল আর চাল ব্ল্যাকে বিকরি করে কত টাকা করেচে এইসব। এমন সময় পুরানো দিনের ভাঙা টরটরা একখান সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এলেন জগুবাবু। ঢুকেই বললেন—ওহ্ বেন্দাবনদা, জুত করে একখান পান লাগাও দেখি।

পান লাগল—কিন্তু জগু দনপাট অন্য সুরে গাইতে লাগল। অর্থাৎ সবাই যা ভেবেছিল ব্যাপারটা অত সহজ লয়। এইসব বিষয়ে তুহীনবাবু, রামকিষ্টবাবু সঙ্গে

কথা বলে তবে আজ এই সাতগাঁয়ের অ-রাজনৈতিক ডাকে এসেছেন পঞ্চায়েত সমিতির জগুবাবু, কমরেট জগু দনপাট।

এসেছে অনেকেই—বাগদী পাড়া মধুমুখী গাঁ থেকে সনাতন দোলই। কামার-বেড় থেকে লেউল মুখ্যা। ইফা থেকে নকল দাস। ট্যাপুরিয়া, মতিশোল, নিধুডাঙা, ছাতিমপুর থেকে হরিসাদন মাজি, কানা কাহার, গণেন বাউরি, মাথা ফাটা গুণধর। এরা অনেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বর। অফিসিয়ালি তাদের যা আলোচনা হবার তা হয়েছে পার্টি পঞ্চাতে অফিসে বসেই। তবু পাঁচজনের ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালো-মন্দ জানার জন্য, মনের ভাব বিনিময়ের জন্য এই সাতগাঁয়ের ডাক। তাই এই ডাকে এসেছে আরো অনেক মাথা—কেউ সেকালের। কেউ টাকায় বড়। কারো পেটে দু পাত বিদ্যা বেশি ঢুকেচে। কেউ মাতব্বরি করে বেশি। কেউ নানান কারবার করে, কিন্তু গাঁয়ে বসবাস করতে হলে যা যা করতে হবে সবই করে।

বেন্দাবন ঘোষ বলল, বল, ভাই জগু তুমিই বল। আমরা শুনি—

শেয়ালের মতো ধূর্ত লাগে জগু দনপাটের চেহারাটা। সে তার মটরদানা চোখ ঘোরায়—সামনে পেছনে চৌদিকে। তারপর বলে, সবাই এসেচে কিন্তু আমাদের রুইদাস পাড়ার ভাইদের তো দেকচিনি।—

লেউল কামার বলল—রামধন ত ঘর থেকে পালিয়েচে। খবর ত দেয়া হইচিল—

সে পালাক। আর কি কেউ নাই নাকি গাঁয়ে? জনমনিষ্যি যে কারো তো একটা থাকা জরুরি ছিল। নিজেদেরই মিটিন—দেশ পালনি সভা ইটা—

ডাকতে পাঠাব? সাইকেলটা লে হিসহিস করে যাবি আর এসবি। মুচি-পাড়ার জনাতিনেক লোককে ধরে আনবি। —এই বলে লেউল কর্মকার জগু বামুনের চোখের দিকে তাকায়। জগু বলে—তারা অবিমান করে রাগ করে ভুল বুঝে বসে থাকবে। একজনের পাপে ত আর তারা অচ্ছুৎ হয়ে গেলনি—কি বল? সবাই কি বল হে—

সতরঞ্চিতে বসে থাকা নানারকমের লোক একই শেয়ালের রা ছাড়ে—বটেই ত। বটেই ত।

জগু বামুন বলে—তবে। বল দিনি। অদের পাড়া থানি কেউ এসেনি। দেখে ত আমার মনটা খারাব হয়ে গেল। যাক এখন শুন কথা—

সবাই বাবু হয়ে কান খাড়া করে বসে। বক্তৃতা হবে। তক্তাপোষের ওপর বসেছেন জগু দনপাট, লেউল কামার, বেন্দাবন ঘোষ। বাকি সবাই নিচে। জগু পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে পড়ল। একটি দিক বাইফোকাল। বাইরে

থেকে দেখে মনে হবে ঝাপসা কাচ। কিন্তু যে পরেচে সে জানে—এই কাচটির ভেতর দিয়ে বহুদূরের জিনিসটিও সে দেখতে পাবে।

জগু বলতে লাগল—ই কথা আর লুতন করে বলবার লয়। যে চুরি করবে সে ধরা পড়বে। পড়েওচে। বিচারে তার দণ্ড হয়েচে। একজন চুরি করল বলে যে পার্টি চোর—তা কিন্তু লয়। সব মানুষ সমান লয় এই সংসারের। কেউ সদ, কেউ বদ। আগে থাকতে আগম জেনে কে ভাল কে বদ তা বুঝবার উপায় নাই। আমাদেরই ভুলের জন্য এই ক্ষয়রাতি। রামধন রিশিকে আমরাই বিশ্বাস করে গ্রামপ্রধান করেছিলম। এখন পার্টি তাকে সাসপেণ্ড করেচে—

বন্ধু—, পার্টির কাছে জাতে কোনো ভেদাভেদি নাই। সবাই সমান। সবাই মানুষ। এই সংসারের যা কিছু ফসল সবাই ভাগ করে খাব। কিন্তু সংসারটি যাতে সুন্দরভাবে চলে সেইসব দেখভাল করার জন্যই একদিন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল—

পেছনের সারিতে বসেছিল জনা দুই হাল আমলের বেটা ছ্যানা। তারা গাঁয়ের ইস্কুল থেকে মাইনার পাশ দিয়ে শহরে পড়তে গেচে। তাদেরই একজন বলে উঠল—রাষ্ট্র কি—

জগু দনপাট চোখ ওপরে তুলে বলল—সে অনেক কথা। সে কথা বুঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হবে বাপ। এই যেমন গটা ভারতটাই একটা রাষ্ট্র—

তারা বলল—ও আচ্ছা!

জগু বলে চলল—গুণ্ডা কংগ্রেসের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে গিয়ে একদিন আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলম। এই মুচি, কাহার, মাজি, কামার, বামুন—আমরা সবাই। একদিকে সেই বুর্জোয়াদের শোষণ—অন্যদিকে আমাদের পিছিয়ে পড়া ভাব। নিজেদের শাসন একদিন আমরা নিজেরাই হাতে তুলে নিলম। কম্যুনিস্ট পার্টি জন্মাল—গরীবের পার্টি। সে সব কথা অতীত ইতিহাসের কথা। আর আজকের কথা আবার আলাদা। কি তোমরা বল—আমি কিছু খারাব বলচি?

সরকার ঠিক করেচে সিডুল কাষ্ট এলাকায় প্রধান হবে তাদের থেকেই। সরকার আর কেউ লয়—আমরাই। আমাদের দলটির মাথা কলকাতায় গিয়ে বিধানসভায় বসেচে। মন্ত্রী হইচে। তাই এই সিদ্ধান্তটি ছিল আমাদেরই মনের কথা। সত্যি ত যারা পিছনে পড়ে আচে—তাদের এগিয়ে এসবার সুযোগটা তাদের দিতে হবেনি—

কিন্তু ঐ যে বলে কুত্তার পেটে ঘি ভাত সহ্য হবেনি। বন্ধু—তোমরা কিছু মনে করনি। আমি জাত তুলে বলচিনি। বলচি রামধন মুখ্যুটার কথা। কত বড়ো জীবনের সন্ধান পেলি তুই! হ্যাঁ রে মুখ্যু এমনভাবে খোয়াতে হয়—

লোকজন হঠাৎ যেন চমকে যায়—তাকায় এদিক ওদিকে। সেই মুচিটি এসেচে নাকি। জগু দনপাট হ্যাঁরে মুখ্যু—এমন করে বলল যেন সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছে সেই মুখ্যুটি। জগু আবার বলল—চুরি, নারী অপরাধ, প্রতিবেশীকে ডেকে লে গিয়ে খুনের হুমকি দেখানো, এইসব দোষে তাকে পার্টি বরখাস্ত করেচে। সুতরাং গ্রামপঞ্চায়েতেও তার জায়গা নাই। পার্টি বলেচে সর্ব-সম্মতিক্রমে নির্বাচিত উপপ্রধান লেউল কর্মকারই এখন অস্থায়ীভাবে প্রধানের কাজ চালাবে। তারপর যথাসময়ে মুচিপাড়ার ঐ আসনে ফের ভোট হবে। নতুন মেম্বর এসবে। তিন মাসের ভিদরে হবে এই ভোট। ততদিন লেউল কাজকর্ম দেখভাল করবে। আর লেউল যদি ভাল কাজকর্ম করে তবে তাকেও পার্মানেন্ট করা হতে পারে। তবে তা ভোটের পরে—এখনই লয়।

এই বলে জগু একবার আড়চোখে লেউলের দিকে তাকাল। দেখল ক্ষীণ আশার একটা আলো তার চোখেমুখে চিকচিকায়। বেন্দাবন ঘোষ বলল—হ্যাঁ, লেউল ত লোক খারাব লয়, কি বলিস নকলা—

ইস্কার নকলা দাসের আসল নাম নকুল দাস। তো সেই রামচন্দ্রের ছোট ভাই নকুল যেন দাদার গলায় গলা ঢালল—বটেই ত—

লেউলকে খুশি করে নবা ঘোষ বলল—কি লেউলবাবু গাঁয়ের উন্নতির কথা কিছু লুতন করে ভাবচেন নাকি? আপনের চোখে যেনে সবাই সমান হয়। এই সাতগাঁয়ের আঁধারে আলো বলতে এখন আপনি। অশিক্ষিত গরীব গুরবো সব এই গ্রামপঞ্চায়েতের বাসিন্দা। সরকারী যা কিছু দয়া সবাই যেন সমানভাগে পায়—

হরিসাদন মাজি বলল—লেউলবাবু লোকটি ভাল। সজ্জন যাকে বলে আর কি। আমি ত মিটিনে বললম—লেউলবাবুই প্রধান হক। আবার অস্থায়ী কেনে। পরে মুচিপাড়া থানি যে ভাই এসবে, সে থাকবে আমাদের সনে—সেও একজন মেম্বর।—

নবা ঘোষ আগ্রহ প্রকাশ করে—ত কি হল?

তার নিকি আইনগত অসুবিধা আচে। জগুদা ত বলল, কাজ ভাল দেখাউ।

সে দিন ত আর চলে যাচ্ছেনি। যেমন পাকা মাথা তেমনি কথা। ঠিকই ত।

এই সময় বেন্দাবন ঘোষ জগু দনপাটের কানে কানে কি কথা বলল। জগু বলল—আচ্ছা! তাই নিকি। তারপর—। বেন্দাবন চোখ বড়ো করে বোঝাতে লাগল। বলতে লাগল। এদিকে লেউল বলল সবাইকে শুনিয়ে, না ভাই—পদের লোভ আমার নাই। টাকার লোভ নাই। তা যেদি থাকত আমি আমার

কামারশালে বসে হাপর টানলে আর হাত্‌ড়ি পিটলে সে টাকা কে খায়। আসলে আমি চাই দেশের কাজে মনপ্রাণ গতর ঢেলে দিতে। বলুক—ইখনে রইচেন আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেট জগু মোহন দণ্ডপাট। যখন রামধন সম্পর্কে প্রথম দিন শুনলম—সবার আগে পঞ্চাত আপিসে কে পিতিবাদ করেছিল—

অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর খুব চিন্তিত মুখে জগু দনপাট বলল—হ্যাঁ বেন্দাবনদা ঠিকই বলেচে। এতক্ষণ এই কথাই হচ্ছিল।

সেই কথায় সবাই উৎসাহিত হয়ে তাকাতাকি করে। কেউ কেউ তারই ভিড়ে বিড়ি ফুঁকাফুঁকি করচে। জগু বলল—বেন্দাবনদা ভালো বলেচে—উনি বললেন ভোটের আগে এই ক'মাস আছে। এখন মুচিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারটা রাখতে হবে। কেউ যেন মনে দুঃখু না পায়। যেনে অবহেলিত বলে না ভাবে। এই ভয়টা কিন্তু একটা রয়ে গেচে। সে ব্যাপারে সবাই যদি সচেতন থাকে ত কুনুই গোল-মাল নাই। আমাদের মনে রাখতে হবে এই সাত গাঁয়ের ভিদরে মুচিপাড়াতেই সবচে বেশি। এই মুচিপাড়াটি জনসংখ্যার দিক থেকে জেলার দ্বিতীয়। রাজ্যের ষষ্ঠ। রামধন পালিয়েচে ঠিক—যেদি দরকার পড়ে ত আমাদের গে খবর লিতে হবে তার বউ ছ্যানা কি করচে। তারা আমাদের পর লয়। আজ এই মিটিনে তুহীনদার এসবার কথা ছিল। কিন্তু তেনার ঠাকুমার অবস্থা খারাব। তিনি থাকলে তার পরামর্শটা আমাদের পেটেন্ট অসুধের মতো কাজ দেখত—

লেউল বলল—এই আলোচনার কথা অবশ্য ঠিক সময়েই তেনার কাছে চলে যাবে। কি বল জগুদা—

সে ত বটেই—

ইবার তাইলে আলোচনা শেষ, যে যার চলে যাক ঘরে নিকি গ—

না—আর দু' দণ্ড দেখি। নকাকে যে মুচিগুলি পাঠালি এখনও ত ঘুরলিনি সে—

তাই ত—

কি ব্যাপার বল দিনি—

ঘণ্টা দুই ত হয়ে গেল—

ঘণ্টা দুই! পাকা চার ঘণ্টার বৈঠক হলো আজ। এই দ্যাখ ঘড়ি—৩টায় বসেছিলম, কি—?

হ্যাঁ—

এখন কটা বাজল—৭টা—

হ্যাঁ—

কি ব্যাপার বল দিনি লেউল—?

হে ছাখ দাদা—

কি বলবি ত—

নকা শালা কিন্তু রাতকানা—পথ হারায়নি ত? সাইকেলই লিয়ে গে—

তাই নাকি—ইকি একবারে অন্ধ নাকি র‍্যা—

একরকম তাই। বলি ডাক্তারখান থানি ভিটামিন বড়ি লে খা। ই ত আর পয়সা লাগবেনি—সে কি আর শুনবে—

দেখি—আর খানিকক্ষণ—

একটুন এগিয়ে দেখব—

তুই না গে কাউকে একজনাকে পাঠা তাইলে। দেখিস বাপ—সে যেনে আবার মুচিপাড়ায় গে মুচি হয়ে রয়ে না যায়। ই নকা যে ভাই আজও গেল কালও গেল। ঘুরবার নাম চর্চা নাই—

গপেনকে পাঠাই—

হ্যাঁ যাও ত বাউরীর পো—। হা লাও এই টর্চ লাইটটা লাও, আঁধার রাত। কুথায় কি থাকবে ভাই—

যাই, দাও—

দ্যাখ—খর খর যাবে। এই এতগুলান লোক বিনকাজে বসে আছে হেথা—

আচ্ছা—

আর সেই নকা মুখ্যুকে গে বল—হ্যাঁরে মুখ্যু মিটিন শেষ হলে তুই ডেকে লে যাবি—কি হল মাথা চুলকাচ্চ কেনে, কিছু বলবে—

বলছিলম কি দনপাটদা—

কি—

এগলা যেতে ভয় করে। পার্টি থিগদে তমরা তাড়িয়ে দিয়েচ, সেই খুনে মুচিটা যেদি লোক ঠেক করে রাখে, তাইলে দাদা প্রাণে মরে যাব। যেদি সননে কেউ যায়—এই রাতের বেলা—

কি রে লেউল—ই যে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল র‍্যা। ছাখ দিনি বাবা—সঙ্গে কাউকে পাঠানো যায় কিনা—

অসব্য জাত যে দাদা—ছোট জাত। নাইলে কে ভয় পেত। গপেন বাউরী অত কাউকে ভয় পায়নি। উ মানুষ হল গে সাপের থিকাও খল—

গপেন বাউরী এমন করে কথা বলছিল যেন সে চক্রবর্তী বামুনের বেটা। তাই

এই ছোট জাতের প্রতি তার খুবই অবিশ্বাস। একটু পরেই লখাই দোলইকে বলে-কয়ে রাজি করাল লেউল। লখাই হলো সনা বাগদির ভাই। লেউল জগু দনপাটের দিকে তাকিয়ে বলল—কি দাদা, লখাই যাউ থালে। লখাই যারে—

বেন্দাবন ঘোষের দিকে তাকিয়ে জগু বলল—দেখলে দাদা, এই সন্ধ্যাবেলা ই-পাড়া উ-পাড়া যাবে, এই বয়স তার এত ভয়—

আর ভাই মানুষ য্যত পাপ করচে—তার ভয় বাড়চে তত। ঠিকই বলেচে কিন্তু কে কুথায় কু মতলব লে বসে থাকবে। কে বলবে বলো—তুমি কি তার গেরান্টি দিবে—

এ-কথার জবাবে জগু কোনো কথা বলল না। সে ভেবেছিল বেন্দাবনদা হয়তো তার গলাতেই গলা মেলাবে। যখন তা হলো না তখন সে লেউলকে বলল—হ্যাঁরে লেউল—

দাদা—

আচ্ছা, বরদা সাঁই মরে গেচে নাকি বল দিনি—দেখিনি ত বহুকাল—

কেনে দাদা—তাকে মনে পড়ল হঠাৎ—

বাঁয়ের হেলা গরুটা খুব ভুগচে বুইলি ত। বাঁচবেনি বুঝাচ্চে। একবার ডাক্তর দেখালে—মানু ত গরু হল গ্যে গেরস্থের ভগবতী—

ত আনন্দফুর থানি তিনকৌড়ি সাঁইকে ডাক—

তাকে ত আবার মটরবাইকের তেল যগাতে হবে ভাই—

হ্যাঁ দাদা—তা দিতে হবে—

তবে বল দিনি—যাতায়াত সে অন্তত তিরিশ টাকার ধাক্কা। ১৬ বিঘা জমি আমার। এই গেল মাঘ মাস থানি এক চষা করে ফেলে রাখতে হচ্চে। মাটি হাওয়া বাতাস খাগ। জল-শিশির ঢুকুক গতরে। নিজের হাল ত একটি। হাল কিনে কিনে যরকৃত সম্বুরা যাচ্চে। বল ই দুয্যোগের মাথায় আবার এই এককাঁড়ি টাকার ধাক্কা—

আরো এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। উপস্থিত সবাই একে একে চলে গেল যে যার—কারো কারো ঘর দূরে। কেউ ফিরল না এখনো। শুধু বেন্দাবন ঘোষ, লেউল আর দনপাট বসে আছে রাত জেগে—

এমন সময় একসঙ্গে তিনজন—নকা, গপেন বাউরী আর লখাই বাগদী ফিরল। হাতে টর্চ লাইট আর সাইকেল।

বেন্দাবন ঘোষ বলল—কি ব্যাপার রে?

তিনজন একসঙ্গে কোরাস গানের মতো বলে উঠল—ত্যারা কেউ এসবেনি।

পাড়ায় নুতন একটি বউ এল—নেতাইয়ের বড়ো ছেলে সুমন্ত বিয়া করল বাঁকড়া বিস্টুপুরের মেই ছ্যানা সরস্বতীকে। সবাই বলল—ইটা কি হল হে নেতাই, ছ্যানার যে এখনো গোঁফ উঠেনি গ—এই বয়সে বিয়া। নেতাই বলল—গচ্ছিত হয়ে গেল ভাই। আমার কাজ আমি করনু। সাইকেল, হাতঘড়ি, সনার অঙ্গরি আর লগদা পাঁচ হাজার ট্যাকা পেল। বউ এসেচে তার মায়েরও হাতের সুসার হল। বিয়া ত একদিন করতেই হবে ভাই। মানুষ হয়ে য্যাখন জন্মেচ ত্যাখন সংসার ধারণ করতেই হবে। দিয়ে দিলম বিয়া—মেয়া পছিন্দা হয়ে গেল। আমিও আর পারছিলমনি। বয়স হচ্চে, যা দিনকাল, কবে কি বলতে কি হবে—

সে কি হে—কতই বা হবে তমার—

সে হিসাব কে রেখেচে বাবু—এখন দেখি একটুন খাটাখাটালি করলেই গা-হাত-পা থরথর করে।

তা মেয়াটি ত বেশ বাড়নসার নিকি—

হ্যাঁ বাবু,—দেখবার ভাল। গায়ের রঙটা ময়লা কিন্তু লক্ষ্মীমন্ত মুখ। আর ময়লা পাড়ায় গরা মানুষ লে হবেই বা কি অপনি বল—

মেয়ার বাপের ঘর দুয়ার কেমন? জমজমা আছে নাকি তোমাদেরই মতো—

সে দেশ বাবু বেরসিকদের দেশ—কত রকমের কারবার তেনাদের। পয়সার অভাব নাই—হাতে হরদমই কাঁচা পয়সা এসচে যাচ্চে। আমার বহুকালের ভাগ্যি ভাল গ বাবু এমন ঘরে কুটম হল—

কেনে নেতাই—তোর ছ্যানাটিও ত ভাই শিক্ষিত। লেখাজোখা শিখেচে কিছু। তোদের ঘরে ঐ ত রাজার ছা—। তা ভাল করেচু, এখন যে দিনকাল এসেচে লিখাপড়াটা ঠিকমত করলে—

আর বাবু মুচির ঘরের ছা, সেকি আর বেরিস্টার হবে নিকি। খেয়াল আর কি। পাড়ায় খবরের কাগজটা এলে পড়তে পারে। ইংরাজিতে নাম সই। দু পাত পড়া এই আর কি। যেনে রক্ত বিক্কি করে পড়ানো আমি বাবু পারছিলমনি। অর শ্বশুর বলল—বেয়াই, পড়াও ত জামাইকে। যা লাগে আমি দুব—

বা! বা! সুখের কথা। ভালো কথাটি ত শুনালে নেতাই। শ্বশুরের এই যে ইচ্ছাটি এটিই ত ঢের—

হ্যাঁ বাবু। আমাকে পাঁচ কেজি আটা দিবে। ঘি কিনতে পারবনি—তেল দে ছাঁকব। কেজি দুই সয়াবিন তেল—

কেনে বাপ—দিয়ের ত দাম কমেচে—

না বাবু, তেলই ভাল। আর নুন ১ কেজি দিবে—

মাইক করেচু দেখচি—

হ্যাঁ মেয়োরা সব বলল মাইক হবে গ নেতাইকা। বড়ো ছ্যানার কাজ—আমি বনুনু হবে। এই দেখনা খাওন-দাওনে ওই তিন হাজার টাকা লেগে যাবে। তা লাগু, তবু যেদি বাছার আমার মুখে হাসি থাকে।

সবই ভাল নেতাই। বেটাটি তোর যে একেবারেই খোকা। একটু বড়ো হলেই ত বিয়াসাদির যোগ্যি হত—

বাড়ুক না বাবু, যেত পারে বাড়ুক। খাক দাক বাড়ুক—আগেকার দিনে ত এই বয়সেই বিয়া হত। বলুন তুমি, বেভুল কিচু বলচি—আমার ত পইলাকার বিয়া এই বয়সেই হইছেল। বউটা মরে গেল সে অন্য দোষে—

হ্যাঁ বল, আর কি দুব—

বুটের ডাল—

কি—

বুটের ডাল—ছলার ডাল গ বাবু ১ কেজি। নারকল একটি। আর গুড় দিয়ে দাও আধ কেজি। ব্যস আর কিছু লয়। লিখে রাখ কত হইচে—

কবে দিবি—

একবারে উদিনেরটা লিয়ে যা হবে—আজ ত লক্ষ্মীবার তাই, যা হবে পরশু শনিবার দে দুব। কেনে আমার কি কুনুদিন কথায় চুরি চামারি দেখেচ নিকি?

না ভাই তোদের পাড়ার একমাত্র লোক তুই। যা কথা তাই কাজ—। তা দুদিনে মোট ২১ টাকা ১২ আনা—

সুধা সর্দারের দোকান থেকে বেরিয়ে নেতাই কলুপাড়ার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল। বলে কলুপাড়া—কিন্তু এ পাড়ায় কলু মাত্র দু ঘর। গাছ গাছালি পেরিয়ে এসে নেতাই দেখল আকাশ—দক্ষিণ দিগন্তে গরুর চোখের মতো একখণ্ড মেঘ ঝিলিক দিচ্চে। আর শ্মশান ধারের বেগনাবনের ঝোপের আড়াল থেকে ব্যাঙের ধৈবত রাগিণী শুনল। আরে বাপ জল হবে নিকি—সূর্য চাপা পড়ছে যেন মেঘের তলায়। আবছায়া মাঠের পথে নেমে এসেছে। নৈরাশ্য ঘনিয়ে এল নেতাইয়ের বুকে—সেই নিরাশায় মাঠতল, পথরেখা, এই গাঁয়ের নাম গুড়েবাগান সব হারিয়ে এক হয়ে যায়—

ঘরে এসে নেতাই বাঁধা তেরপলের নিচয় যে ছায়া, সেখানে একটা চৌকি টেনে লে বসল। কি রে বলাই—জল হবে নিকি। আগাসটা ভাল বুজায়নি—

না গ কাকা—কাল বোশাখের মাস, উ হাওয়ায় উড়িয়ে লে যাবে। অত চিন্তা করনি—

মাছ পড়ল ডবায়—

যা পড়েচে দু ইক কাঁটা করে হয়ে যাবে কুনু রকমে। কিন্তুন এত মাছ গেল কুথায় বল দিনি—রাতে ভিতে ধরে লিল নাকি কেউ—

হতেউ পারে—

ছাগলটা কেটে দিনু—

কুন ছাগলটা রে—

রেনুর সেই লাল ঘোঁড়া ছাগলটা—

কেনে—

রেনু বলল—সবাই খাবে। না হয় ভাইয়ের বিয়ায় আমরা দুজনে ইটা দিলম গ খুড়া—

তরা কি যে করু। আজকের দিনটা গলে গেলেই হবে—আর দিনগুনা কি করে চলবে সে কথা ভাবতে হবেনি—

বলাই বলল—না কাকা—সুমন্তর বিয়া ত আর যাইতাই কাজ ঘর লয়—পার্টির অনেক লোকজন এসবে। খাবে। তেনাদের সনমানটা ত রাখা চাই। নামটা ত রাখতে হবে—

যা পারু কর ভাই। আমি জানিনি—

আজ এই পাড়ার সব মেয়ে ছেলেরাই চুলে তেল দিয়েচে। মাথায় ক্ষার ঘসেচে কেউ কেউ। হিমানি, পাউডার মেখেচে মুখে। পায়ে আলতা সিঁদুর। ঝুলন ঠোঁটে লিপিস্টিক মেখেচে। পূজা বাজিয়ে কলকেতা থেকে ঘুরে এসবার সময় কিনে এনেছিল বনসি। রেনুবালা জবাকে বলল—মাগীর আর্টিস দেখ—যেমন যাত্তার দলের লাচনি এখনি অঙ্গ ঢেলে লাচবে।

জবা একটা হলুদ চিতাবাঘের গায়ের রঙে ছাপা শাড়ি পরেচে। সে গতর দুলিয়ে বলল—শাড়িটা দেখবার ভাল। আমাকে কেমন দেখায়চে লো—একটু সাজগোজ করলে নিজেকে গুছিয়ে রাখলে জবার বয়স অনেক কমে যায়। সে আকন্দ গাছে ফুল ফুটতে দেখে। নরম বিড়াল হাতের কাছে পেলে বলে—আহা। একটা পুষতে হবে ত। সে ভুলে যায় আজ তারই বড়ো খোকা সুমন্তর বিয়া—

জবা বলল—কেমন দেখলি গ বউ—

রেনুবালা বলল—আহা দুগ্‌গা ঠাকুরের মতন। আমাদের সুমন্তর জোড় ত। ঠিকই হইচে—

হ্যাঁ—অদের আল্লাদা ঠারঠুর। উ দেশের মুচিরা গরু খায়নি। আমি ত ভাই জানতুমনি। খকনকে যেদিন দেখতে এল—মেয়ার খুড়া এসছিল। কি দিয়ে ভাত দিই। ত বললম—হ্যাঁ গ—লোক ত লিয়ে এলে ঘরে, কি দে ভাত দুব এখন—গরুর দু কাঁটা তুলা ছিল সিকায়। উ বলল—অরা গরু খায়নি। মুরগীটা মার। হ্যাঁ ভাই—যে মুরগী জ্যান্ত ফড়িংয়ের মতো উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় সেই পিথিমচরানি সোগোমারানি মুরগীকে আবার মারা যায়! ইট ফাঁপড়ে, চেলাকাঠ ফাঁপড়ে—সে ত ছুঁড়া-ছুঁড়িই সার। যত দৌড় খায় তত ডাকে—কঁকরুকু-উ-উ। সুমন্ত তো নেয়ে ঘেমে ছুটে দৌড়ে এসে রাগে ফঁস ফঁস করে—উ হবেনি। কিছু যদি না পাউ—দ্যাখ মা আমার মগজ ভেজে দিয়ে দে। লক্ষ্মীছাড়ার কথা শুনে আমি তো ভাই কপালে হাত দিই। কি করব—কি দিয়ে ভাত দুব—কি দে মান রাখব। ভাই লেবীর ঘরে গেঁড়া গুগলি আর শামুক ছেল। পাঁটি ছাড়িয়ে তেল মসলা দে রাঁধনু ভাল করে কসিয়ে। আর গেঁড়া দে—গেঁড়ার আঁত দে টক চচ্চড়ি করনু তেঁতুল জল ঢেলে। আর ভাই তেনাদের পাতে খেতে দে সেকি নজ্জায় মরি, নজ্জায় মরি—

লেবী এসে বলল—হাঁড়ি বন্দ তো বলে দিলে—রাঁন্দাবাড়ার খবর কি—

এই যে লো, তাইত বলি লেবী কুথা গেল। তুই কি সাত কুটুমের এক কুটম নাকি। যা দিনি মাছটা রাঁধবি তুই—

রামধনের সাসপেণ্ডের ব্যাপারটাকে ঘিরে ওদের মুখে চোখে এক ধরনের শুকতা কাজ করছিল ক'দিন ধরেই। রমজান সেদিন জবাকে পই পই করে বলে দিয়েছে—হাতে ধরে তুমি নিজে গে লেবী ঝি-কে লিয়ে আসবে। সে বেচারীর মন খারাব। হবেই ত—তমরা জাত ভাই তোমাদেরই ত তার পাসে থাকতে হবে। দোষ ভুল কি আর মানুষ করেনি নাকি।—তারপর সুমন্ত শিক্ষিত, এই দেমাকে মাঝেমধ্যে জবার ঠাট বেড়ে যায় এই সত্যটি জেনে রমজান বলেছিল—জানো তো বইয়ে লেখা আছে—তুমি অধম তা বলে আমি কেনে উত্তম হবনি। মানে তুমি খারাব লোক, তা বলে আমাকেও খারাব হতে হবে, আমি কেনে ভাল হবনি। বিয়া ঘরের এই উৎসব আনন্দে সে যেন মুনে দুঃখু না পায়—

লেবী খর পায়ে মাছ রাঁধতে চলে গেল। ঝুলন আছে বউয়ের কাছে—লোতন বউ যেনে পাথর কুচির ফুলের মতন ফুটে আছে। সুমন্ত যাচ্ছিল সেদিকে—

ঝুলন ডেকে বলল—হ দ্যাখ সুমন্ত—

কি গ বৌদি—

তর বউ কি বলচে শুনেচু

কি বলচে—

বলচে আমাকে সতীন করবে—এই বলে সুমন্তর দিকে তাকিয়ে ঝুলন ভাব-বিভাবে হেসে উঠল। যেন জলের ধারা মাঠ থেকে খালে নামচে খল খল করে। টিয়া পাখির মতো বউদির লাল ঠোঁট। সুমন্ত বুঝি লজ্জা পায়। শাড়ির ঘোমটায় মুখ ঢাকে লোতন বউ।

কি হল গুণের দেওর—পারবে ত, নিকি সামালতে পারবে নি—

আজকে ঝুলন সারাদিনই শুধু হাসচে। যত হাসি তার জমা ছিল দুঃখ হয়ে বুকের ভেতর, হাড়ে পাঁজরে, রক্তে মজ্জায় তা যেন এই উৎসবের আলোয় আজ জালাগোড়ার জলভরা নাবাল মাঠের মতো অন্তহীন সমুদ্দুরকে ডাকল। তাই যেন হাসিতে হাসিতে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ফেনায় ফেনায় উথলে ওঠে, উছলে ওঠে। একে ডাকে। ওকে ডাকে। তাকে ডাকে। ঠাট্টা করে। রসিকতায় গায় ঢলে পড়ে। বকনা গরুর মতো ডাগর দুটি চোখ, তার সেই চোখ তুলে যেই তাকাতে গেল—সে চোখে পড়ল বলাই। সে ডাকল—ও বলাই—

কি—

খিদা পায় গ—খাবার কত দেরী—

এই হল বলে—

তোমার রেনুবালা কই—

জবাথুড়ীর সনে কথা কইচে—?

তার ক মাস হল? দেখা পাইনি যে বড়। আর তমাদের ঘরেও যাইনি—

কেনে এসবেনি কেনে—এসো—

শুন, একটা কথা বলি—

ত বল—

আরে দুর জোরে জোরে বলা চলবেনি সে কথা। গুপন কথা—

সূর্য অল্প একটু ধ্বসেছে পশ্চিমে। পিয়ারা তলায় যেটুকু ছায়া। ঝুলন খুব নিচু স্বরে প্রায় বলাইয়ের কানে মুখ রেখে বলে—তমরা সবাই—?

বলাই বলে—আমি, বনসি দাদা, নেতাই কা, গণেশ রিশি, বঙ্কা ঢুলি, কালী চামার আমরা পেরায় সবাই—

ইটা ভাল হবে ত ভাই? সবকুল ভেবে দেখেচ তো—নাকি সেই লোকটার কথায় লাচছ তোমরা। রমজান বন্ধু—

বলাইও ফিসফিসিয়ে বলে—শুন, এখন উসব কথা থাক। তোমার কুনু ভয় লাই গ। আমরা ত আছি—

ডোবাধার দিয়ে যেতে যেতে রেনুবালার কানে গে পৌঁছল সেই ফিসফিসানি। পেয়ারা তলায় এসে সে দেখল দুজন প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে কথা বলচে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরটা জালা করে উঠল। যেন দাউ দাউ করে জলছে ঘর, আর ঘরের ভেতর পুড়ছে সে। তার মনে পড়ে গেল—কি লো—কুখিনো ঘরে আগুন লাগা দেখুনু তুই। দুব নাকি তর ঘরে আগুন।

রেনুবালাকে দেখা মাত্র ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল বলাই। রেনু খর পায়ে এসে রাগে থরথর করছিল। সে বলল—হেথা কি, বলি হেথা কি। ওই বাঁজা মাগীটার সনে পিরিত মারাচ্চ। ঘরকে চল—দেখাচ্চি আজকে।

ঝড়ে ভেজা কাকপক্ষীর ছা'য়ের মতো চুপসে গেছে বলাইচাঁদ। দু'জনকে দেখে ঝুলন হেসে ওঠে গতর দুলিয়ে। সহ্য হয় না রেনুবালার—সর্বাঙ্গ জলে যায়। সে বলল—মাগীর ঠাটের হাসি ধরেনি। ওই হাসি তোর ইয়ের দিকে ঢুকি দুব দেখবি ত্যাখন—

ঝুলন চুপ—ঝগড়া করে না। তার চরিত্রের এই এক বৈশিষ্ট। সে হাসে, পোড়ে, পোড়ায়। কোঁদল করে না। এইসব কথা শুনে তাই তার তেমন কিছু এল গেল না—সে চলে এল। আমগাছের তলায়।—এইখানে লোকজনেরা সব খেতে বসেছে—লুচি, ছোলার ডাল, আলুপটলের রসা, পাকা কুমড়ার ছেঁচকি, বেগুন দিয়ে মাছের পোটা দিয়ে ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝাল, মাংসর ঝোল, মিহিদানা-বঁদে-রসগোল্লা—তিন রকমের মিষ্টি, পাঁপড়, আম, দই, আনারসের চাটনি।

মুচিকুলি ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের বাইরেও বেশ কিছু গণ্যমান্য লোকজন নেমন্তন্ন খেতে এসেচে। এ বছরই প্রথম। পার্টি করে এমন সব উদারপন্থী লোক—বামুন কায়েত মাহিষ্য। এখন আর কারো জাত যায় না। খাওয়ার আইটেম দেখে তারা তো অবাক। এমন যে চক্রবর্তীদের ঘরেও হয়নি গঅ। বাহ্ বাহ্ ভাল অ্যারেজমেণ্ট করেচ। রান্নাও ভাল হইচে—

গলবস্ত্র হয়ে নেতাই হাত জোড় করে আছে—কতকালের পুণ্য ছিল গ আমার। আজ কারা এয়েচেন আমার দুয়ারে!—এইসব করতে করতেই সন্ধ্যা চলে এল। খাওন দাওন শেষ।

কাজপাট চুকিয়ে দিয়ে রমজান, বনসি, নেতাই আর বলাই চারজন খানিকক্ষণের জন্য বসল কয়েক জনের সঙ্গে—তারা হলো দেশের লোক। তার মধ্যে জগু দনপাটও ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নানান বিষয়ে তর্কাতর্কি চলল। জগু দনপাট বলল—তোরা তাহলে বিক্ষুব্ধ দল করবি ?

বনসি বলল—সেসব জানিনি বাবু। আমরা আমাদের কথা ত বলেই দিলম। আমাদের একটিই কথা—প্রধান ছিল আমাদের থাকতে, ইবারও প্রধান হবে আমাদের থাকতে।

জগু বলল—সে তো মেম্বাররা ঠিক করবে। আমরা তার কে—

কে এতসব বুজিনি বাবু, যা বললম শুন। তা না হলে যেমন চলচে চলবে। মনে রাখবে শুধু ই গাঁয়ে লয়, এই সাঁত গায়ে যে মুচি ভোট আছে ইবার সব হাত চিহ্নে পড়বে। আমরা কাউকে ভয় করিনি। ভোট কর—আমাদের থাকতে দাঁড়াবে ওই রমজান—সেই হবে প্রধান—

আরে মুখ্যু, উ যে লোতন মুচি। হেথায় অর ঘর নাই, জমিন নাই—ভোট নাই। আগে নাম লিখাক, ভোট হোক। না হলে দাঁড়াবে কি করে—

বামুনদা—ইবারে আমরা যে বাজাতে বসব। লিজেদের বিয়া ঘর। আনন্দ করব। একটু খাব। আমাদের কথা ত বলে দিলম দাদা—ওইট আমাদের শেষ কথা—জোরজার করে কুনুই ফল হবেনি। মারলে মার খাব। তবু ল্যাহ্য অধিকারটি ছাড়বনি দাদা।—

ওরা বাজাতে বসল। সন্ধ্যার তিমির ভেদ করে ছুতো হাঁড়ির মতো ভাঙা এক-খণ্ড মেঘের বুকে চাঁদের খেলা। গুড়ের মতো পাক খাচ্ছে আকাশ—ঘুরে ঘুরে সরে যাচ্ছে মেঘ। জগু দনপাট আজ সাইকেল নিয়ে আসেনি। ঠুক ঠুক করে বাঁশবনের ভেতর পথ বেয়ে সর্টকাটে হাঁটছিল। শিয়াল ডাকছে কোথাও—অনেকদিন পর শেয়ালের ডাক শুনল জগু। চতুর্দিকে হাওয়া যেন আস্তে ধীরে পাল্টাচ্ছে। মুচি-পাড়াটাকে এবার আর অবহেলার চোখে দেখলে চলবে না। এ বাঁশ মচকাবে—কিন্তু ভাঙবে বলে মনে হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই এক বছরে পার্টি থেকে বিতাড়িত কিছু লোকজন মিলে বিক্ষুব্ধ সি পি এম গঠন করেছে। ওপর মহলে ফ্রন্ট যতই কার্যকরী হোক না কেন—সি পি আইয়ের সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার বিশেষ কয়েকটি জায়গায় পার্টির সম্পর্ক ভালো নয়। বিষ ছোঁড়াছুড়ি আছে। ভোটের সময় দুই পার্টিতে এক হয়ে ভোট যুদ্ধে নামে—তাও কিন্তু তেলে জলে। সে কখনো মিল খায় না। এখন এই কেশপুর থানার মুচিরা যদি আবার সংঘবদ্ধ হয় তাতে করে

পার্টির রাজনৈতিক ভাবমূর্তির পক্ষে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সুতরাং যেমন করেই হোক এর একটা ফয়শালা করা দরকার। বাম পঞ্চায়েত রাজের প্রথম ক'বছরে দমননীতি গাঁয়ে-গঞ্জে সফল হয়েছিল, এখন তা ক্রমেই মারাত্মক পর্যায়ে যাচ্ছে। বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে একটা সমাধানে আসা দরকার। এ ব্যাপারে একবার খুব দ্রুত তুহীনবাবুর সঙ্গে বসতে পারলে ভালো হয়। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে জগু দনপাট বামুনপাড়ায় এসে ঢুকে গেল।

কালরাত্রি নতুন বউয়ের বরের মুখ দেখতে নাই। সে শুতে এসেচে ঝুলনের কাছে।

ঘুমিয়ে আছে নতুন বউ। গায়ে যেন তার কেমন এক হারানো দিনের গন্ধ। মুচিপাড়া স্থির, একলা, অপস্রিয়মান। ঝুলনের চোখে ঘুম নেই—জীবনটাকে ঠিকঠাক পাওয়া হলো না। এমন নিরাকার, নির্বিকার ঘুম সে কখনো ঘুমিয়েছে কিনা ভাবতে লাগল সে। দূর অতীত চোখের সামনে বার বার জেগে জেগে ওঠে। কখনো কুকুর ডাকে রাত্রি ভেদ করে। কাছে—কিংবা বহু দূর দেশের কোনো গ্রাম থেকে ভেসে আসে রাত-কুকুরের কান্না। উ মরণ। কুত্তাগুলান ঘেঘায় ক্যানে—। বলার সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক অলৌকিক যাদুর ছোঁয়ায় যেন চুপ করে যায় কুকুরেরা। নিজের কথার ফলিত গুণ দেখে হাসে ঝুলন—এই জন্যই বুঝি বলেছে,—ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ঝুলন তাকিয়ে আছে নতুন বউয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে—কেমন অপরাজিতা ফুলের মতো নীল তার গায়ের রঙ। নাক নয় যেন একটি ফুলখসা কচি পেপে। তেতুলফুলী ঝুমকোলতা কানে তিনপাতার বাহার দোলায়। শুধু চাই গায়ে গতরে মাংস—। বরকে লে কয়রাত শুলেই তা এসে যাবে শরীরে। ফিনকুটি জ্যোৎস্নার মতো ভাব-ভালোবাসা আর দুঃখ খেলা করে ঝুলনের বুকের ভেতর। যদি সেরকম সুযোগ থাকত তবে সে যেন নিজের দিকেই নিজে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখত। হঠাৎ তার রেনুবালার কথা মনে পড়ল—আবার একদমক হাসি বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। পাগলী একটা—যাকে বলে একেবারে ক্ষেপি, বদ্ধ উন্মাদ। কি একটা পাখি ডেকে উঠল বাইরে—রাতপাখি। ডাকবেই—গভীর রাতে ডাকার জন্যই যে এই পাখিটির সৃষ্টি। চোখ বন্ধ করে মুচিপাড়ার অশিক্ষিত বউ ঝুলন অনুভব করার চেষ্টা করছিল—পাখিটার রঙ কি—কালো, সাদা, নীল নাকি পাঁচমেশাল। এমন সময় কোথা থেকে অপরূপ এক সুর ভেসে এল তার কাছে। কোথা থেকে—শীতহিম পৃথিবী থেকে, নিবিড় কালো অন্ধকার থেকে, নাকি এই লৌকিক জগতের বাইরে পড়ে থাকা সেই ক্ষুদ্র, মহৎ, অতি শৌখীন

জগৎটি থেকে। মাদুরের উপর পাতা ছিল একটি নিদেন হীন কাঁথা। তার উপর দু'জন—সুজন। সেই বিছানা থেকে উঠে কান খাড়া করে ঝুলন বুঝতে পারল কোথায় ধারে পিছে আড়বাঁশি বাজছে। কে বাজায়? কে বাজে! এ কিসের সুরের ঠেলা—কিসের খেলা! সরস্বতীর পাশ থেকে উঠে সে পা টিপে টিপে বাইরে এল। পৃথিবী এখন অন্যরকম। অন্য ইংগিত তার। আকাশগঙ্গায় ঢেউ লেগেছে। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে জীবনরহস্য উথলে উথলে ওঠে। সবাই ঘুমে চুপ—সন্ধ্যায় বাজাল মুচিরা, বিয়ে বাড়ির আনন্দে মদ খেয়ে হুঁস হারিয়ে ঘুমিয়ে গেল। নেতাইয়ের ঘরে বনসি। বুড়ো গুইরাম ঘুমচ্ছে রাতের টানে। পায়ে পায়ে ডোবার কাছে এসে সত্যি সত্যি ঝুলন দেখল শুঁড় তুলে বাগদা চিংড়ি জলের ওপরে উঠে এসে হিম খাচ্ছে। মোমবাতির মতো স্বচ্ছ মাছটির পিঠ—আর পেটের খোলের ডিম, নরম মিহিদানার মতো গরম হয়ে আছে। এই চিংড়ি দৃশ্য কেউ বিশ্বাস করবে না—বলবে যতসব আদিখ্যেতা এই ঝুলন বৌয়েরই চোখে পড়ে। ঢপ—বাজে বোলচাল। ঝুলন আরো দেখল—চিংড়ির এই দাঁড়াদুটির মতো ধারালো নীল দুটি হাত একটি আড়বাঁশিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে মোহন বাঁশি বাজাচ্ছে। কে—কে ও—রমজান!

ঝুলন এগিয়ে গেল—আকাশ থেকে জ্যোৎস্না পড়ে লোকটা ভিজে সপসপ করছে। নিম্যুনিয়া হবে নিকি! লোকটা হাসছে নীরবে—আর বাজাচ্ছে। ঝুলনের শরীরটা কেমন করে উঠল। ঘাম দিতে লাগল। বুঝি বুক দুটিতে ঠোকাঠুকি লেগে ডম্বুরু বাজল—

বাঁশি থেমে গেছে।

এইসব দেখলে লোকে বলবে—অসব্য করচে। রমজান ঝুলনকে ঘরে তুলে নিয়ে গেল। বুকে পিঠে মুখে মুখ ঘসতে লাগল—ছাগল, কুকুর বা অন্য কোনো অসভ্য জাতের মতো। কিংবা ক্ষ্যাপা উন্মাদ ঝড়ের মতো। মাতাল লোকের তাণ্ডবের মতো। যেন এই একটি অসভ্যতার ভেতর দিয়ে মানুষ একদিন পৌঁছে যাবে মহা-মানবিক সভ্যতায়। এ জগতের কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে কে বলতে পারে। কে বলতে পারে মুচিপাড়ায় কেন মানুষ জন্মাল।

খানিকবাদে ঘর থেকে ছুটে বাইরে পালিয়ে এল ঝুলন। আলোছায়ার আবছা আঁধারে হারিয়ে গেল।

ছোট আট-হাতি লাল কোরা ধুতি টেনে হাঁটুর ওপর পরেছে দুই বুড়ো। শরীর

শক্ত, চেহারার আড়নটি দুজনেরই বেশ পাকা, পাকা পোক্ত। তবু হাতে বাঁশের লাঠি—বুঝি পুরাকালের কোনো ইংগিত এখানে রয়ে গেছে। ঠুক ঠুক করে দু'জন হাঁটছে। সকাল সকাল ভাত খেয়ে তারা বেরিয়েছে আনন্দপুর। রথ দেখতে যাবে।

গুইরাম বলল, কি হে চুপমেরে রইচো যে, কথা বলবেনি নিকি—

নন্দকিশোর মুখ তুলে চায়, বলে—কি আর বলি বল। ষড়যন্তর করে আমাদের রামুকে ত অরা প্রধানের পদ থিকা সরায়ে দিল। এখন আবার তমাদের রমজান, বনসি সেই ফাঁদে পা দিবে বলে আগুয়ান—হ্যাঁ গ খুড়া তুমি ভাব, আমাদের এই জাতটার কালে কখনো উন্নয়ন হবে—

গুইরাম হাসে।—সঙ্গীটির মুখের পানে তাকিয়ে সে বলল—অরা ত বলে, উ চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল—

তুমি মান—বিশ্বাস কর, উ শালারা হলো শয়তানের ধাড়। অদের মাথায় কত রকমের বুদ্ধি। যেদি ভাবে লোকের মাঝে কাউকে চোর দেখাবে সে অদের কতক্ষণের কাজ—

তমাদের রামাকেও বলি—

শুনচি—

তুই বাছা বড় হইচু—জ্ঞান বুদ্ধি হইচে—লোকে যা বলবে সেই কথাগুলি শুনবার আগে একটু ত মাথা খাটাবি—

বটেই ত।—

বিবেচনা করে তবে ত কাজ দেখভাল করবি। কত রকমের লোক থাকে এই জগৎ সংসারে। কত তাদের মতিগতি। তুই মুচি—জাতে ছোটটি হয়ে জন্মেচু। কর্ম করবি ভাল তবে ত দেশের পাঁচজন তর নাম করবে। নিকি গ—বেঠিক কিছু বলি নিকি আমি—একদিন রানীসড় থানি ঘুরতে ঘুরতে দেখা হয়ে গেল। আমি বননু—খুড়া-ভাইপোয় যে ঘনঘন দেখা। তারপরে কি সম্বাদ বল—। বার বার বুঝিয়ে বননু—ভাই দেখেচিন্তে পথ চলতে হবে তমাকে।

দাও ডিবা থিকা এখান পান বাই করে দও দিনি—খাই। একটুন কাচা সুপারি দিবে—

হ্যাঁ দিই—ত রামধন বলে—হ্যাঁ জ্যাঠা অভাব অসুবিদা কিছু হচ্চেনি ত। বলতে ভুলনি যেমন।

বটেই ত—এই একটি গুণ ছিল বলেই আজ ছ্যানার আমার এই হাল।

লোকের কথা ভাবতে ভাবতেই। যাক গে, যা হবার হইচে। ইবার দেখি না লুতন মুচি কেমন কাজ কারবার দ্যাখে—

উদিনে ত তুহীনবাবু কেশপুর থানি ওর সনে কথা বলতে এইচিলেন—

ত কি বলল তিনি—

বলল—এস ভাই আপোষ মিমানসায়। ঝগড়া করলে ঝগড়া বাড়বে। জল ঢাললে আগুনে, নিববে আগুন। যাতে তমাদের ভাল হয় তাই হবে। যাই বল নন্দ,—তুহীনবাবু লোকটার ব্যাভারখানা দেখবার মতো। ভাই দাদা বলে কমন সুন্দর করে কথা—

ত ভোট হবে আবার—?

না। সে কথা ত হলনি। জগুবাবু ত বলেছিল মুচিপাড়া—গেরাম গুড়েবাগান যাকে মাথা বলে দিবে, ধরে লিতে হবে সেই ভোটে দাঁড়ানো পঞ্চায়েত মেম্বরের মতোই জিতল। ঘন ঘন ভোট করলে তার ত খরচা আচে। নিকি—

সে ত বটেই। আচেই ত খরচা। কিন্তুন সে ত গরমেন্টের ঘরের টাকায় হবে। বিধান ত একটা আছে। একজন পঞ্চাত মরলে কিবা সরে গেলে ফের ভোট বসাতে হবে। সেই ভোট বলে দিবে কে হবে সঠিক লোক—

উ ত হল আইনের কথা। মানুষই ত তাকে সৃষ্টি করল নিকি গ। তেনারা নেকাপড়া জানা শিক্ষিত লোক, পাঁচজনে ভেবেচিন্তে যা করলো তাই মেনে লিতে হবে আমাদের। আমরা গো মুখ্যু, ভাল-খারাবের আমরা কতটুকু জানি বল—

ই কথা এখন বললে চলবে কি করে—

ক্যানে—

সে বুঝবে দাদা—আরও কিছু দিন যাউক তবে বুঝবে দাদা কত ধানে কত চাল। যার পেটে যত বিদ্যা—সে তত শয়তানের ধাড়—দেখলম ত এতগুলান বছর ধরে—য্যত শুনবে অদের কথা অরা তমার ঘাড়ে চাপবে ত্যত। আমি বলি কি জান—

কি—

অরা হল গে আসলি ভূত। লোকের ঘাড়ে চাপাতে পারলেই হল। এবার গাধার মতো তুমি ছুটনা—বাবু বসেচে ঘাড়ে—

ই ত ভাই চিরকালের কথা—।

এই হবে, সেই হবে, উই হবে—কুথা গেল সব। কি হলো এই গাঁয়ের। বল—কুনো দিকে কুনো আশার আলো দেখেচ তমরা। তা দেখবেনি। য্যত

দুধ এসে বটে—সব খায় ঐ বেড়ালেরা। হুতকা ব্যাড়াল—ভাত খাবে, মাছ খাবে, দুধ খাবে তমারই সমসারের, আর খেয়ে-দেয়ে হেগে দে যাবে তমাদেরই ঘরের এদালে কেদালে। লাও, এবার সামলাও ঠেলা।

কাঁকুরে লাল মাটির ধুলো হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক দুটি বুড়ো আধুনিক মোরাম বিছানো একটি লাল রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিল। কত রকমের কথা তাদের। একাল সেকালের তরঙ্গার লোকচরিত্র। সময় সুলুক। দুজনেরই হাঁটু দুটি উঁচু হয়ে আছে—ভাঙছে নামছে হাঁটার তালে তালে। উল্টানো কাঁসার বাটির মতো গোল, লৌহ চরিত্রের।

এক একটি গাঁ পেছনে পড়ে যায়। মুচিপাড়া থেকে বেরিয়ে দুটি মানুষ ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো নন্দকিশোর—নাতিদের জন্য মিঠাই কিনবে। মালপো কিনবে। আম, গন্ধরাজ ফুলের চারা কিনবে। মুচিপাড়ার চার তরফে কোনো ডোম পল্লী নাই—তাই লেবীর জন্য চাল ধোয়া একটা চাঙারি কিনতে হবে তাকে। গুইরাম অন্য জাতের মানুষ, তার কোনো নাত-নাতনি নাই। সে চলেছে ভিড় দেখতে। কালে কালে সেসব ত চলে গেল সবকিছু। রথের দড়ি টানতে হবে একটু। পরকালের কথা এক এক সময় তার মনে আসে ত, চোখ চকিতে চলে যায় আকাশ পানে। তারপর জের নেমে আসে মাটিতে। আর একটি গোপন ইচ্ছা নিয়ে সে চলেছে রথের মেলায়। কোমরের খুঁটে বাধা আছে একটি দশ টাকার নোট। হাঁটতে হাঁটতে সে ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখে। নন্দকিশোর বলে—

কত বছর যে হয়্যে গেল—কাঁঠাল খাইনি বুইলে ত—

ক্যানে অম্বাবতীর দিনে খেলেনি, ক্যানে—

এখটা যা দাম—৮ টাকা ১০ টাকায় কমতি ফল নাই। আর দ্যাখ এই কাঁঠালই আমি টাকায় চারটা কিনেছিনু—

ত আজ ইকটা কিনে লিও—

দুর! টাকা কুথায়। সব ত হিসাবের মধ্যেই আছে। যারা টাকা দেচে মাল তাদের, আমি শুধু বইবার পার্টি—

অ—

তুমি কি কিনবে—লোতন কাপড়?

দু! দু! লোতন কাপড়—টাকা কি গাছের পাতা নিকি। আমি যাই বুটি—ভগমানের দরশন পাবো এই আশায়। সারাটা জেবন ত গরুর খাল ছাড়ালম। পাপে পাপে গায়ের রঙ দেখ—কেমন মোষের মতো কালো।

বুড়ো দুটিই এতকাল খুব সাধারণ বুড়ো হয়েই ছিল। কিন্তু রামধনকে সাসপেণ্ড করার পর এবং রমজানের সেই জায়গায় নব নিযুক্তির পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। মৌখিক ব্যবহারে তাদের মধ্যে যতই হৃদ্যতা থাক না কেন, ভেতরে একটা খাড়াখাড়ির ভাব জেগে উঠল। গুলিখেকো বাঘের মতো নন্দকিশোরের বুকের ভেতর রাগ, জ্বালা গরগর করছে। রমজান গুইরামের পরিবারের বন্ধু—তাই নন্দকিশোর যেন সময় সুযোগ পেলেই গুইরামকে একহাত নেবে, এই তার মনের খেয়াল। রমজানের এই উত্থানের পর গুইরামও ভাবতে চায় যে রমজান তার কাছের লোক, ঘরের বন্ধু—অমনি তার মন খানিকটা অযৌক্তিকভাবেই রামধন, লেবী, তার ছেলে মেয়ে আর নন্দকিশোরের ওপর তিক্ত হয়ে ওঠে। যেন একজন আরেকজনের শত্রু। ভেতরের শত্রুতাটি কিন্তু ওপর থেকে দেখে বোঝা যাবে না—মানুষ চরিত্র যে রহস্যে ছাওয়া থাকে এখানেও তার কোনো কার্পণ্য নেই। মনকলসির মুখটা একটা মালসায় চাপা দিয়ে লোক দুটি ভাব-বিভাবের কথা বলছিল তাই। সেই কথার মধ্যে মাঝে মাঝে এসে পড়ছিল মুচিপাড়ার হালফিল সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির কথা। একদল ভোগ্য হয়—আরেক দল ভোগ করে। একদল ভাগ করে, আরেক দল ভাগ হয়। পৃথিবীর নিয়ম খুব স্বাভাবিক হয়ে মানুষের মাঝে আসে। বিষুবরেখার সেই আলোয় তাই মুচিপাড়াতেও চরিত্রের কোন হেরফের হয় না—এ চরিত্র ব্রহ্মাণ্ড চরিত্র। তাই এর থেকে গুইরাম, রামধন, রমজান, বলাই, কি ঝুলন কারো কোন নিস্তার নাই।

রথের মেলা থেকে ফিরতে ফিরতে ওরা এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আধকাটার পোলের ওপর। আঁধার রাত। তবু তারা ভরা—তারও একটা আলো আছে। সেই মরা ভৌতিক আলোয় দুটি বুড়োকে যেন একই রকম লাগে। একজন আরেক জনকে বলে—নন্দ—এই নন্দকিশোর—

কি হলো—কি—

একটা কথা ছিল—

কি কথা—

আমার ব্যাগে আচে—অনেকদিন হয়নি তাই ভাবলম, এই শিমূল গাছের ছায়ে বসে যেদি একটুন—

না ভাই বয়স হলো ঢের—

ত কি হইচে, সখসাধ থাকবেনি—

ঘরকে যেদি যেতে না পারি—

আরে ভাই আয় তো—ভয় করলেই ভয়। দু জনা আছি ভয় কিসের—

এই বলে শিমূল গাছের তলায় গিয়ে গাছের প্রকাণ্ড শেকড়ের উপর বসল দুই বুড়ো। গুইরাম ব্যাগের ভেতর থেকে দুটি বোতল বের করল। শুঁড়িখানা থেকে কেনা—বোতল দুটির মুখ খড়ের ছিপি দিয়ে আঁটা।

উঁ-হ্—গন্দ দেখেচ—

একেবারে তাজা জিনিস—

কুনটা ভাল মাল—কুনটা খারাব সে আমি গন্দ শুঁকলে টের পাই—

আর কি আচে—

ছোলা—ছোলা ভাজা—

বাহ্—দেকে কে—

তবে বল দিনি—দু ভাইয়ে মিলে খেয়ে দেয়ে হাঁটবো। ক' মাইল হবে আর—মাইল তিন ?

ঐ রকমই হবে—

কি এতসব ডালপালা কিনে লে যাও। লাও ঢাল গলায়—

ঝাঁঝ—

ঝাঁঝ হবেনি ত কি মিঠা লাগবে, ই কি আর দুধ নিকি ! মদ জিনিস—

এক ঢক গলায় ঢালতেই—নন্দকিশোরের জলনলিটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বালা করে উঠল। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—বলে যেন সে বোতল গুইরামের হাতে দিয়ে দেয়—আর পারবুনি।

ময়লা শাড়ির মতো ম্লান অন্ধকার। গুইরাম যেন সেই অন্ধকারের অন্ধ আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বোতলটি নিল। নিজের বোতলটি শেষ করে এবার ঢালল অন্য বোতলটি। গলায় ঢালতে লাগল—সে শব্দ যেন রথের চাকার গড়গড়ানির মতোই ধাঁ ধাঁ করে ছুটে চলল ভেতরে। রক্তে, মাংসে মজ্জায় ঢেউ লাগল।

এই দেখাদেখি মন কি জানি কি বলল—নন্দকিশোর বলল, শেষ তলানিটুকু আমাকে দিও যেনে—

খাবে। খাওনা—ভালো ত—

নেশা হবেনি—

নেশা—সেকি অত সস্তার নিকি গ—যে দু গলা ঢাললেই হবে। একদিন ছেল যে আমি ১০ বোতলও ঢেলেচি গলায়—

সে বয়স কি আর আছে রে দাদা—ঘরের লোক ঘরকে ঘুরতে হবে ত নিকি—

এত কথা বলে কয়ে কিন্তু একটু পরেই বেভুল বলতে লাগল গুইরাম। ভয় পেয়ে গেল নন্দকিশোর। গুইরাম আর গাছের তলা ছেড়ে উঠতে চায় না। বলে, আরে বসই না দু মত্তর। যাবই ত ঘরে, যাবনি ত যাব কুন চুলায়। রাত বাড়ে—বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়ার আগে গুইরামের শেষ কথা—সে গাইছিল—জলে পুড়ে মলল রাধা যৈবনো জ্বালায়—

আহা—যৈবন জ্বালায়—

বিদেশবিভূমে গিয়ে নিজের লোকটি মরলে সংসারের মানুষ যেমন মড়া আগলে একা বসে থাকে, তেমনি নন্দকিশোর মাতাল আগলে বসে রইল। কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করল তার মাথার ভেতরটা কেমন যেন করছে। কি করছে, কেমন করছে তা কিন্তু বুঝতে পারল না। মনে পড়ল সেও তো তিন গলা খেয়েছে। এইসব ভাবতে ভাবতে গায়ে গতরে টান অনুভব করল—শুয়েও পড়ল গুইরামের পাশে। কখন বৃষ্টি হলো, কখন বাদলা হলো—শুতে গিয়ে কাদা লাগল কিছুটা। বমিটিকে কাদা ভেবে তারই ওপর শুয়ে পড়ল নন্দকিশোর।

গভীর রাতে চাঁদ উঠল জামবাটির মতো গোল হয়ে। পথ চরা কুত্তা এসে নন্দকিশোরের গামছিখানা খুলে মেঠাই, মালপো খেল। ঠ্যাং তুলে বে-আক্কেলে মানুষদের ওপর মুতে দে গেল।

বর্ষা চলে গেল, পৃথিবীকে দিয়ে গেল নতুন মহিমা। মুচিপাড়ার মরা, আধমরা, ঝলসে ওঠা গাছগুলি আবার নব রঙ্গে নেচে উঠল। রাহুমুক্ত ঘাস মাথা তুলল। মৃত্যুর অনন্তে তলিয়ে গিয়েছিল যে খাল মধুমতী, আবার তা নবপ্রাণরাগে বেজে উঠল। আকাশে নীল লাগল, সূর্যে লাল লাগল, চাঁদ ফিরে পেল হারানো যৌবন। বছর বছর মুচিপাড়ার এই একই ইতিহাস। ঘুরে ফিরে ফিরে আসে। আকাশ থেকে আগুন পড়ে, জল নামে, তারপর শুধু ভালোবাসা ঝরে। মাঠ গর্ভবতী হয়—তারপর খালাস পায়। জীবজগৎ জন্মায়, তারপর মৃত্যু আসে। পুবমোয়াড়ি হাওয়া পশ্চিমে যায়—উত্তরায়ণের বাতাস দক্ষিণায়নে ঢেউ তোলে। জগৎ ঠিকই আছে, শুধু পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে মানুষ। উলটোপুরাণের নিয়মে শুধু নিত্যপূজাপদ্ধতি পাল্টে যাচ্ছে। পূজা মানে ফুল বেলপাতা নয়, মানুষের বন্দনা। কখনো পাঁকে কখনো চন্দনে ধোয়া যে মানুষের জীবন, সেখানে শুধু কালের হাওয়ায় মহাভারতের পাতা উল্টে যায়। কখনো রাজা বদল হয়, কখনো মন্ত্রী বদল হয়—কিন্তু প্রজারা একই

থেকে যায়। হাহাকারে, কান্নায়, আনন্দে, দুর্ঘটনায়—প্রেমে হিংসায়—অভাবে প্রাচুর্যে মৈথুন চলে। সেই একই পৃথিবীর নিয়মে মুচিপাড়া বয়ে চলেছে, শুধু বাঁক পাল্টানো পুরনো আদ্যিকালের নদীটির নতুন ধারাটিকে দেখে মানুষ ভাবল কাল বদলেছে, জগৎ বদলেছে। আমরা মুচিরা আর সেকালে নেই—নতুন কালের আধুনিক মানুষ আমরা। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা আকাশ-বাতাস ঠোঁট টিপে হাসল। সে শুধু বিদ্রূপের হাসি নয়—বরং বেচারীর জন্য মায়া। মহাজগতের এই হাসিতে নিত্য শুধু মানুষের জন্য সহানুভূতি উথলে ওঠে—মুচিপাড়ার লোকজনেরা তা টেরও পায় না।

জবা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সাত সকালে এই কান্নাটি শুনে ঝুলন হাঁ করল—কি হলো লো—

জল যায়নি গলায়—

অ। তা কি করবি বল—ভগমানের জিনিস, সে এতকাল রেখেছিল তদের সনে। ইবরে তার কাছে ডাকার খেয়াল হলো—তিনি ডেকেচে। কাঁদিসনি চুপমার—

হ্যাঁ দ্যাখ—কত লাথঝ্যাঁটা মেরেচি—কত কথা বলেচি বিনা কারণে। সকাল-বেলা শুধু চোখদুটি তুলে তাকাল—রস কেটে জল নামে—কথা নাই মুখে—

কি করবি বল—ই কি আর তর হাতে। মা কি তর একলার—সে ত জগৎ সনসারের সবার রে—

দুটি ভাত বেশি খেত—মুখ ঝামটা দিতম, ই পাপ আমি রাখব কুথায়—

চুপমার। চুপমার। হ্যাঁ লো কাঁদলেই কি সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে!

জবা চুপ করে যায়—একেবারে নীরব। চুপ। স্থির।

ঝুলন তার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল, লে খাটে গে বাসি বাসনকোসন যা আছে এইবেলা মেজে লে। ছ্যানাপ্যানারা যদি কিছু খেতে চায় ত খাইয়ে দাইয়ে রাখ। পরে তো আবার রাঁধতে খেতে নাই।

সেদিন সুমন্তর বিয়েতে হাবিজাবি খেয়েছিল জবার শাউড়ি গিরিবালা। আকালের পেট হলো গে পুঁটিমাছের পেট। ভরতেও যতক্ষণ ছাড়তেও ততক্ষণ। সেদিনই ভেদ বমি উঠেছিল ভোর রাতে। হেগে-মুতে রয়ে যাবার উপক্রম। নেতাই ছুটল গোকুল ডাক্তারের আস্তানে। তিনি ব্যবস্থা দিলেন ৪ দিনের—চার কুড়িং ৮০ টাকা। সেই ব্যবস্থায় তরল বাহ্যবমিতে একটা ধরতাইয়ের কাজ করল। সে যাত্রা বেঁচে গেল গিরিবালা—কিন্তু হজমের ঘরটি বুঝি ভাল রকমেই জখম হয়েছে

তার। যা কিছু খেলেই চোঁয়া ঢেকুর দেয়—টক জল উঠে আসে গলায়। বদহজমের ব্যামো। সামাল সবুর করে চলে ফিরে কটা দিন ত ভালই যাচ্ছিল। কাল রাতে আবার পেট মরা গাইয়ের মতো ঢোল হয়ে ফুলে উঠল। ডাক্তার এল—এত রাতে কেউ কি আসতে চায়! তায় মুচিপাড়া—রমজান আর বনসি টর্চলাইট হাতে গেল, ফিরে এল গোকুলবাবুকে নিয়ে। ব্যবস্থা পড়ল রোগীর মুখে। কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া গেল না। ভয়ে ভয়ে রাতটি কাটল। সকালবেলায় জবা বলল—জল যায়নি যে গলায়—ওগো কি হবে গো—

জীবনের সমস্ত কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে গিরিবালা যখন শেষযাত্রায় ধুঁকছে, আকাশ থেকে নেমে আসা অদৃশ্য সুতোয় ঝুলছে তার দেহটি—একটু পরেই ধপ্ করে খসে পড়বে, ঠিক এমনিই এক সময় রেনুবালার তেইশ দিনের সদ্যজাত কন্যা-সন্তানটি হাসিমুখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেয়ালা করতে থাকে। জল জল করে তাকায়, হাসে, ট্যাঁহ ট্যাঁহ করে কাঁদে, কখনো মুতে মুতে ভাসিয়ে দেয় রেনুবালার কোল।

একুশে—সেটেরা না ফুরালে ঘরবার হতে নাই। এই এককুড়ি দিনের ঘরের ভেতর কোল আগলে রেনুবালা শেকড় হয়ে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। ঘরে বসে বসেই সে শুনেছে রমজান ভোটে দাঁড়াচ্চে।

বলাই খুশী। নেতাই খুশী। বনসি খুশী। বাঁজা মাগী ঝুলনের দেমাক সাতগুণ বেড়ে গেল। কথায় বলে, বাবুর পয়সা হলো—রাঁড় জলকে গেল।—এই কথা মনে হতেই রেনুবালার গায়ে জ্বালা ধরল। নইলে মুচিপাড়ার মাতব্বর রমজান হলে ত সে খুশীই হতো। লোকেরটা ছাখে লোকটা। পরের সেবায় কাজে ডাকো ত এই একটি লোকই আছে গুড়েবাগানে, যে সাড়া দিবে। তবু পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের ভেড়েয়া হলে তাকে আর কে ভালো বলবে। সেই কারণে রমজান বিষয়টিকে রেনুবালা একটু ছোট চোখেই দেখে। আরো একটা বিষয় রেনুবালাকে দিনে দিনে শঙ্কিত করে তুলছে, সে দেখতে পায় পুয়াতি থাকার শেষ কটা মাস তার অনড় সময় থেকেই বলাই ঝুলনের সঙ্গে খুব রঙ ঢঙ করে কথা বলে। দেখলে অঙ্গ জলে যায়।

বলাই বলে—তোর কি মাথা খারাব? কি বল—ক্ষেপে গেলি নাকি—

উঃ। কিছু বুঝিনি নিকি—

কি বুঝেচু—

কি আবার। তুমি যেদি এইসব করতে থাক তাইলে আমি গলায় দড়ি দুব। মরব আমি। তমার হাড়ে বাতাস লাগবে—

আরে শুন—ওরে ও রেনু। যেত লোককে সন্দ করবি ত্যাত জলবি বিষে। মনটা অত নিচ করিসনি—

আর গলা তুলে গাইতে হবেনি। জানি জানি তমাকে। এত লোক মরে, মাগীর মরণ নাই—

চুপ করবি নিকি, মুখে খড়নুড়া গুঁজে দুব—এক মত্তর ঘরে শান্তিতে বসবার উপায় নাই—

কে আনতে বলেছিল? রেখে এসবে চল আমাকে বাপের ঘরে—

ওহ্—তোর বাপের কি সেখনে ধানের হামার বাঁধা আছে নিকি। যেনে রাজার দুলালি—

চুপ মারতে বললেই চুপব? হ্যাঁ বলে দিলম, ঐ মাগীর গায়ে যেদি ফের পড়তে যাও তবে আমার মাথা খাও। তমার মেইছেনাটার মাথা খাও—

রাগে গায়ের জ্বালায় মোরগ ঝুঁটির মতো থরথর করছিল রেনুবালা। কথাটি শুনে ততোধিক রাগে জলে উঠল বলাই, নিজেকে সামলাতে পারল না। ছুটে গিয়ে ঠাস করে একটা থাপ্পড় কসিয়ে দিল রেনুর গালে—যা মুখে আসে তাই বলবি। এক মাসও হয়নি ছ্যানার আমার। তুই মর না মাগী—তুই মর।

সাধারণ আর পাঁচটা মুচি পুরুষের মতো বলাই নয়। বউয়ের গায়ে সচরাচর হাত তোলে না সে। নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, ভীতু লোক সে। আজ নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সে যে চড়টা বসিয়ে দিল, তাতে তারই হাতের চেটো পোড়া ঘায়ের মতো জ্বালা করে উঠল।

সত্যি মুচিপাড়ার চরিত্র বদলাচ্ছে। এর আগে কোনো পুরুষ কোনো বউ মারলে—সে চিৎকারে গাঁয়ে কাক-চিল বসতে দিত না। আর আজ কিনা রেনু একটি কথাও উচ্চারণ করল না—শুধু চুপ হয়ে স্থির চোখে নিজের বরটির দিকে তাকিয়ে রইল।—ছেঁড়া চটের ওপর ছিল একটি সাদা ফ্যালনা—সেটিও ছেঁড়া-ময়লা, তার ওপর শুয়ে শুয়ে কচি সোনাটি পাখির ছানার মতো কাঁদতে শুরু করেছে। পাড়ার নতুন বউ সরস্বতী কোথায় ছিল দৌড়ে এসে কচিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—না গো না উম্‌ম্—

ছ্যানা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বগি এল দেশে

বুলবুলিতে ধানটি খেল, খাজনা দুব কিসে

এই বউটির এই একটি ধাত—দু পাত লেখাপড়া শিখেছে তা সে জাহির করবেই। একটু শহর ঘেঁসা হালচাল। ঠাটঠঙ—সে সুরেলা গলায় ন্যাকা ঢেউ

তুলে বলল—হ্যাঁ গ বলাইদা, বৌদিকে তুমি মারলে। বউকে আবার ভদ্রলোকে মারে নিকি গ—

আমি ভদ্র লোক লই। আর তকে মাথা গলাতে হবেনি। ঘর যা—

এই বলে বলাই রাগে গসগস করতে করতে বাইরে চলে গেল।

এমন সময় বোল উঠল—বলো হরি—হরি বোল। বলো হরি—হরি বোল। বলো হরি—হরি বোল।

আগামী পরশু গুড়েবাগানে ভোট। তার একটা তোড়জোড় চলছিল। বনসি, রমজান দিনরাত সাইকেল নিয়ে ছোটাছুটি করছে। জগু দনপাট প্রথমে বলেছিল—ভোটের আবার দরকার কি, পাঁচজনে বসে যাকে মাথা ঠিক করবে সেই হবে গ্রাম পঞ্চায়েত। আবার ভোটের হ্যাপা কেন! কিন্তু তুহীনবাবু অন্যরকম বললেন। শুনে যেন আকাশ থেকে পড়েছেন।—এ আবার কি কথা! ভোট হবেই। সেই থেকে দিন ঠিক হলো। কাজকর্ম শুরু হলো। কাজকর্ম বলতে আর কি, জিতবে রমজান একথা সবাই বোঝে। তবু একটা সাজন্ত ছবি জেগে ওঠে। এক সন্ধ্যায় রমজান বলল, বন্ধু—আমাকে কেনে; তোমার ত ইচ্ছা, তুমি হলেই পারতে—

বনসি মুচির চোখ ঘন হয়ে উঠল। স্বপ্নের একটা মৃদু ঢেউ শরীরে তরঙ্গ দিল—কে বলল, বন্ধু আগে আগে তুমি যাও। আমি যাব পিছনে পিছনে। তুমি থাকলেই আমার থাকা হবে—

আমি বাউণ্ডুলে লোক—

গাঁয়ের লেগে খাটবে। দেখবে লোকজন ভালবাসবে খুব। বল এই জিনিসটির জন্যই ত এত যুদ্ধ এই জগৎ সনসারে—

গাছে তুলে পরে মই কেড়ে লিবেনি ত? নাকি তোমাদের কুনো কু মতলব আছে। থাকে ত আগে বাগে বল। হুঁসার হয়ে লি—

বনসি সহজ মনের দরাজ গলাটি খুলে হেসেছিল। ঠাট—ল্যাখরা—রসিকতার হাসি। প্রেম ভালোবাসার হাসি। দুই বন্ধুর বহুদিনের সম্পর্কের মোহনায় যেন ঢেউ লাগল।

সেই বনসি, রমজান, নেতাই, বলাই সবাই মিলে নিমগাছে চোট দিয়ে ডাল নামাল। জালাগোড়ার ধারে শ্মশানবনে চিতা সাজান হলো। কোদালে করে চুলায় সাফাই দিল নেতাই।

বেলা তখন মধ্য গগনে। একটু একটু করে ঝুলছে পশ্চিমে। নেতাই বুড়িকে চিতায় তুলে মুখে আগুন দিল।—বলো হরি, হরি বোল—

মুচিপাড়ায় তখন কান্না ছুটছে স্রোতের মতো। গানের ধারার মতো, পাখির কুজনে সুজন গলা মেলাল—ওগো মা গো, তুমি এমন করে কি করে চলে গেলে গো—তমার জন্য যে—আমরা কিছুই করতে পারিনি গো—একদিন তুমি আলুর চপ খেতে চেয়েছিলে গো—ছেঁড়া কাপড় পরে পরে দিন গেল গো—কিন্তু তমার মুখের হাসি যায়নি গো। ওগো মা গো—হঠাৎ করে এমন ফাঁকি দিবে আগে যেদি জানতম গো—। তমার ছেলাটি মা-হারা হলো গো—ওগো মা গো—

নেতাইয়ের বউ শুরু করেছিল যে কেঁদো পালাটির তা ক্রমে সংক্রামক রোগের মতোই ছড়িয়ে গেল সারা মুচিপাড়ায়। একে একে লেবী, জবা, সরস্বতী এসে যোগ দিল। এমন সময় দূর-দূরান্ত থেকে এসে পৌছল নেতাইয়ের ছোটবোন শঙ্করী। সে শুরু করল—ওগো কালানি গাই গো—তমার দুধ খেয়ে খেয়ে যে আমুরা মানুষ হলম গ—আর আজকে তুমি কুথায় গেলে গো। একবার চোখ চেয়ে দ্যাখ—তমার শঙ্করী এসেচে গো—ওগো মা গো—

চড়চড় শব্দে কাঁচা নিমকাঠ জলছে। খোঁচনা কাঠি দিয়ে খুঁচছে রমজান। বনসি।—নেতাই দূরে একলাটি বসে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আর কটু গন্ধে চারদিক থেকে একটা হাহাকারের লীলা যেন খেলে বেড়াচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। মুচিপাড়ার আজ অন্য এক চেহারা।

এ পাড়ার দুই বুড়ো গুইরাম আর নন্দকিশোর ডোবাধারে বসে ছিল। এমন সময় বুড়ি গিরিবালার মাথাটা ফট করে ফাটল। চমকে উঠল দুজন—কে যেন গলা ছেড়ে ডাকল। চমকে ওঠা এই মুচিপাড়ায় এই প্রথম নয়, তাই এই দুই বুড়োর ব্যাপারটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল না। বুড়ি পুড়তে লাগল। একজন বুড়ো আরেকজনকে বলল—এরপর আমার পালা—ভোররাতে আমি ডাক শুনতে পাই—

আরে দু'দু—এবার আমার টিকিট—

তুই ত ছোট—আমার পরে এসেচ—

তায় কি হলো। ই কি কেরাসিন তেলের লাইন নিকি যে আগে এসবে সে আগে পাবে—

তিনবার ত আমি মরতে মরতে রইলম। এবার যাব—

ঠিক আছে দেখ—কে আগে যায়। আর ভালোলাগেনি আমার।

আমারই কি ভালো লাগে, লাথঝেঁটা খেয়ে শেষ কটা দিন। ব্যাটাটি যে কুথায়, কুন মুলুকে পালিয়ে গেল। পেটের ভাতটাও যদি জুটত। এক এক দিন উপাস দিতে হয় দাদা—

অভাব আর কুন সনসারে নাই বল—এসেচ যেখন তমাকে অভাব পুয়াতেই হবে—

তাই ত যেতে খুঁজছি।—

চাইলেই যেদি জুটত—তবে ত সবাই এই নরকযাতনা থেকে মুক্তি চাইত তেনার কাছে। তিনি দিবে তাকেই, যার যাবার সময় হইচে। যাব যাব করে মাথা খুঁড়লেও খিড়কির দরজাটি ভাই খুলবেনি—

বুড়ির মজ্জা মাংসে তেজ ছিল কিছু। গায়ে গতরে যে মাংস ছিল তেমন তা কিন্তু নয়। শুধু তেজেই বুড়ি পুড়ছে এতক্ষণ ধরে। সন্ধ্যা অতিক্রম করে গেল। আকাশে ক্ষীণ অন্ধকারের ভেতর চাঁদ উঠল। ঝুলন একা একা ঘরে থাকতে ভয় পাচ্ছিল। কতরকমের ছমছমানি থাকে মানুষের বুকে। এই ক'দিন আগে যে জীয়ন্ত মানুষটা ঘুরে বেড়াত, কথা কইত সবার সনে—সত্যি জীবনটা কেমন যেনে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ঝুলন চলে এল বলাইদের ঘরের দিকে। শরীর খারাব ছিল, তাই সে শেষ পর্যন্ত থাকবে না—এমনি কথা শুনেছিল সে। আজ সকাল থেকে রেনুবালার মুখেও কোনো সাড়া শব্দ নাই। ঘর থিকা সব গেল কুথায়—

যাবে আর কোথায় রেনুবালা—এই মানুষের সনসারে একবার যে মাথা গলিয়েছে, নাম লিখিয়েছে, সে কোথায় যাবে! তার কোথায় যাবার জায়গা! হ্যাঁ, ঐ এক গিরিবালার পথ। তার জন্যও তো সবুর চাই। বরের হাতে মার খেয়ে রেনুবালা তাই ভেতর ঘরে একটা খেজুর পাতার চাটাই পেতে মনের দুখে শুয়েছিল। মার খাওয়ার কথা ঝুলন জানতো—এক এক সময় এর জন্য নিজেকেও তার দোষী বলে মনে হয়। তাই ভাবল আজ সে রেনুকে বুঝিয়ে বলবে—ওলো মাগী, তর ভাতার আমার যে ভাইয়ের মতো রে। ই তর কেমন সন্দর ধারা—

এইসব ভাবতে ভাবতে ঝুলন অন্ধকারে ঘরের ভেতর ঢুকল। আলো জালেনি কেউ। বিষ আঁধার ছড়িয়ে আছে গৃহে, ভুবনে।

বলাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুলুঙ্গিতে বাতি জালল। সে এইমাত্র ফিরেছে—আর দু মুঠো মাংস পুড়তে বাকি। সে চলে এল—শরীরটা ভাল বুজায়নি। ঝুলন বলল, রেনু কুথায়—

ওই হতায় শুয়ে আছে—

এই বলে বলাই আঙুল বাড়িয়ে যেদিকটা নির্দেশ করল সেদিকে অন্ধকার। ডিবরি বাতি না তুলে ধরলে অন্ধকার ঘুচবে না।

সেই আঁধারের দিকে এগোতে যাচ্ছিল ঝুলন। একটু আগে যে ঘন ডোম-

চিলের মতো আঁধার ছিল—এখন আলো জালার সুবাদে তা ফিকে হয়ে উঠেছে। যেমন পুকুরের এ পারের গাছে শিউলি ফুল ফুটলে ওপারে তার গন্ধ পাওয়া যায়—তেমনি পৃথিবীর কোথাও আলো জললে অন্য আঁধার আবছা হয়। এগোচ্ছিল ঝুলন। ডিবরি বাতিটি কুলুঙ্গিতে রাখার জন্য হাত বাড়িয়েছে বলাই—নিচে রাখলে দমকা হাওয়ায় নিভে যাবে। এমন সময় বোল উঠল—শ্মশানধারের খালবিল গাছপালা নদীনালা আকাশ ডেকে উঠল—বলো হরি—হরি বোল। বলো হরি—হরি বোল। বলো হরি-ই-ই—হরি বো-ও-ও-ল

ভয়ে চমকে গিয়ে ঝুলন চকিতে বলাইকে জড়িয়ে ধরল—ওমা-গো—

মাগীর গলা শুনে রেনুবালা উঠে এসে দাঁড়াল সামনে। ততক্ষণে ঝুলন সম্বিত ফিরে পেয়ে সরে দাঁড়িয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। খর তীব্র চোখে রেনুবালা একবার বলাই আরেকবার ঝুলনের দিকে তাকাল। কিন্তু কোনো কথা বলল না। যেখানে শুয়েছিল সেখানে ফিরে গেল ধীর পায়ে। ঝুলন বলতে গেল—ওলো রেনু শুন—

বাধা দিল বলাই। বলল—এখন থাক। রেগে আছে। সকালে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এক থাপ্পড় দিয়েছিলম; সেই থানি মুখের কবাট বন্ধ দিয়েচে। কথা বলবেনি। রাগ পড়ুক—

শ্মশানে জল ঢেলে ওরা ফিরে এসেছে। হাতে মাটির ভাঁড়ে ঘিয়ে ভাজা বুড়ির নাইকুণ্ডু। বনসি নাম ধরে ডাকল—কুন দিকে গেলি গ? অ ঝুলন—

ঝুলন তরসতরি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল।

গভীর রাতে গাঁয়ে চেঁচামেচি উঠল—রেনুবালা বিষ খেয়েচে—

ভোটে তেমন কোনো উত্তেজনা থাকে না আজকাল। মানুষ বড়ো বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বামফ্রন্ট জমানায় প্রায় অধিকাংশ গ্রামে ভোটের চিত্র এক। সেই চিত্রের মতোই গুড়েবাগানে ভোট হলো। নাম-কে ওয়াস্তে ভোট—বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছিল সে পেল ১৩টি ব্যালট পেপার। তার পরিবারের লোকজনেরা, আর একটি ঘর। সবাই যা জানত তার কোনো হেরফের হয়নি—জিতেছে রমজান।

বেন্দাবন ঘোষ একদিন রমজানকে ডেকে মাছ মাংস করে খুব খাওয়াল। কি ভাই—তমার সাহস আছে বটে। পরের উপকারটি করতে জানো—দেখ ভায়া, ই গেরামের কথাটা একটুন ভেব। মানসের কথা মনে রেখ। দেখবে তমার ভালো হচ্ছে—

রমজান বুদ্ধিমান, তাই সে প্রথম থেকেই চিনে ফেলেছিল এই লোকদের চরিত্র। তবু বোলতার চাকে ঢিল না ছোঁড়াই ভাল—। সে বলল—সব বাবু আপনদের ইচ্ছা। আশীর্বাদ। তা যদি পাই দেখবে—কেরমে কেরমে ই গাঁয়ের উন্নতি হবেই। রাস্তাঘাট ভালো হবে। ইস্কুল বিল্ডিং মেরামত হবে, মাঠে ভালো ধান ফলবে—

নবা ঘোষ বলল—হঁ ভাই। সে তমাকে যবে প্রথম দেখলম তবেই বুঝেছিলম—তুমি করিতকর্মা লোক আছ। নিজেও করবে—অন্যকে দিয়েও করাবে—। তা হ্যাঁ গ রমজান—শুনলম রামধন নাকি গাঁয়ে আবার ফিরে এসেচে। তা ফিরবেনি ত যাবে কুথায়। কুন চুলায়। তমাকে বলি ভাই, সে বেচারার উপর আবার শোধ তুলতে যেওনি। ক্ষমাটাই বড়ো কথা। নাকি তমার রাগ আছে?

না—রমজান কথাটিকে না বাড়িয়ে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল। তারপর বলল—আমি তাইলে যাই। একবার কেশপুর যেতে হবে। তুহীনবাবুর ডাক আছে—

তা যেমন মনে হবে এই দাদাদের। চলে এস ভায়া। গল্পগাথা হবে। একটু চা জল হবে—। এই বলে বেন্দাবন ঘোষ চোখ ছোট করে হাসল। তারপর বলল—ও হ্যাঁ একটা কথা, আমার মোহনসালের পোতাটা কিন্তু এখনো বাকি আছে। ৬ বিঘার ছিয়া। একদিন জনাদশেক হলেই টেনে রুয়ে দিতে পারবে। টাকা নাই ভাই। বেগার জুটিয়ে চাষটা তুলে দিতে হবে। সবাইকে হাঁস মাংসের ঝোল আর ভাত খাওয়াব। দেখ ভাই, তুমি আমাদেরকে দেখবে—আমরা দেখব তমাকে। এই ভাবেই ত সংসারটা চলে নাকি—

এ কথার পিঠে রমজান কোনো কথা করল না। শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল।

কেশপুর পার্টি অফিসে বসে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলল। তুহীনবাবু আর জগু দনপাটের সঙ্গে বৈঠক। রমজান বুঝতে পারল—শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত সামলালেই চলবে না তাকে, হতে হবে গোটা কেশপুর থানা মুচি সম্প্রদায়ের নেতা। অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত অনগ্রসর সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইবের প্রতিনিধি। তাদের অভাব অনটন, দুঃখ দুর্দশার কথা যেন ঠিকঠিক জানতে পারে সরকার। অপরিকল্পিত ঐ জীবনকে পরিকল্পিত করতে হবে। তার সমূহ দায়িত্ব রমজান তোমার ওপর। তোমাদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সরকার হাজার রকমের প্রকল্প নিয়েছেন। অনুদান, ঋণ, জমি বণ্টন ব্যবস্থা। একদিকে যেমন নিজেকে সৎ থাকতে হবে, সৎ থেকে কাজকর্ম করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি পার্টি ওরগানাইজেশনকে জোরদার করতে হবে। যে অন্ধকার তোমাদের এতদিন ধরে গ্রাস করে আছে

তার থেকে নিজেদের মুক্ত করবে তোমরা নিজেরাই। এখন শুধু পথটা সঠিক চিনে নেওয়া।

মুহূর্তে মুহূর্তে রমজানের বুক আলাদা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। কাজ কাজ আর কাজ—বড়ো জীবনের জন্য যে আলাদা ভালোবাসা জাগে মানুষের বুকে, এতদিনে যেন নিজেকে তার এই প্রথম মূল্যবান বলে মনে হলো। সাইকেল চালিয়ে সে একা একা ফিরছিল গাঁয়ের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে এই দেহমনে যেন আলাদা রক্তের নেশা লাগে। মুচি থেকে ধীরে ধীরে সে মানুষ হয়ে যায়। শোনে—কানের পাশ দিয়ে যে অশান্ত হাওয়া ছুটে যায়, তা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—কি রমজানবাবু কেমন আছেন!

রমজানবাবু! রমজানবাবু! রমজানবাবু!—

গান এলো রমজানের গলায়। তার উদাসীন চুল হাওয়ায় উড়তে লাগল। সে দেখল চমৎকার রোদের সোনাঝুরি এই ভুবনময় চোখ-গেল পাখির মতো উড়ছে। এই পাখি একটি এসে বসলে পৃথিবীতে আর আঁধার থাকবে না। পদ্ম ফুলের মতো সকাল ফোটে দিগন্তে, গাঁয়ে গেরস্থে। সাইকেল হারমনিয়মের মতো বাজতে বাজতে এগোচ্ছে। সমস্ত দুঃখ, পুরুষ হৃদয়ের একাকিত্ব যে এই নবীন অসীমে হারিয়ে যায়। এক একটি মাঠ ছোট ছোট কাঁথার মতো হরেক মাপের, হরেক সেলাই তার বুকে। সবুজ ধানের ঝাড় গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষের মতো বড়ো হচ্ছে। এই পৃথিবী, এই জগৎ, এই ত্রিসংসারের নেতা রমজান এখন স্বপ্ন দেখতে থাকে ঘরে ঘরে কেমন অলৌকিক লীলার গুণে ভাত পৌঁছে যাচ্ছে। কাপড় পৌঁছে যাচ্ছে। অভাবের সোজনে গাছে রোগা কঙ্কালসার মানুষের মতো ডাঁটা না ফলে সাদা সাদা আতপ চালের মতো ফুল ধরেছে। একবার গাছে উঠে নাড়িয়ে দিলেই তলা বিছিয়ে যাবে সেই আতপ চালে। এবার বস্তা ভরে ভরে ঘরে তোল। শুভলক্ষ্মী ঝুলন শুকনো কাঠে রাঁধছে ভাত। বন্ধু বাজাচ্ছে ফুলুট। সুমন্ত তার বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে শহরে। চোখের সামনে ভেসে ওঠা সোনার জলে ধোয়া আলাদা এক মুচিপাড়াকে দেখতে দেখতে রমজান এসে পৌঁছল গুড়েবাগানে। গাঁয়ে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ে যে লম্বা পুকুরটি—রমজান দেখল তার পাড়ে একটি হেলে বলদ চরে চরে পরম সুখে ঘাস খাচ্ছে। রমজানকে দেখে সে বলে উঠল—কি রমজানবাবু—কেমন আছ?

সাইকেলটা স্ট্যাণ্ড করে মাটিতে নেমে এল রমজান—যেন আকাশপথ থেকে

অবতরণ। গরুটার গলায় হাত বোলাতে লাগল। আদর পেয়ে গরু নীল চোখ তুলে নীল মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল—

রমজান আরো আদর দিল—মুচিপাড়ার অবহেলিত মানুষদেরই মতো অবলা এই জীব। তার গায়ে শোষক বসে রক্ত চুষছিল—একটি একটি করে কেঁট পোকা গা থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ফেলছিল রমজান। আরাম পাচ্ছিল গরুটা।

সেখান থেকে রমজান এসে ঢুকল মনুষ্য-সমাজে—মুচিপাড়ায়। নতুন মুচি এবার নতুন নেতা হয়ে ঢুকল। বনসি বসেছিল দাওয়ায়। চোখ তুলে বলল—বন্ধু—কেশপুর থানি কি আনলে—?

কি আবার আনব—

মিঠাই। আমরা খাবনি—আমাদের মন খেতে খুঁজেনি নিকি—

ওহো হো—ভুল হয়ে গেল ত—

ঝুলন তমার তরে ভালো ভালো রেঁদে রেখেচে—

তাই নিকি—জানো ত বন্ধু। আজ অনেক কথা হলো পার্টি অপিসে। কত জনার সঙ্গে ভাব হলো সে আর কি বলব। ইবার মুচিপাড়ার চেহারাটাই বদলে হুব দেখ—

কাঁধে গামছা ফেলে চান করে এল রমজান। ঝুলন বাসি আকন্দ ফুলের মতো শুকনো চুমসানো মুখ করে আছে। মুখে তার মেঘ। চোখে ঘনঘটা, কিন্তু ঝরে না—

ভাত খেতে খেতে বনসি রমজানকে বলল, বউয়ের আজ মন মেজাজ ঠিক নাই—

কেনে কি হলো—

সি দিনের সেই রেনুর বিষ খাওয়া লে আজ আবার আরেকবার ঝকড়া উঠল—

রেনুবালা বিষ খেয়েছিল কিন্তু মরেনি। থাইমেট সার আনা ছিল ঘরে—মুচিপাড়ার বিলি বন্দোবস্তের সেকেণ্ড লটে বলাইকে দু কাঠা তিন ডেসমল জমি দেওয়া হয়েছিল। বলাই সখ করে সেই জমিতে ই বছর কাবেরী ধানের চাষ দিয়েছে। রাসায়নিক সার না ঢাললে এই ধান ভালো ফলতে পারে না। ৪ কেজি থাইমেট কেনা হয়েছিল গাছের গোড়ায় লিকান-কুড়ানে দেবার জন্য। সবটা লাগেনি। রান্না দুয়ারের মাচানে পালি ঠেকায় তোলা ছিল কেজিটাক। ইচ্ছে, ফলবার সময় বিলে ছড়িয়ে দেবে—আর টেনে ফলবে কচি ধানের থোড়। বরের হাতে মার খেয়ে ভেতরে গুমরে গুমরে মরছিল রেনু। কথাও বলেনি আর বিষ মেঘ ঝরেও পড়েনি। তক্কেতক্কে ছিল সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা বলাই আর ঝুলনের জড়াজড়িটি নিজের চোখে দেখে আর রুখতে পারল না নিজেকে। বলাই ভাত

খেয়ে শুয়ে পড়ল—নেতাই ঘরে কাঁধকাঠ-শ্মশান বন্ধুদের জন্য নুচি তরকারি রেঁধে-ছিল। বলাই খায়নি—তার শরীর খারাব। ঘরে জামে ঢাকা ও-বেলার ভাত ছিল—পিঁয়াজ লঙ্কা কামড়ে কোনো রকমে গর্ত বুজিয়ে এক ধারে পড়ে থাকা মাদুরে শুয়ে গেল। রেনুবালার কাছে গেল না—পাছে সে খরখর করে। কিন্তু রেনুবালার বুকে বলাইয়ের এই আলাদা শোয়ার ব্যাপারটা বুঝি বিষম হয়ে বাজল। সে রাগে, অভিমানে, দুঃখে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে রান্নাশালের মাচান থেকে দু মুঠো থাইমেট নিয়ে মাটি গেলার মতো গিলে ফেলল—আর যায় কোথা। একটু পরে গলায় জলন জলতে শুরু করলে—নিজেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ওগো উঠ না গ—আমি যে রেগেমেগে বিষ খেইচি গ—এখন কি করে বাঁচাবে আমাকে গ। ছ্যানাটারই বা কি হবে গ—ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বলাই প্রথমে দিশাহারা। তারপর জেগে গেল গাঁয়ের সবাই। ভোর হবার আগে বনসি, নেতাই, রমজান আর সুমন্ত খাটের খাটিয়ায় ঝুলিয়ে রেনুবালাকে নিয়ে কেশপুর হাসপাতালের দিকে ছুটল। পিছে পিছে বলাই। একরত্তি ছ্যানাটি তাদের—সুমন্তর বউ সরস্বতীর কাছে রইল। সে কাচের বোতলে দুধ ভরে মাইপোষ লাগিয়ে শিশুকে দিল। মায়ের বুকের বোঁটা ভেবে বোকা শিশু খেতে লাগল আর হাসতে লাগল।

রেনু মরল না—ফিরে এল হাসপাতালের জল ভাত খেয়ে। শুধু জগৎ সংসারের কাছে ঝুলনকে মহা অপরাধী করে দিল সে। সেদিন সকাল থেকেই ঝুলনের মুখ সেই যে কালো হয়ে ঝুলে গেল—সেখানে আর নরম ফুটল না। সাদা মনে মেলামেশার জায়গা এই সংসার নয়। তুমি যত ভালোমানুষ হবে, লোকে লোহা-পুড়িয়ে তত দেগে দেবে তমার শরীরে। মরা মুখে আজ দুপুরে সে দাঁড়িয়েছিল আম গাছের ছায়ে। এমন সময় বলাই ঘর থেকে বেরিয়ে কলসি কাঁখে জল আনতে বেরল—। হাসপাতাল থেকে রেনুবালা ফেরার পর ঝুলন একবারও দেখতে যায়নি। এখন বলাইকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—ও বলাই—

বলাই প্রথমে চুপ ছিল। তারপর বলল—বলেছিলম—তুই আমার সনে কথা বলিসনি—তোর তরেই আমার মাথায় এই আগাস ভেঙে পড়ল—

রেনুবালার মা এসেছে রাজপিড়া থেকে। সে বলাইয়ের সঙ্গে ওই মাগীটাকে কথা বলতে দেখে বাইরে বেরিয়ে এল। ঝুলন বলাইকে বলল—কেনে আমি আবার কি করলম, আমাকে দুষছ কেনে। কারু মাথায় যদি কুবরা পোক ঢোকে ত আমি কি করতে পারি—

অমনি ঘর থেকে হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এল রেনুবালার মা, বলাইয়ের গুণের শাউড়ি। গলা খুলে বলতে লাগল—ওরে আমার সতি সাবিত্তি রে—নুতল মুচি নাকি কে তাকে লিলি লে। আর ক গণ্ডা লিবি রে বারভাতারী।

এই মুখ সামলে কথা কইবে, এই কথা বলে দিলম—

কেনে রে বনসি ভাতারী, বাপ ভাতারী, ভাই ভাতারী। আবার বলাই ভাতারী হতে চাউ। মদ্দি রাতে বজ্জাঘাতে মরবি—। ডুব দিয়ে দিয়ে যে জল খাবি সে জল তোর ইয়ের দিকে বেরাবে।

পোক পড়ুক তর মুয়ে—.

আমার মুয়ে কেনে রে—আমি কি তোর মতো তলের ভাত নুন দে খাই নিকি—

বনসি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বউয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যায়। বলাই কখন চলে গেছে জল আনতে। দেখতে পেলে বনসি হয়তো তাকে দু'কথা বলত—তর মাকে, নাকি কুন কুটুম এল—তাকে সামলা বলাই, নাইলে কিন্তুন একটা কুরুক্ষেত্তর ঘটে যাবে বলে দিনু। কিন্তু সে উপায় নাই। ঘরে ঢুকে ঝুলন এক মত্তর চোখের জল ফেলল ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে। তারপর মুচি দাড়ে নেয়ে এসে বাঁধতে বসল।

খেতে খেতে রমজান বলল—তায় মন মেজাজ খারাব হবে কেনে। একসন্নে থাকতে গেলে উ রকম ঝগড়া বিবাদ হবেই। সব কথায় অত মনে ধরালে চলবেনি। কত আঁচ-আগুন এসবে জীবনে, সেই আগুনে মন ধরালে পুড়তে হবে—যে পুড়বে ভুগবে সে—

কথা শেষ হলো না। ঝুলন চকিতে সাপিণীর ফণার মতো চোখ দুটি ছুঁড়ে দিল রমজানের দিকে। বনসি এ চোখের গহীন রহস্য ধরতে পারল না। শুধু রমজান বুঝতে পেরে উপভোগ করল মেয়েমানুষের ভেতরের জ্বালাটিকে।

সন্ধ্যায় পাড়ায় জুটল সবাই। পাড়ার সব মুচিরা। নেতাই, বনসি, বংকা ঢুলি, নিমাই রিশি, বলাই, রামধন, নন্দকিশোর, গুইরাম—একুনে প্রায় এক ডজন মুচি লোক। রমজান তাদের আশ্বস্ত করে বলল—আমাদের গাঁয়ে ই আঁধার আর থাকবেনি। এই গুড়েবাগান এবার গুড়ে গুড়ে ভরে উঠবে। মিঠা হবে। ঐ বেদখল জোরদারদের জ্বালাগোড়া এবার এই মুচি কুলির রিশি দাসদের ভিদরে বিলি বন্দোবস্ত হবে। ভূমিহীন নাম ঘুচাব তমাদের। সবাই ছ্যানাপ্যানাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি কর গো, মুখ্যু না থেকে অরা লেখাপড়া শিকুক। জেলা লেবেলের লোকদের

সনে আমার কথা হইচে, তারা বলেচেন—ঐ রিলিপে রিলিপে আমাদের পাড়ায় এসে কারেণ্ট ঢুকবে। আলো জলবে গাঁয়ে। তার আগে রিলিপটাকে বাড়িয়ে আগে পাড়ায় আনি। আমাদের পাড়ার মা বোনেদের সুবিধার জন্য নতুন একটি জলের কল বসাব ভাবচি গাঁয়ে। তমরা সবাই ধানের বীজ পাবে, আলুর বীজ পাবে সরকার থাকতে। মাছ চাষের জন্য লোন পাবে। ই বারের বর্ষায় বংকা ঢুলি তমার ঘর পড়ে গেছে, তমার ঘর তৈরির টাকা পাবে পঞ্চাত থেকে। টি আর এর টাকা—তমাদের উন্নতির জন্য সরকার যে টেমপুরারি রিলিপের ব্যবস্থা রেখেচেন সেইসব টাকা ইবার সত্যি সত্যি তমাদের হাতেই তুলে দুব। জি আর এর টাকাও তমরা পাবে—জেনারেল রিলিপ দেওয়া হবে। তারপর আরো একটা সুসংবাদ, তমাদের থেকা যারা একটুন পড়ালিখা করেচে তাদের চাকরি হবে। আমি সুমন্তর কথাটা বলে রেকেচি। এমনকি জেনে রাখ—এই খেজুরপাতার পাটি বুনবার জন্যও আমাদের পাড়ার মেয়ে বউরা কুটিরশিল্প খাতে টাকা পাবে। আর একটা কথা, পাটি দিনমজুরের রেট বেঁধে দিয়েচে। এতকাল তার ঠিকঠিক প্রয়োগ হয়নি। আট ঘণ্টার ডিউটি—মায় খোরাকে ১০ টাকা। ই ব্যাপারটায় তমরা কুনোরকমের আপোষ মিমানশায় যাবেনি। যারা ভাল ঢাক বাজাবে—পার্টি থেকা তাদের এক এক বছর দু জন করে ঢাকিকে ঢাক কিনে দেয়া হবে। আমরা সবাই সমমিলিত হয়ে কাজ কম্ম করব। যেখনই কুনো অসুবিধায় পড়বে কেউ আমাকে জানাবে। তমরা যেদি সবাই আমার পাশে থাক, ডাকলেই যদি রা দাও সবাই, তবে আজ এখনে বসে কথা দিলম—ই গেরামের উন্নতি আমি দু বছরের ভিদরে দেখাব।—

উপস্থিত সবাই রমজানের কথায় খুবই উৎসাহী হয়ে উঠল। হ্যাঁ—হুঁ—আমাদের একটা টিউকলের দরকার ত বটেই। ঘর পড়ে গেলে টাকা দিবে—বাহ্ এর তরেই ত বলেচে গরীবের সরকার। মাছ চাষের টাকা দিলে ত খুব ভালো হয়। লিশ্চই যা করবার সবাই জুড়ে মিলেমিশে কাজ করব। ই ত খুব ভাল কথা। দেখ দাদা রমজান—যে যায় নঙ্কায় সেই বেটা রাবণ। তুমিও আবার নিজের ভুড়িটিই বাগাতে লেগে পড়নি যেনে—এইসব নানা রকমের কথা বলছিল সবাই। রমজান বলছে—একবার যেখন পদে বসিয়েচ তখন দেখই না কেমন কাজ করি—

পাড়ার পাঁচজন বসে যখন এইসব কথা বলাবলি করচে তখন ঝুলন নিজের ঘরের দাওয়ায় একা একা বসে চাঁদ দেখছিল। দুধের সরের মতো মেঘ পাক খাচ্ছে আকাশে। মেয়েমানুষের গোপন মনের মতন ছুটে বেড়াচ্ছে সসাগরা পৃথিবীময়। লোকটা অমন কথা বলল কেনে—কত আঁচ-আগুন এসবে জীবনে, সেই আগুনে মন

ধরালে পুড়তে হবে—যে পুড়বে ভুগবে সে। এমন কথাটি বলল কেনে—কি ইংগিত এই কথাটির। বেশ কিছুদিন ধরেই, পার্টির কাজে লাগার পর থেকে ঝুলন লক্ষ্য করছে রমজান যেন আর আগের মানুষটি নাই। দিনে দিনে কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। মানুষের মন না মতি—এই জিনিসটিকে বড়ো ভয় ঝুলনের। জীবনে হাজার রকমের অভাব আর অসুখের ভেদরে থেকে সে যখন আধমরা হয়ে আছে, এমনি একসময় রমজান এল। লোকটার চোখ মুখের গরম হাওয়ায় মরে থাকা আঁচে আগুন এল আবার। তারপর মাখামাখিটা বাড়তে ঝুলনের মনে হলো—সারাদিনের দুঃখ-কষ্টের মাঝে এই লোকটি হলো তার আনন্দ। ঝড়। তার উৎসব। এই লোকটি কাছে এলে আরো কিছুকাল বাঁচতে ইচ্ছে করে ঝুলনের। লোকটির চোখে চোখ রাখলে যেন শরীরের ভেতর ঝুলন ফুলুট গানের গত শুনতে পায়। সেই লোকটি যেন ঝড়ের মেঘের মতো আস্তে আস্তে আকাশ থেকে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। মুখের খাতিরটি আছে ঠিকই—ভাব ভালোবাসার সেই হাতছানি চোখছানি, তাও আছে—তবু কোথাও যেন ফাঁকি। তা বোধহয় মনছানিতে। সেখানে বুঝি কোনো ডাক নেই। ঐ লোকটি রমজান—ঝুলনের কাছে আসল ঘরের মতো। অনেককাল খুইয়ে খুইয়ে শেষে এই লোকটিকে পেয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল ঝুলন। মনে মনে বনসি ফালতু, এই লোকটিই তার আসল লোক। নিজের মরদ। সেই লোকের কাছ থেকে যেন ধেয়ে আসছে অন্য এক হাওয়া—মেয়েমানুষের হৃদয় তার পূর্বাভাষ পায়। তাই এই নিশাভর রাতে জ্যোৎস্না তলে দাঁড়িয়ে তার বুক কু গাইতে থাকে। ই কি রাতের পাখি বাদুড়—যে রাতের ফলটি খাওয়া হয়ে গেলেই উড়ে যাবে।

খেয়ে দেয়ে পাড়ার সবাই যখন ঘুমিয়ে গেল, তখন সেই নিঝুম রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঝুলন। নেশার মতো এই রাতঘুম ভাঙে তার। রমজানের সঙ্গে মিলন হয়। কিন্তু বেশ কয়েকদিনের মতো আজও ঝুলন বাইরে বেরিয়ে এল—কেউ কোথাও নেই বাঁশি হাতে। ইদানিং এমন হচ্ছে। মাসখানেক আগেও মধ্যরাতে বাঁশির সুর শুনে ঝুলন বেরিয়ে আসত। এসে দেখত—জ্যোৎস্না থেকো মাঠের মতো প্রশস্ত ছাতি নিয়ে অপেক্ষায় আছে রমজান। তারপর নিশুত রাতে মানুষের চোখের আড়ালে চলত চুরির খেলা। ইদানিং ঝুলনের ঘুম ঠিকই ভেঙে যায়—চারদিকে তাকিয়ে সে দেখে পৃথিবী বান্ধবহীন। চাঁদের ওপর মেঘের কালো ছায়া লাগে। এক একদিন সে এগিয়ে আসে রমজানের ঘরের দিকে, জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখে লোকটা ঘুমে কাদা। আবার কোনোদিন দেখে লোকটা ঘরে নেই।

তার মানে ফেরেনি—এমন হামেশাই হয়। আজ ঝুলন ঘরের মুখে এসে দেখল দরজাটা খোলা—হাওয়া ঢুকছে। লোকটা ঘুমিয়ে। ঝুলন ঢুকে গিয়ে বুকের উপর হাত রাখল। বুক উঠছে পড়ছে। ঝুলন ঠেলা দিল—ঘুম ভেঙে চোখ তাকিয়ে দেখল রমজান। উঠে বসল। বলল—তুমি ঘরে চলে যাও বন্ধুবৌ—

কেনে—

লোকে কেচ্ছা ছড়াবে—

তুমি ত বলতে দুনিয়াই নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করনি তুমি। ত কিসের ডর—

এখন আমি গাঁ-প্রধান—

আমি কুথায় যাই—

একবার সপাটে ঝুলনকে বুকের মধ্যে টেনে নিল রমজান। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে বলল, নিজের ঘরে যাও। ঘুমাও। মনকে প্রবোধ দাও।

ঝুলনের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারময় মুচি-দেশটা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

জবা, লেবী, রেনুবালার কাঁখে বাঁশের ঝুড়ি। ধান কাটা তোলা শেষ, নইলে ধান কুড়াতেই মাঠে গিয়ে নামত তিন সই। চাষীর চোখের আড়ালে ধানের শীষ টুঙে টুঙে ঝুড়ি ভর্তি করত। কিংবা কোদাল দিয়ে ইঁদুরের গর্তে রাখা ধান উদ্ধার করে তবে নিস্তার। কিন্তু সে মরশুম শেষ—আবার ফাগুন হাওয়া ছুটছে পুবে—দক্ষিণে। ঘরে বসে বসে আর সময় কাটে না। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে মুচিপাড়ার গুষ্টিগোত্তর বেরিয়ে পড়ে কাঠ কুড়াতে। এখন সাত হাঁড়ির খবর ওদের জিম্মায়। একশ গাঁয়ের কেচ্ছা আছে নখদর্পণে। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব খবরাখবর রাখে গুড়েবাগানের মুচিনিরা। দুপুরবেলা কাজে কামাই, তাই এক সঙ্গে দল বেঁধে ভূতদের মতো টঙ টঙ করে ঘুরে বেড়াবে আর বচসা গজল্লা করবে।

হ্যাঁরে লেবী—ই পাড়ায় কি গরু মরাটা অকেবারে উগে গেল নাকি রে—

তাই ত—অনেকদিন হয়ে গেল গরু মরেনি কি ব্যাপার বলত—

শুনেচু গ্রাম প্রধানের কথা—

কি কথা লো—

সে নিকি ইবার সমেতিতে নেতা হবে। কি কাজ করল কে জানে ভাই।

কেনে লোক ত বলে করিতকম্মা—

কিসের করিতকম্মা—খুব ত বড়ো মুখে গাইল—গাঁয়ের উন্নতি করবে। মাছ

চাষের টাকা দিবে সেই আশায় ভাই বসে রইনু ভরা বর্ষাটায়। ভেবেছিনুন—সামনের ডোবাটায় কাদলা মাছের ডিম ছাড়ব। শাবন মাসে উ গে বলল, কি গো পধান, মাছ ছাড়তে টাকা দিবে যে, কি—দাও—

কেনে দেইনি টাকা—

এই কলাটি দিয়েচে। উ দিবে ত মেরে খাবে কে। মাগী ঝুলনের গতরে লোতন লোতন কাপড় উঠবে কুথেকে—

আচ্ছা বল দিনি—এই মাগীটাকে বলি তর ঘরে মরদ আছে, তুই কি মনে করে লোকটার মাথাটা খাচ্চু—

তাই ত—

তবে শুনলম—উপর মহল নিকি খুশী লয় লোকটার উপরে—বংকা ঢুলির ঘর পড়েছিল, সেই অনুদানের টাকায় মদ খেইল—

একটা আকাট মাতাল—

তবে আর কি—ইবার মরণের দিন ঘনিয়ে এল আর কি। উইয়ের ডানা গজাল মরবে বলে—

হ্যাঁ গ লেবী—

কি বলচু—

সিদিনে কি হইচেল যে নবা ঘোষ পধান রমজানকে মারতি উঠল—

হ্যাঁ ভাই জলে থাকব আর কুমিরের সনে ঝকড়া করে আমার দিন চলবে! যেরা তকে ক্ষ্যামতায় বসাল ত্যাদেরই বুকের উপরে বসে দাড়ি উপড়াবি। বেন্দাবন ঘোষ বলেছিল তার ছ' বিঘার ছিয়ার চাষটা তুলে দিতে—টাকা দিতে পারবেনি। মান্‌স ভাত খাইয়ে দিবে। বেগার খেটে দিতে হবে গাঁয়ের সব মুচিকে। ত রমজান বলল—না সে হবেনি। টাকা যা জনমুনিষ পাবে—মায় খোরাকে ১০ টাকা বুঝিয়ে দে তবে লোক মাঠে নামাও। এতকাল ঢের জোরজুলুম করেচ তমরা। ইবার ল্যাহ্ মতো কাজ লাও, পয়সা দাও।

ঠিকই ত কথা—বেঠিকটা কুথা—বেভুল ত কুনোই বলেনি—ঘোষেরা ত সাত-কাল ধরে হাতে মাথা লিল। ইবার—

সে ত ঠিক—কিন্তুন ল্যাহ্ কথা কি আর চলে নিকি। তুই যেত দু নম্বরি হবি ত্যাত তোর ঘরসনসার লক্ষ্মীমন্ত হবে। ত শুন না—জগু দনপাট ত ঘোষেদের ইষ্টল্লা—বন্ধু লোক। আগে থাকতেই বুঝি ঠিক ছিল—এক কথা দু কথা হতে হতে বেন্দাবন ঘোষ ত মারতে গেল পধানকে—

যাই বল ভাই পাড়ার লোকজনদের কিন্তুন সিদিনে পা গুটিয়ে বসে থাকাটা ঠিক হয়নি। ঐ লোকটাই ত বিপদে-আপদে ডাকলে রা ছাড়ে, বল—

তা বটে—কিন্তু কে ভাই এক বিপদকে বাঁচাতে গে আরেক বিপদ মাথায় লিতে চায়—

এই প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হলো রমজান গ্রাম প্রধান হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মুচি, কাহার, কামার, মাঝি, বাগদী সম্প্রদায়ের এই সংগঠনে রমজান একদিন বুঝতে পারল এখানেও আসলে সে একা। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আসলে অসৎ—এখানে বাঁচতে হলে আস্তে আস্তে অসৎ হয়ে যেতে হবে। বড়ো মুখ করে বড়ো বড়ো যে আশার বাণী সে জনগণকে শুনিয়ে ছিল, দেশবাসীকে শুনিয়েছিল—তা তার স্বপ্নেই রয়ে গেল। উদ্‌যোগ নিয়ে কোনো কাজ করতে গিয়েই সে দেখেছে কেউ না কেউ এসে বাধ সাধছে। লেউল কামার। সনা বাগদী। নকলা দাস—যাদের বকলমে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের স্বার্থে এতটুকু আঘাত পড়লেই ব্যাস।—হাউ হাউ করে আগুন জলে উঠবে দশদিগন্তে। উঠলও তাই—। যদি পারতে ওদের টিপছাপ হিসাবে নিজেকে ব্যবহার করতে, তবে কোনো সমস্যা দেখা দিত না। কিন্তু রমজানের চরিত্রে মাথা নোয়ানোর সে স্বভাবটা নাই। সে নিজের নীতি আর সত্য পথেই হাঁটতে লাগল। সাধারণ লোকের মাঝে কিন্তু ছড়িয়ে গেল অন্য কথা। হাওয়ায় হাওয়ায়, বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। রমজান লোক ভাল নয়। ভালো মানুষের মুখোশ পরে সে আসলে আগের প্রধান রামধনের মতোই। নিজের আখের গুছাতে গুছাতে সে ভালো মানুষের গান গায়। সেও নাকি পার্টি মিটিঙে পঞ্চায়েতের টাকার ঠিকঠিক হিসাব মেটাতে পারেনি। তবু প্রকাশ্যে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। পিছনে মুখ খোলে, মুখের সামনে কেউ আঙুল দেখিয়ে বলতে পারে না—ঐ হাঁটে চোর। কেন পারে না—সে কি রমজানের ব্যক্তিত্ব—। হুঁ, মুচি মানুষের আবার ব্যক্তিত্ব। আসলে রামধন যা পারেনি রমজান প্রথমে এসেই এ মহাজগতের সেই পরম সত্যের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। তুহীনবাবুর লোক রমজান—এ ব্যাপারটাকে সে লোকসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাই এতদঅঞ্চলের রাজনৈতিক ধারা মূলত দুটি গতিতে বইতে লাগল। একদলে রমজান ও তার লোকজনেরা। অন্যদিকে বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ জনগণ। পৃথিবীর ইতিহাসটাই এই—ক্ষমতার চূড়ায় যাকে বসে থাকতে হবে, তাকে নীতি-দুর্নীতির সঙ্গে আপস করেই থাকতে হবে। ক্রমশ তাকে শাসক হয়ে উঠতে হবে। তার ভালো দিকগুলি আস্তে আস্তে কূটকচালিতে হারিয়ে

যাবে। চোখের সামনে জেগে উঠবে নিত্যনতুন সম্ভাবনা। সে প্রেম ভালোবাসা ত্যাগের চেয়ে আত্মমহিমা জাহির করাকে মনুষ্যজীবনের একমাত্র মোক্ষপথ বলে বিবেচনা করবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে যখনই সে রাজা হয়ে উঠবে তখনই তার রাজ-মুকুট হবে বিশ্বজনীন একাকিত্ব। সামনে পিছনে তার হাজার রকমের শত্রু তার চার-পাশে কেউটে সাপের মতো দুলবে, ফুলবে, গজরাবে। শুধু তাই নয়—মানুষের ইহ-জীবনের আরেকটি সত্য জানা দরকার—তা হলো প্রতিটি রাজাই কিন্তু একচ্ছত্র নয়—তার ওপর খবরদারির জন্য আরেক রাজা থাকে। তারা হলো নবাব, বাদশা, সম্রাট। তেমনি বড়ো জীবনের অনিবার্য শর্তগুলিকে বাধ্য হয়ে মানতে হলো রমজানকে। জীবন আর যন্ত্রণা এই দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরের যাঁতাকলে পড়ে সে বুঝি আস্তে আস্তে অসৎ হয়ে উঠল। অসৎ মানে যার মধ্যে সত্য নাই—রমজানের এই পরিবর্তিত চেহারা সবার চোখেই এক এক রূপে উপস্থিত হতে লাগল। এমন-কি তার বন্ধু বনসিও তার শত্রু হয়ে উঠল। তার আশা ছিল রমজান ক্ষমতায় পাকা-পোক্ত হয়ে বসে তাকেও টেনে নিয়ে যাবে, জায়গা দেবে। মুচিপাড়ায় বাড়বে তার মান। পাঁচজন লোক মাতব্বর বলে সম্মান করবে। তা হলো না যখন, তখন ভেতরে ভেতরে পুরুষের এক অসন্তোষ ছাই চাপা আগুনের মতো গনগন করতে লাগল। এক দু'দিন তার বহিঃপ্রকাশও ঘটল। কিন্তু রমজান যেন গায়ে মাখল না। হেসেই উড়িয়ে দিল সবকিছু। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, বিশ্ব-সনসার তাকে বলছে—বামুন কায়েত মধ্যবিত্তদের দালাল। রমজান হাসে—সে হাসতেই শিখেচে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে।—এই পৃথিবীর মানুষজন কে কার! এখানে সৎ-অসৎ দুর্নীতি-নীতি সবকিছুই গৌণ। শুধু একাকিত্বের ভেতর আত্মদর্শনটিকে দেখতে পাওয়াই জীবন। কে ভালো বলল, মন্দ বলল, ভুল বুঝল—তাতে কি যায় আসে। শুধু নিজের মতো কাজ করে যাও। জবাবদিহি কর নিজের কাছে। এর নামই হলো মানুষজীবন—

প্রতি রাতে যে তিমির আঁধারের পথ ধরে মহাঅন্ধকারে তলিয়ে যায় মুচিপাড়া, আজও তেমনি হারিয়ে গেছে। অনেক নিউ অপারেশন হলো এই গ্রাম গুড়ে-বাগানের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। সেখানেও কোনো আশার আলো নেই। শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। মাথার সিথানে জালাগোড়ার জলে খেলা করে এই আঁধার। শ্মশান বনে ভেসে বেড়ায়। আর গাঁয়ের মুচি রইদাস পল্লীর রক্তে হাড়ে মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে থাকে যে, সে-ও এই আঁধার। এক একটি মানুষ এখানে অন্য লোকের টিপ ছাপ হয়ে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সভ্য জীবন এদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে

লোভনীয় তিতির পাখি শিকার করে খায়। আর আদি মানব মানবীর মতো তীব্র কটু অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় এরা।

ঘুম নেই চোখে। ঝুলন উঠে বসল, বিছানা থেকে সরে এসে আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখল আকাশ নীল, আলোহীন। বিষাক্ত। সে দেখল একটি কালো রঙের বেড়াল রেনুদের ঘর থেকে বেরিয়ে জবাদের ঘরে গেল। সেখান থেকে মুহূর্তে যেন লেবীর ঘরের চালের মটকায় বসে মিউমিউ করে ডাকতে লাগল। আম গাছের তলা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ডোবার পাড়ে এল সে। কিছুকাল আগে এই ডোবার জলে বাগদা চিংড়ির নীল রহস্যময় দাঁড়া দেখত সে। আজ অন্ধ আচ্ছন্নতার দিকে তাকিয়ে রইল একা একা। কেউ জানে না—কেউ ভাবতেও পারে না সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমে স্তব্ধ হয়ে আছে, তখন জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একটি সামান্য মুচি বউ কেন একা একা মহাকাশের নিচে এসে দাঁড়াল। অসীম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে কী এত দেখার চেষ্টা করছিল!

প্রাচীন বুড়ো গুইরাম ঘুমের মধ্যে বাবুদের ঘরের আঠারো-হাতি দুর্গার পুজো দেখছিল। সে ঘুরে ঘুরে ছাতি ফুলিয়ে শুধু ঢাক-ই বাজিয়ে যাচ্ছে। যেন এক অলৌকিক বাদ্যকর সমস্ত কেরামতির ভেতর দিয়ে মহাজীবনের একটি বাজনাই মগ্ন হয়ে বাজিয়ে চলেছে—ঢ্যাম কুড়াকুড়, ঢ্যাম কুড়াকুড়, ঢ্যাম কুড়াকুড় ঢ্যা—

গভীর রাতে ঘরে ফিরে শরীরে ভ্যাপসা গরম টের পেল রমজান। গামছা কাঁধে সে বেরিয়ে গেল খাল ধারের দিকে।

সময় অতিক্রম করে সময়কে। মানুষ মাঠ-বনবাদাড় ভেঙে খালের দিকে এই অন্ধকারে চান করবে বলে ছুটতে থাকে। কিন্তু মরা খালে জল কোথায়। তবে কিসের সন্ধানে যায় এই পুরুষমানুষটা—

রমজানের মন আজ ভালো নেই। তার তো ইচ্ছা ছিল এই গাঁয়ের জন্য গতরটা বিলিয়ে দেবে। কিন্তু সবকিছু কোনদিক থেকে কেমন যেন জটিল হয়ে উঠল। আজ কেশপুর যাওয়ার কথা ছিল না রমজানের। কলকাতা ব্রিগেডে সমাবেশে যাওয়ার কথা। পদব্রজে শালবনী—সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া। আগে মহাকরণ অভিযান, পরে ব্রিগেড সমাবেশ। কিন্তু অনিবার্য কারণে এই প্রোগ্রাম মুলতুবির কথা জানিয়েছে পার্টি। তাই সকালে ব্লকের একটা ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতে সাব ডিভিশনাল অফিসে এসেছিল রমজান। সেখান থেকে কেশপুর—তুহীনদার ঘর। আশ্চর্যের কথা—সেখানে গিয়ে রমজান দেখল জগু দনপাটের সঙ্গে বনসি

এসেছে পার্টির কাজে। তুহীনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে। রমজানকে দেখেই সে থতমত খেয়ে বলল, আরে বনধু—এসো এসো—

তা কি ব্যাপার। ইখনে—

চলে এলম, জগুবাবু বললেন—কি জগুদা আপনিই বলো না—

হ্যাঁ—এই একা একা কেশপুর অনেকটা দূর। কিগরে এসব—তাই ভাবলম সঙ্গী করে লিই বনসিকে—

তা চল বনধু। চা খাই চল—

এই ত খলিলের দকান থানি খেয়ে এলম। তমার খিদা পেইচে ত যাও—

কি ব্যাপার জগুদা—আজকাল কি আমাকে আড়াল করে চলচ নিকি। দেখা হয়নি। কথা বলোনি—

কি বলো ভাই রমজান—তমাকে এড়িয়ে চলব? তুমিও কাজের চাপে থাক, আমিও থাকি সমেতির কাজ কারবার লে। বন্ধুত্বটি ঠিকিন আছে—

আমাদের গেরামের পশ্চিমের কুবাই নদীতে পোল হবে—শুনেচ ত—

শুনলম ত তুহীনবাবুর কাছ থেকা। তা ভাল। যেত উন্নতি হয় তেতই ভাল। এই ত বনসি বলছেল—সবাই যেন বলে—ভালমন্দের কুনো আয়পয় নাই তমাদের গাঁয়ে। গুড়েবাগানের গুড় নাকি দিনেক দিন ফুরাচ্চে নাকি হে রমজান!

তা লোকে যা বলে সে কথাটিই ঠিক। বনধু যেদি বলেচে তবে সে কি আর বেভুল বলবে। —আমি চইলম—ইফা, কুডরে আয়মা, সখিপুর হয়ে ঘরে ফিরব।

বনধু ঘরে গে ঝুলনকে বলো ত, ভাল করে রেঁদে রাখতে। এক সননে দু বনধু আজ ভাত খাব, দুজনে—

কেশপুরে বনসিকে দেখেই রমজানের মন ডাক দিয়েছিল—ঝুলন সেদিন যে কথা বলছিল,—তুমি তমার সব কথা বন্ধুকে পেট খুলে বলে ফেল কেনে। জগু দনপাট গাঁয়ে ঘুর ঘুর করচে তাকে পার্টির কাজে টানবে বলে—কথাটা বেশ কিছু-দিন আগে থেকেই কানাঘুষো শুনছিল রমজান, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিল না। সেদিন যখন ঝুলন বলল তখন ভারি ব্যথা পেয়েছিল সে। আজ জগু দনপাট বনধুকে সঙ্গে করে তুহীনবাবুর কাছে এসেছে দেখেই সমূহ চিত্রটা তার চোখের সামনে জলের মতো তরল হয়ে উঠে এল। তাহলে মুচিপাড়ায় রমজানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আরেকজনকে খাড়া করা হচ্ছে। কেন—হাজার বদনাম রমজানের—

ঝুলন একদিন বলল—মাঝরাতে ঘর ফাঁকা থাকে। ঘরে এসনি কেনে—

কত কাজে কত জায়গা ঘুরতে হয়। যেথায় রাত হয় ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবি

কখন সকাল হয়—

লোকে যে বলে তুমি বেশ্যাঘরে রাত কাটাও—তাই এক একদিন ঘরটি তমার ফাঁকা থাকে। সত্যি নাকি গঅ—

হা—তাই নাকি—এই বলে হেসে রমজান উথলে উঠেছিল। ঝুলন বলেছিল—হ্য গ—তুমি কি সত্যি সত্যি পাল্টে গেছ নিকি—

তমারও কি মনে হয়—

সে মানুষটা তুমি আর নাই—বলতে বলতে ঝুলনের চোখ ছলছল করছিল। রমজান চুপ, নীরবে সে শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিল মেয়েটিকে। একেবারে আপন আপন ভাব নিয়ে যে কাছে এসেচে সে আসলে কে। ঝুলন বলল—তোমার যে তেজটাকে আমি ভিদরে লিয়েছিনু তা আর নাই গ।

আজ কেশপুর থেকে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘরে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। বনধুদের সঙ্গে আর ভাত খাওয়া হলোনি। খালের দিকে চলেছে রমজান। ঠাণ্ডা পৃথিবীর ডাকে। ইদানিং গভীর রাতে একা একা সে খালের ধারে চলে আসে, ঠায় বসে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে—জন মনিষ্যি তা টের পায় না। হ্যাঁ অনেক দুর্নীতি করেচে সে—তাকে দিয়ে করানো হয়েছে। সেই ভালো নিখাদ মানুষটি আর নাই—ইচ্ছা করে সে তো আর অতলে তলিয়ে যায়নি। হাতের পুতুল হয়ে সে শুধু এ-হাত ও-হাত ঘুরেছে ফিরেছে—সেই একশ হাতের ময়লা লেগেছে তার গায়—। একথা রমজান কাকে বুঝিয়ে বলবে। হাতের কাছে কেউ নাই—তাই রাতের বেলা অনন্ত আকাশের তলে একা একা এসে বসে সে। এখানে কূটকচালি নাই। হিংসা নাই। শুধু মাঠে মাঠে প্রসারিত আছে শান্তি। সেই ঘাসে গামছা পেতে শুয়ে থাকলেও আরাম।

সবাই জানে যারা জীবনের দহে মজে যায় তারা আর ফিরে আসে না। তখন সর্বনাশের মায়ায় রুষে ওঠে তাবৎ সংসার। জনমানব শূন্য রাত—পোকাটিও বেঁচে নেই। ঝুলন একা সর্বনাশী ভূতের মতো ঘুরছিল ত্রি-সংসারে।

এমন সময় দাউ দাউ করে জলে উঠল আগুন। মুচিপাড়ায় বহুদিন পরে এই আগুনের তেজ। হৈ হৈ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই। দেখল—রমজানের এককক্ষ দরমার দেওয়ালের ওপরের খড়ের চালটি জলছে। কিন্তু ঘরে কেউ নাই। আগুন রে—আগুন—আগুন—করে সবাই বালতিতে করে জল নিয়ে ঢালতে লাগল, ছুঁড়তে লাগল নেতাই, বলাই, বংকা ঢুলি, বনসি, লেবী, জবা, রেনুবালা সুমন্ত। সর্বনাশী লেলিহান শিখা উঠতে থাকে আকাশ পানে। লোকটা কুথাই,

লোকটা কুথায় বলে চিৎকার করতে থাকে কেউ।

ওদিকে নিবিড় মাঠে দিগন্ত রেখায় একটি লাল গামছা পেতে শুয়েছিল রমজান। সহজ সরল নিষ্পাপ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল জালাগোড়ার দিক থেকে। চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল। মুচিপাড়া থেকে এই হল্লা, জনরব এসে তার ঘুমটি ভেঙে দিয়ে গেল। আগুন লেগেছে বুঝতে পারল—কিন্তু কার ঘরে তা বুঝতে না পেরে চোখ রগড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে দেখল—তার ঘরটি জলছে আকাশের দিকে তেজ ছুটিয়ে। ঘরের পানে ঝড়ো হাওয়ার মতো দৌড়তে লাগল সে। কিন্তু আগুন যেন বলতে থাকে, পালা—রমজান—পালা।

কে দিল আগুন—ঘরের চালে—

শত্রুমিত্র বিশ্বজন—।

তোর কি চতুর্দ্দিকে এতই শত্রু ছড়িয়ে গেল রমজান—

অনেকেরই যে রাগ আমার উপর। ক্ষতি চায় তারা। তাদেরই কেউ।

নেতাই ?

না—। হতেও পারে—

বলাই—

সেও লয়—। কিন্তুন—

তবে কি বনসি—

সে কি করে হয় ! সে ত বনধু—তবু—

তবে কে—

রমজান ছুটছে—নিজের সনে নিজে কইছে কথা। ভেতরে উথালি-পাথালি হাওয়া। শোনা যাচ্ছে মানুষের মাথার মতো ঘরকাঠামোর বাঁশের গিঁট ফাটছে ফটফাট করে। কিন্তু কে দিল আগুন সে কিছু ঠাওর করতে পারছে না। গাঁয়ে ঢুকতে যাবে—এমন সময় জালাগোড়ার ধারে একটা জামগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। আবছা আঁধারে দেখা যায় না কিছু। কে—কে গ, বলতে বলতে রমজান এক মস্তর থমকে যায়—

আমি—আমু গ—

ঝুলন ?

হঁ—

সন্ন্যাসীর গেরুয়া রঙের মতো আগুন তখন উঠেছে আকাশে। রক্ত গঙ্গা বইছে আকাশে। অস্পষ্ট ছায়া ঝুলনের মুখে। ক্ষীণ মায়া। সে আবার বলে—হঁ গ

আমি। ভয়ে বুকটা ধ্বসড়াচ্ছে নিকি—

শিউরে উঠল রমজানের বুক। মুচিপাড়ার দিকে গতিপথ তার রুদ্ধ হয়ে গেল। বড়ো চেনা লাগে এই মেয়েমানুষটিকে। এই বুঝি বলতে পারবে কে দিয়েচে আগুন—কেননা ষড়যন্ত্রের যাবতীয় খবর জুগিয়ে এই তো রমজানকে সাবধান করে দেয়। কিন্তু আজকের এই আগুন লাগিয়ে দেওয়াটি—এ যে আর শত্রুতায় নাই—লোকটার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নেমে এল সবাই। রমজান ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে মেয়েমানুষটিকে। ঝুলন বলে—তুমিও ঘরের মায়া কর ? ঘরের পানে চাও—

ঝুলন কি দেখে রমজানের দিকে অমন অগাধ চোখে !—তবে কি সে তাকেই সন্দেহ করল ! কলকল করে হেসে উঠল ঝুলন—যেন ভরা নদীর জলে একটি ডিঙি দুলতে লাগল। দূরে কোথাও—আগুন, যেন চালের কানকো কেটে রক্ত ঝরছে। রমজান বলে—কে? কে ঝুলন, বলে দে আমাকে। আমি জানি—আমাকে জানতে দে—

ছেনালি রঙ্গে হাসতে হাসতে ঝুলন বলে—মন ধরালো, কার মন জলছিল—

কে—কে ঝুলন—

আমি যে বলতে পারচিনি—প্রাণ পোড়ে গ আগুনে—

একটিবার শুধু বল তুই। তারপর আমি তাকে দেখে লি—

থম হয়, তারপর হামাল ডাকে ঝুলন—। রমজান তার চেহারায় আগুন দেখতে পায়। ঝুলন ছেনাল হাসি হাসে আর বলে—আমু গ আমি। কার ঘর কে ধরাবে। সে ত আমি। আমু গ আমি।

চকিতে চোখের সামনে সমস্ত মুচিপাড়াটা পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়। হাত বাড়ায় রমজান—কিন্তু ধরা যায় না। এই রসিকতার মানে বোঝে না সে। পুরুষ চণ্ডাল—সে শুধু রাগ দেখায়। জগৎ এক স্বাধীন রঙ্গে লীলা করে। মন বলাবলি করে—ঝুলন ?

না—

ঝুলন ?

হ্যাঁ—

তুই ঠিক জানিস ?—ঝুলন ?

কে জানে—

মানবজীবনের এক কিনার এই মুচিকুলি—এর ধারে দাঁড়িয়ে রমজান টের পায়—যাত্রাটি তার চিরন্তন কালের।

—

B I V A V

Price : Rs. 20·00 | Special 46th Issue | Reg. No.
Vol. 12. No. 4 | July – September 89 | R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970 – 1885

GRAM : GRINDMEDIA
TELEX : CA-3112
FAX NO. 91-33-286604

Phone No. : 28-4071
28-4072
20-7008
20-7009

Electrosteel Castings Limited

4, B. B. D. BAG (East)
(Stephen House)
CALCUTTA-700 001

WORKS

(1)
B. T. ROAD
P. O. SUKCHAR
WEST BENGAL

(2)
A-7, INDUSTRIAL AREA
Near Rly. Signal Workshop
GHAZIABAD (U.P.)

(3)
ELAVUR
Via GUMMIDIPUNDI
TAMILNADU

Leading manufacturers of ALLOY STEEL CASTINGS, STEEL INGOTS, CAST ALLOY STEEL GRINDING MEDIA and CAST IRON SPUN PIPES